# সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিজ্ঞান

শ্রীমদ্ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ

মহান্ত, শ্রীরাধাকুণ্ড।

# সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিজ্ঞান

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥"

( চতুঃ শ্লোকী )

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী :—

শ্রীমদ্ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত।


প্রথম সংস্করণ—১০০০

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড :—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির থেকে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫১০

শ্রীগৌরপূর্ণিমা

প্রচারানুকূল্যে ভিক্ষা—৮৫.০০

পঁচাশী টাকা।

যুগ্মপ্রকাশক :-

শ্রীকেশবদাস ও শ্রীহরেকৃষ্ণদাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্রমন্দির

ব্রজানন্দঘেরা, পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা ( ইউ, পি )

প্রাপ্তিস্থান :-

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্রমন্দির

ব্রজানন্দঘেরা, পোঃ রাধাকুণ্ড, জেলা মথুরা (ইউ, পি,)

পিন—২৮১৫০৪।

২। শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস

১৪৯, গোকুলানন্দ ঘেরা

পোঃ বৃন্দাবন, জেলা মথুরা ( ইউ, পি )

পিন ২৮১১২১

৩। ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র সাহা

সিমস্ নার্সিং হোম

১৫০, জি, টি, রোড্, পারবীরহাতা

পোঃ শ্রীপল্লী, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

মুদ্রক :—শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন।

# ❁ সমর্পণ ❁

মৎপ্রাণৈকগতি পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা-

প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ১০৮

শ্রীশ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী দাস

বাবাজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে

তাঁরই করুণার স্ফুরণ এই "সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিজ্ঞান'

গ্রন্থরত্ন তাঁর প্রীত্যর্থে এই দীনাতিদীন কর্তৃক

সমর্পিত হল।

## ॥ ভূমিকা ॥

## তত্ত্ববিজ্ঞানবিভূতিস্বাদনমাধুরী

বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে মর্ম্ম অবধারণ করা যায় না। পরম্পরাপ্রাপ্ত তত্ত্ব ধারণা না থাকিলে বিশেষ উপলব্ধ সত্যসিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব নয়। ঋষির সত্যানুভব ও প্রজ্ঞাচক্ষুর সঠিক-দর্শনেই তত্ত্ববিজ্ঞানরহস্য উন্মোচিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর প্রথমশ্লোকে জ্ঞানবিজ্ঞান সমন্বিত রহস্যবিদ্যা (ভক্তি-তত্ত্ব) প্রদানের উদার ইঙ্গিতই স্বয়ং শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন। উপনিষদে জ্ঞানসমুৎসুক-চিত্ত সমিদ্‌পাণি বিদ্যার্থি-গণের প্রশ্নাবলী সমাধানে জ্ঞানিগুরু ঋষিবর্গের জ্ঞানধারাই আমা-দের শাস্ত্রাদর্শে মনন-মাধুরীর মাধ্যমে সংহত ভাবঘন তত্ত্ববিজ্ঞানের আত্মজিজ্ঞাসার সুচির সমাধান মীমাংসা পথেরসন্ধান প্রদান করে।

ভারতের সনাতনরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম সমাশ্রয়। শ্রীগুরু-শরণাগতিতে শিষ্যের আচরণের সঠিক-পথ নির্দ্ধারণই শুধু হয় না আচরণের প্রত্যয় দৃঢ়স্বভাবে স্বচ্ছন্দতা ও বিশ্বাসের নির্মল সমীরণ প্রবাহিত হয়। মানসভূমি সরস না হইলে মন্ত্রসাধন সার্থক হয় না। শ্রীগুরুর স্বভাব নির্মল ও শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি না হইলে শিষ্যের জীবনজিজ্ঞাসা ও ভজনসত্য সদ্‌ভাবনা জীবনের আনন্দ-সমুজ্জ্বল রূপরেখা রূপায়িত হইয়া

উঠিবে না। সদ্গুরু শ্রীভগবানের কৃপাবার্তাবহনকারী মর্ত্যলোকে অমৃতলোকের অগ্রদূত প্রিয়তমের বাণী-বাহক মূর্ত্তি। তাঁর মাধ্যমেই আমরা সেই অতীন্দ্রিয়লোকের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে প্রয়াসী হই।

পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীরাধাকুণ্ড সমাশ্রয়ী শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহান্ত মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীভক্ততত্ত্ব, শ্রীভগবত্তত্ত্ব, শ্রী-কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীনাম. রাগানুগা, প্রেম ও রস এই দশটি পৃথক্ পৃথক্ স্বলিখিত তত্ত্ববিজ্ঞানগ্রন্থরাজি একত্রিত করিয়া "সাধ্যসাধনতত্ত্ববিজ্ঞান" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থরাজি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের রস-সম্পূট। যাঁহারা সাধ্যসাধন বিষয়ে উৎসাহী, ভজনপ্রয়াসী ও শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তালোকে অধ্যাত্মজীবনগঠনে প্রত্যাশী তাহাদের সমীপে এই সিদ্ধান্তসমূহ মণি-মঞ্জুসা সদৃশ। সহজভাবে এই তত্ত্বামৃত সম্বন্ধে অনেকেরই জানিবার আগ্রহ রহিয়াছে,তাদের সহজসুগম সাধনার দিশারি এই গ্রন্থরত্ন। সরলতা ও নিষ্ঠা না থাকিলে ভজনজীবন সমৃদ্ধ হয় না। ভক্ত-ভক্তি ভগবান্ এই তত্ত্বই বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে। এই বিজ্ঞান চিদ্বিজ্ঞান-নীতিশাস্ত্রমূর্ত্তিতে প্রকটিত। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মন্ত্রের ন্যায় সিদ্ধ চিন্ময়বস্তু। শাস্ত্রমুখে সিদ্ধান্ত শ্রবণে ও নিজ আচরণে ভজনানন্দীবৃন্দ আগ্রহী। জাগতিক বস্তুনিচয়ের অন্তরালে যে নিত্যসত্ত্বা অভঙ্গুর অনুস্যূত অথচ নির্লিপ্ত, অনুভব করার জন্য জীবনের সাধনা প্রয়োজন।

এই গ্রন্থে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ঐশ্বর্য্য, আনন্দ-লীলারস ভক্তিপ্রেম মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে। এইসকল পরমবস্তুর আস্বাদনমাধুরী অতি অন্তরঙ্গতায় সংন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বই প্রকটিত। ভগবৎ সম্বন্ধই তত্ত্ব—তাঁর জ্ঞানই পরমার্থবিজ্ঞান। সেব্যের সুখেই সেবকের সুখ, এই মর্মকথা বৈষ্ণবসাধনায় পরিস্ফুট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, "প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" 'শ্লোক' অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারেই সাধনীয় তত্ত্বের বিচারধারা সুসঙ্গত ও গ্রহনীয়। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কথা বর্জ্জিত ও অগ্রাহ্য। মানবজীবনের দুইটি দিক্—বহির্মুখীন অপরটি অন্তর্মুখীন। তত্ত্বামৃত আস্বাদনে অনুভূতির অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি সক্রিয় থাকা চাই। সত্যধর্মাশ্রিত না হইলে দূরবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় দূরদর্শনও সার্থক হইবে না। ধর্মতো স্বভাব। প্রাকৃতবস্তুর ধাতুসত্ত্বা সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাই বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞান ক্ষণস্থায়ী চিদ্‌বিজ্ঞান চিরন্তন। বিজ্ঞান সচেতন অণুবীক্ষণ অভ্যাস প্রক্রিয়ার রীতি হইল 'সাধন'। সাধনতত্ত্বের মুখ্যতাৎপর্য্য হইল পরমার্থ উপাসনা। লক্ষ্য স্থির না হইলে মনের চাঞ্চল্য ও অদূরদর্শিতা মানবজীবনে সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে সঠিকপথের সন্ধান প্রদানে অসমর্থ। তাই সমর্থ গুরুর চরণাশ্রয় ও ভজনানন্দী ভক্ত সাধুসঙ্গ এই দুই-ই মানবজীবনকে পূর্ণতমের রসযোগকে ত্বরান্বিত করে। সাধ্যবস্তু সাধনব্যতীত লাভ হয় না। আস্তিক্যবুদ্ধি শ্রদ্ধা ও

সুনীতি নির্ভরতায় কমলদলের ন্যায় বিকশিত হয়। আসুরীভাবনা সুন্দর ভাবনার সঙ্গসুখ দিতে অসমর্থ। তাই সুকুমার শাস্ত্রানুগত্যে জীবন পরিমার্জিত হইলে সাধনজীবন সমুজ্জ্বল ও সুষমামণ্ডিত হইয়া ওঠে।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসাধনার যাঁরা পথপ্রদর্শক তাঁদের অন্যতম রূপদর্শনতত্ত্ববিজ্ঞানে সুনিপুণ সেবানিষ্ঠ শ্রীরূপগোস্বামিচরণ। শ্রীরূপের রসবিজ্ঞান ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দূরবগাহ সমুদ্রে তত্ত্বমণি সংগ্রহে নিপুণ ডুবুরীর প্রয়োজন। শ্রীরাধাপারম্যবাদী—রঘুনাথ দাসগোস্বামী ভজনাদর্শের নিয়মনীতিনিয়ন্ত্রণের বলিষ্ঠ পথপ্রদর্শক। রাগানুগাভজন হইল নির্মল সাধনরীতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদগণের গোপীভাবানুগত্যে অবদানগৌরব কেতন। রাগানুগাভজনের মঞ্জরীভাবসাধনায় সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য হইল শ্রীগুরুরূপামঞ্জরীর আনুগত্যে আরাধ্যের নূপুরসিঞ্জিত মধুধ্বনিমণ্ডিত ধ্বনিগৃহে সিদ্ধদেহে সেবাসান্নিধ্যলাভের সুসৌভাগ্যের উদয়। এই সাধনবৈচিত্র্য আর কোথাও নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলায় এই চরমতত্ত্বামৃতরহস্য পরিবেশিত। শ্রীগুরুকৃপা অভিস্নাত অন্তরে সেবালালসার অনুভূতির লাবণ্যধারায় অভিষেক সুসম্পন্ন হয়। শ্রীনাম, প্রেম ও রস তত্ত্বামৃত আস্বাদনে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রজ্ঞান ভূয়িষ্ঠ বাবাজী মহারাজের অলৌকিক রসবুভুক্ষিত হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় লাভ করি। সাধকদেহে আস্বাদন চমৎকৃতিই শুধু নয় পরন্তু তাঁর চিত্তমন্দিরের আরাধ্যের আরাধনায় সুচারু

অলংকরণবৈভবের সুনিপুণ প্রয়াস ও তৃপ্তির সুখোল্লাস অভিব্যক্ত হইয়াছে।

জীবের অভিমান অহঙ্কার তাতে অজ্ঞানতা মায়ামূঢ়তা ঈশ্বরবৈমুখ্যদোষ জীবকে পাইয়া বসে। উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পায় না তাই শ্রীগুরুমূর্তিতে শ্রীভগবানের কৃপার দ্বার উন্মোচিত হয়। অনাদিকালের জৈবমায়ামোহমুগ্ধ জীবের সমীপে সংসার দুঃখ হইতে ত্রাণকর্তারূপে শ্রীগুরুদেব নিত্যসুখদস্মরণ বাস্তব-নিত্যকল্যাণের স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করেন।

শাস্ত্রধীমতি বাবাজীমহারাজ আপনস্বভাবসুলভ শাস্ত্রজ্ঞান অনুশীলনের জারিত মনন মহিমায় ভক্তিমান্ সুকৃতিপরায়ণ জনগণের জন্য শুধু নয় যাহারা জীবনে প্রাথমিক "সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিজ্ঞান" সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহলী রহস্যবিদ্যা অনুশীলনে আগ্রহী জীবনের নানাসমস্যায় পথভ্রান্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিষয়ে জিজ্ঞাসু পারমার্থিক ভূগোলসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাহাদের জন্য এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বৈষ্ণবসাধনাই বলিব কেন মানবজীবনে মনুষ্যত্ব, চরিত্র গঠন প্রপন্নরীতি, তত্ত্বনির্দ্ধারণ নিরপেক্ষ মধুর-ভজনের স্বাধুতা সম্বন্ধে অনুরাগী মানবকুলের মঙ্গল সদায়তন এই গ্রন্থরত্ন। একালে আরাধ্যবিষয়ে নানাসমস্যাবিষয়ে সাধ্যসাধন-তত্ত্ববিষয়ে এমন সুনিপুণ সুযুক্তিনির্ভর শাস্ত্রধীষণাবৃত্তির নিশ্চিন্ত কুশলাবুদ্ধি ভাবনার সুচারুতা সম্পাদনকারী নির্ভিক সিদ্ধান্ত প্রয়াসী বাবাজী মহারাজকে সাধুবাদ জানাই। শ্রীল বিশ্বনাথ-

চক্রবর্তী রসাচার্য্যের একটি গ্রন্থের নাম "সাধ্যসাধনকৌমুদী"। প্রেম ও রসতত্ত্ব আস্বাদনবিভোর মানবই অপ্রাকৃত রাজ্যের নাম-নামী একাকার ভাবরসের ঘনীভূত বিগ্রহের কৃপার সন্ধান লাভ করিতে পারে। মায়াতন্দ্রাচ্ছন্ন তমসারজনীর অবসানে সুপ্রভাতে সাধুগুরু-বৈষ্ণবের সুনির্ম্মল কৃপাকরুণালোকে হৃদয় অনুরঞ্জিত হইলে প্রকৃত তত্ত্বানুশীলনে ও ভজন অনুরাগ বর্দ্ধনে জীবন ধন্য ও সার্থক হইবে।

বাবাজী মহারাজের অপরিসীম শাস্ত্র পরিশীলিত অন্তরের শুচিতা ও প্রত্যয়নিষ্ঠ মননবৈভব গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বাশ্রয়ী শ্রীকৃষ্ণই-পরতত্ত্ব। স্বরূপ শক্তি-ত্রয়ের মহিমা অনুভববেদ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধাভক্তি-কেই সাধ্যবস্তু বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। জ্ঞান যখন বিশেষজ্ঞানের স্তরে উপনীত হয়, তখন মায়ার জট খুলিয়া যায়।

পরম বিদগ্ধ শাস্ত্রমর্ম্ম অধিগ্রহণে সাধনাভিজ্ঞ বাবাজী মহা-রাজ অতুলনীয় শাস্ত্রশরণাগতির কৃপার রশ্মিতে আলোকিতহৃদয়ে সহজ ও সুললিত ভাষায় অতিদুরূহতত্ত্বের সিদ্ধান্তকুসুম নানাশাস্ত্র উদ্যান হইতে চয়ন করিয়া সাধ্যসাধনের মাল্য সংগ্রন্থন করিয়াছেন। শাশ্বত কালের আরাধ্যবিষয়ে সমাদর ও আপ্যায়নরীতিটি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবনায় তাঁর মনোদ্যানে সুবাসিত কুসুমের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আমরা তত্ত্ববিদ্ বাবাজী মহারাজের আস্বাদনের স্বাভাবিক ঔদার্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছি। এই দিব্যমালিকাটির সৌরভে বিশ্ববাসীর পারমার্থিক চিত্তসংশয়ের সংকটকে দূরীভূত করিবার সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ তত্ত্ববাদী, রসবিদ্, ভক্তিপথিক্, অধ্যাত্মবিজ্ঞানমনস্ক আপামর জনগণের কল্যাণ সাধন করিবে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস —

**শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী**

১০ই মাঘ, ১৪০২
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ৫০০ তম আবির্ভাব তিথি
শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির
শ্রীভূমি, কলিকাতা-৪৮

# নিবেদন।

বৈষ্ণবদর্শন-শাস্ত্র-ভাণ্ডার অতি বিশাল ও গূঢ়-গম্ভীর তথ্য-সম্পদপূর্ণ। তা' সম্যক্ অধ্যয়ন বা অনুশীলন করে বৈষ্ণবীয় ভজনতত্ত্বে নৈপুণ্যলাভ করা দুরূহ ; কেবল অধ্যবসায়ী ধৈর্যশীল সাধকগণের পক্ষেই তা সম্ভবপর। অথচ তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত সাধন-ভজনে অগ্রসর হওয়াও যায় না। যাঁরা সাধনভজনে অভিলাষী অথচ বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্র অনুশীলনের মত ধৈর্য অথবা সময় যাঁদের নেই তাঁদের যাতে ভজনতত্ত্বগুলি সহজে বোধগম্য হয় এজন্য এই "সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-বিজ্ঞান" গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে অতি সহজ অথচ সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীগুরু শ্রীভক্ত, শ্রীভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারাণী, শ্রীভক্তি, শ্রীনাম, রাগানুগাভক্তি, প্রেম ও রস— এই দশটি তত্ত্বের সন্নিবেশ করা হয়েছে। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের রচিত শাস্ত্রে যে সব তত্ত্ব কঠিন সংস্কৃত ভাষায় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থে সেই সব তত্ত্বগুলি যথাসম্ভব সরলভাষায় ও সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই গ্রন্থানুশীলনে ভজনেচ্ছু সাধকগণ অনায়াসেই ভজনোপযোগী তত্ত্বগুলি অবগত হয়ে সাধন-ভজনে অগ্রসর হতে সক্ষম হবেন। যদি কোন সাধক সাধিকা এতে কিছুমাত্রও উপকৃত হন তবেই শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

পরমপূজ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদ কিশোর গোস্বামী মহোদয় কৃপা করে এই গ্রন্থের মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দিয়ে আমায় ধন্য করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমার সম্পাদিত আরও

কয়েকটি গ্রন্থের অতি অনবদ্য ও অপূর্ব ভূমিকা লিখে মাদৃশ দীন-জনের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মতো ভাষা আমার নেই। নিত্যধামগত ৺সমরেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর সহধর্মিণী ভজনশীলা নলিনীপ্রভা রায় (৬৩/এ বি, কে, পাল এভিনিউ, কলিকাতা—৫) বেশ কিছুদিন পূর্বে আমায় ৯০০০.০০ নয়হাজার টাকা গ্রন্থমুদ্রণ জন্য দান করেছিলেন। রায় মহাশয়ের প্রকটকালাবধি এই অর্থ আমি তাঁর অভিপ্সিত মুদ্রণকার্যে ব্যয় করতে পারিনি—এজন্য আমি অতিশয় অনুতপ্ত। তাঁর মতো সরল, উদারপ্রাণ, সদাশয়, নির্মৎসর, ভজননিষ্ঠ ভক্ত বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না। যাঁরা ক্ষণকালও তাঁর সঙ্গ বা সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁরা একবাক্যে একথা স্বীকার করবেন। আজ তাঁর অন্তর্ধানে আমরা সবাই শোক-সন্তপ্ত। তাঁর পুণ্যস্মৃতিকল্পে তাঁর প্রদত্ত অর্থ এই গ্রন্থমুদ্রণকার্যে ব্যয় করা হোল। তিনি মঞ্জরীস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের সেবালাভে ধন্য হোন্ এবং নলিনীপ্রভা তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে রতিমতি লাভ করুন শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণ-সমীপে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ দাস ও শ্রীমান্ শ্যামচরণ দাস মুদ্রণালয় বিষয়ক সবকার্যেরই সমাধান করেছে—তাদের ভজনোন্নতি কামনা করি। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও গ্রন্থে কিছু মুদ্রণ-ত্রুটী থেকে গেছে, সুধী ভক্তবৃন্দ নিজগুণে সংশোধন করে গ্রন্থাস্বাদন করলে ধন্য হব। ইত্যলম্।

দীন সম্পাদক।

## —ঃ বিষয়-সূচী ঃ—

# শ্রীগুরুতত্ত্ববিজ্ঞান

## শ্রীশ্রীগুরুর স্বরূপ।

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ নিরূপণ-প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়ভক্ত শ্রীউদ্ধবের প্রতি ( ভাঃ ১১।১৭।২৭ ) বলেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

শ্রীভগবান্ বল্লেন—'হে উদ্ধব! আচার্যকে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলেই জানবে, কখনই তাঁকে অবজ্ঞা করবে না। মনুষ্য বুদ্ধিতে তাঁর প্রতি অসূয়া করবে না, যেহেতু শ্রীগুরু সর্বদেবময়।'

"গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" (চৈঃ চঃ)

এই সব শাস্ত্র প্রমাণে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে বিশ্বে আবির্ভূত হয়ে ভক্তগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করে থাকেন। এখানে সেই কৃপাটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভজনসম্পদ্ এবং ভজনের ফল প্রেমসম্পদ্‌দানে আশ্রিত শিষ্যকে ধন্য করা। "যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।" ( ভাঃ ১১।২৯।৬ ) শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বল্লেন—"হে প্রভো! বাইরে

শ্রীগুরুরূপে তত্ত্বোপদেশাদিদ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে সৎ-প্রবৃত্তি দ্বারা মানবের ভজনের প্রতিকূল বিষয়বাসনাদি দূরীভূত করে তুমি তাঁদের নিকট স্বীয় অনুভূতি প্রকাশিত করে থাক।" সুতরাং পূজ্যত্বাংশেই শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়-তত্ত্বরূপে ভজনীয়—এই অংশে তুল্যত্ব অভিপ্রেত নয়। ভক্তত্বধর্ম-বিশিষ্ট ভগবৎ প্রকাশই শ্রীগুরু।

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীগুরুদেবকে ভগবদাবির্ভাব-বিশিষ্ট মহাভাগবতোত্তম বলেই জানতে হবে—এটিই শ্রীগুরুর যথার্থস্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ তাঁর মনঃশিক্ষায় লিখেছেন—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।" 'হে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে নিরন্তর স্মরণ কর।' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও তাঁর গুর্বষ্টকে লিখেছেন—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভো র্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

"নিখিল শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলেই কী র্তিত এবং মহদ্‌গণ সেইরূপ ভাবনাও করে থাকেন, কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমই; আমি সেই শ্রীগুরুর শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।" তাৎপর্য এই যে, শ্রীগুরুদেব প্রত্যক্ষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত

হলেও শিষ্য তাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলেই মনে করেন। এরূপ ভাবনাব্যতীত শিষ্যের অন্তরে শ্রীগুরুর প্রতি মর্ত্যবুদ্ধির উদয় হতে পারে; যা' তাঁর পক্ষে মহা অপরাধ জনক, যাতে হস্তি স্নানের ন্যায় তাঁর সাধন ভজন সবই নিষ্ফল হয়ে যায়।

## শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা।

ভগবদ্ভজন করতে হলে প্রথমতঃ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ব্যতীত ভজন-সাধন সুদূর পরাহতই হয়ে থাকে, কারণ ইহা ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। কেবল ভক্তিমার্গ ই নয় বিশ্বে এমন কোন সাধনপন্থা নেই, যাতে গুরুপাদাশ্রয় স্বীকৃত হয়নি। প্রাকৃত জগতের কেহতে কোন বিদ্যা শিক্ষা হলে যখন সেই বিদ্যায় পারদর্শী গুরুর প্রয়োজন হয়, তখন অপ্রাকৃত জগতের পরাবিদ্যা ভক্তিশিক্ষার নিমিত্ত যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন হবে—ইহা বলাই বাহুল্য। ভক্তিবিদ্যা বিষয়ে আবার বিশেষ কথা এইযে, কৃপাময় শ্রীভগবানই বিশ্বমানবকে ভক্তিশিক্ষা দিয়ে ধন্য করার জন্য স্বয়ং বিশ্বে গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

আমরা সংক্ষেপে শ্রীগুরুতত্ত্বর কথা বলেছি। শ্রীগুরুতত্ত্বের গুরুত্বের উপলব্ধি হলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আর কারও কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। শ্রীগুরুর স্বরূপ কি, গুরুপদার্থ কি, গুরুপাদাশ্রয়ের সুফল কি—এই সব বিষয়ে জ্ঞানশূন্য জনেরেই গুরুপাদাশ্রয় বিষয়ে নানাবিধ সংশয় হয়ে থাকে। গুরুতত্ত্ব বিষয়ে ঐ সব জ্ঞানলাভ সাধুসঙ্গেই হয়। ভগবদ্ভক্ত সাধু

মহতের সঙ্গ ব্যতীত গুরুতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। এইজন্যই শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রেয়ঃকামী সাধন-ভজনেচ্ছু মানবগণকে সর্বপ্রথম সৎসঙ্গ করার উপদেশ প্রদান করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব স্বীয়মাতা দেবহূতির প্রতি বলেছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

( ভাঃ ৩।২৫।২৫ )

অর্থাৎ "সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হলে আমার মাহাত্ম্য-সূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সমুদিত হয়। প্রীতির সহিত ঐ কথার নিষেবণে অবিদ্যা নিবৃত্তির পন্থাস্বরূপ আমাতে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তির উদয় হয়ে থাকে।" তাৎপর্য এই যে, মহতের শ্রীমুখে ভাগবতীকথা শ্রবণে প্রথমতঃ শ্রদ্ধালাভ তদনন্তর সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে ভজন সম্পদ্‌লাভের ফলে ক্রমশঃ রতি ও প্রেমের উদয় হয় বলে জানতে হবে। এই সংসারে অনাদিকাল থেকে নানা যোনীতে ভ্রাম্যমান্ জীবকুলের ভগবদিচ্ছায় সংসারমুক্তির দ্বারস্বরূপ নরদেহ লাভ হয়ে থাকে। সেই নরগণের মধ্যেও যাঁরা পরম সুকৃতিমান্ তাঁদেরই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। ভগবদ্ভক্ত সাধু মহানু-ভবগণের শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে বিষয়রাগ-বিদূষিতচিত্ত একটু নির্মল হলে দেহ-দৈহিকাদির অনিত্যতার উপলব্ধি হয় এবং এই অনিত্য সংসার সিন্ধুর ন্যায় দুষ্পার মনে হয়। তখন এই সু-দুস্তর কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকর সঙ্কুল অতি দুঃখময় সংসারসিন্ধুর

পরপারে গিয়ে নিত্যানন্দময় শ্রীভগবৎ পাদপদ্মলাভের নিমিত্ত প্রাণে ব্যাকুলতা জাগে এবং এই নরদেহরূপ সুদৃঢ় তরণীতে একটি যোগ্য কর্ণধারের অনুসন্ধান হয়—তিনিই 'শ্রীগুরু'। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বলেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
(ভাঃ ১১ ২০।১৭)

"হে উদ্ধব! এই নরদেহ আদ্য' অর্থাৎ সকল ফলের মূল এবং 'সুকল্প' অর্থাৎ কার্যসাধনপটু। জীব সুদুর্লভ এই নরদেহ সুলভ করে পেয়েছে। এই দেহরূপ নৌকায় শ্রীগুরুদেবই কর্ণধার। সর্বোপরি আমি অনুকূল বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়ে এটি চালিয়ে থাকি। যারা এই দেহ পেয়েও ভবসিন্ধুর পরপারে যাবার নিমিত্ত প্রযত্ন না করে, তারা আত্মহা অর্থাৎ নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে থাকে।"

সৎসঙ্গেই গুরু পাদাশ্রয়ের কর্তব্যতার উপলব্ধি হয়, তা আমরা বলেছি। যেখানে গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান হয়নি সেখানে ভক্তসঙ্গই হয়নি বলেই বুঝতে হবে। যেখানে ভক্তসঙ্গ লাভ হয়েছে বা হচ্ছে অথচ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের কর্তব্যতার অনুভব নেই, অথবা গুরুপাদাশ্রয় করা হয়নি; সেখানে হয় যথার্থ ভক্তসঙ্গই হয়নি কিংবা কোন দুষ্কৃতি বশতঃ সৎসঙ্গের ফলোদয় এখনও হয়নি বলেই বুঝতে হবে। যতদিন পর্যন্ত শ্রীগুরুপাদাশ্রয় লাভ

না ঘটে, ততদিন ভক্তসঙ্গের চরমফলই হবে—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। কারণ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণের পরই ভজনারম্ভ হয়ে থাকে।

## সদ্‌গুরুর লক্ষণ।

সাধনভজনের ফল লাভ করে ধন্য হতে হলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়কামী ব্যক্তিকে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। সতে বা সাধুব্যক্তিতে গুরুত্বশক্তির আবির্ভাব হলেই তিনি 'সদ্‌গুরু' পদবাচ্য হয়ে থাকেন। সাধুপুরুষে গুরুত্বশক্তির আবির্ভাবের প্রণালী এইরূপ যে, সাধন-ভজনের দ্বারা—যাঁদের চিত্তমালিন্য অপসারিত হয়ে ভক্তির আবির্ভাবে হৃদয় দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ বিভূষিত হয়েছে, মায়াবদ্ধজীবের সংসার দুঃখ দর্শনে তাঁদের অন্তর করুণায় বিগলিত হয়ে উঠে। তাঁরা ভজনোপদেশদ্বারা সংসারী মানবের দুঃখ দুর্দশা নাশ করে ভক্তিরসের আস্বাদনদানে তাদের ধন্য করবার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হয়ে পড়েন। ভগবদিচ্ছায় সেই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষগণের অন্তরে শ্রীভগবান থেকে গুরুত্বশক্তির আবির্ভাব ঘটে। ভগবদ্ভক্তিকামী ব্যক্তি তাদৃশ যোগ্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেই ধন্য হয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাদৃশ গুরুর লক্ষণ বর্ণিত আছে—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (১১.৩.২১)

"অতএব উত্তম শ্রেয়-জিজ্ঞাসুব্যক্তি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে

নিষ্ণাত, উপশমাশ্রয় বা কাম, লোভাদিশূন্য সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করবেন। "শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্। অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাৎ। পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্। অন্যথা বোধ-সঞ্চারাযোগাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্ব দ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়মিতি।" (শ্রীধরটীকা) তাৎপর্য এই যে, সদ্‌গুরু শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত বা তত্ত্বজ্ঞ হবেন, তা না হলে আশ্রিত শিষ্যের অন্তরের সন্দেহ নিরসন করতে পারবেন না। আবার পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ ভক্তিমান্ বা শ্রীকৃষ্ণে অপরোক্ষানুভব সম্পন্ন হবেন, অন্যথায় শিষ্যের মধ্যে ভজনানুভব সঞ্চার করতে পারবেন না।' প্রশ্ন হতে পারে, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য দেখে তিনি যে শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত তা জানা গেলেও তিনি যে পরব্রহ্মে নিষ্ণাত বা শ্রীকৃষ্ণে অপরোক্ষানুভবসম্পন্ন তা কিরূপে বুঝা যাবে? তারই উত্তরে বলা হয়েছে—তিনি 'উপশমাশ্রয়' অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভাদি পরিশূন্য হবেন। ভক্তির আলোকসম্পাতে তাঁর অন্তরে কামাদি তিমির থাকবে না। সুতরাং শাস্ত্রনির্দিষ্ট সদ্‌গুরুর লক্ষণ এই—

(১) যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভজন করে ভগবদনুভূতি সম্পন্ন এবং স্বীয় গুরুচরণেও তত্তুল্য ভক্তিলাভ অর্থাৎ শ্রীগুরুর কৃপালাভ করেছেন।

(২) যিনি বেদ ও বেদের যথার্থ তাৎপর্য-জ্ঞাপক শ্রীমদ্ভা-

গবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ এবং শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা শিষ্যের সংশয় ছেদনে সমর্থ।

(৩) যিনি শ্রীকৃষ্ণে অপরোক্ষানুভব হেতু তাঁর কৃপাশক্তি লাভ করে এরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়েছেন যে, শিষ্যের মধ্যেও সেই শক্তি সঞ্চার করে ভক্তি পথে আনতে সক্ষম।

(৪) যিনি কাম, লোভাদির বশীভূত নন।

এই গুণগুলি যে সাধুপুরুষে বিদ্যমান এবং যিনি আশ্রিত শিষ্যজনে বাৎসল্যযুক্ত, তিনিই সদ্‌গুরু পদবাচ্য হতে পারেন। এই সদ্‌গুরুই শিষ্যের ভজনের প্রতিকূল বিবিধ অনর্থ বিনাশ করে ও তাঁকে প্রেম দানে ধন্য করে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সমীপে পৌঁছে দিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে কোন গুরুপরিচয়লিপ্সু ব্যক্তিতে সৎকুলাদি বহু গুণ বিদ্যমান থাকলেও উল্লিখিত লক্ষণ বিহনে তিনি সদ্‌গুরু পর্যায়ে পরিগণিত হতে পারবেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনেচ্ছু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত সদ্‌গুরুর লক্ষণান্বিত মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ পূর্বক ভজনশিক্ষা করবেন।

## সদ্‌গুরুর সামান্য লক্ষণ।

শব্দব্রহ্ম (বেদে) ও পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণে) নিষ্ণাত, পরমশান্ত, শ্রীকৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্যানুভবী, শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতচিত্ত, নির্মলাঙ্গ (ব্যাধিরহিত), কামাদি ষড়্‌বর্গজয়ী, শ্রীকৃষ্ণে গরিষ্ঠ-রাগ-ভক্তির বহনকারী, বেদ, শাস্ত্র ও আগমাদির বিমল-পথজ্ঞ, সাধুগণের সম্মত, দান্ত, (জিতেন্দ্রিয়) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই শ্রীগুরুপদবাচ্য। (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২—৩৫)

## বিশেষ লক্ষণ।

পাতিত্যাদি-দোষহীন বংশে জাত, স্বয়ং পাতিত্যাদি-হীন, স্বোচিত আচারে তৎপর, আশ্রমী, অক্রোধ, বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধালু, অসূয়াহীন, প্রিয়বাক্, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, তরুণ, সর্বজীবের হিতে রত, বুদ্ধিমান্, অনুদ্ধতমতি, পূর্ণাকাঙ্ক্ষ, অহিংসক, তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদিযুক্ত, ভগবৎপূজায় কৃতমতি, কৃতজ্ঞ, শিষ্য-বৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোমমন্ত্র-পরায়ণ, তর্কবিতর্কের প্রকারজ্ঞ, শুদ্ধাত্মা, দয়ালু ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট গুরুই গরিম-নিধি (ঐ ১।৩৮—৪১)।

## গুরুকৃপার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীহরিকৃপা ও শ্রীগুরুকৃপায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, 'শ্রীহরি যাকে অধোনয়নের ইচ্ছা করেন, তাকে অসাধু কর্ম করান, দৈত্যগণকে বিপরীত উপদেশ প্রদান করেন,' কিন্তু আচার্য সকলকে উর্ধ্বস্তর প্রাপ্ত করাতে চান এবং সাধু কর্মই করান, তিনি সর্বত্রই যথার্থ কথা বলেন। অতএব গুরুকৃপাই স্পৃহণীয়।

"শাস্ত্রোক্তং ধর্ম্মমুচ্চার্য্য স্বয়মাচরতে সদা।
অন্যেভ্যঃ শিক্ষয়েদ্ যস্তু স আচার্য্যো নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ "শাস্ত্রোক্ত ধর্ম উচ্চারণ করে যিনি সর্বদা তা স্বয়ং আচরণ করেন এবং অন্যকেও তা আচরণের শিক্ষা প্রদান করেন —তিনিই 'আচার্য' নামে কথিত হন।"

## সদ্গুরু লাভের উপায়।

কেউ কেউ মনে করেন, জগতে প্রকৃত সদ্গুরু অতি বিরল; সুতরাং সদ্গুরু চেনা এবং সদ্গুরু পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এই ভেবে তাঁরা দীক্ষা গ্রহণের প্রযত্ন না করে সুদুর্লভ মানব জীবনের মূল্যবান্ ক্ষণগুলিকে বৃথা অতিবাহিত করেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবানই যখন বিশ্বের হিতকল্পে সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, তখন যথার্থ-ভজনেচ্ছু এবং সদ্গুরু আশ্রয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাশীল ব্যক্তির নিকট তিনি কখনই অলভ্য অথবা দুর্লভ হন না। কুটিলতা বর্জন পূর্বক সরলপ্রাণে সৎসঙ্গ করতে করতে যাঁরা সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য এবং নিষ্কপটভাবে সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে ভগবদ্ভজন করবার জন্য সদ্গুরুলাভের আশায় উৎকণ্ঠিত প্রাণে ভগবদুদ্দেশে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, অবশ্যই তাঁরা সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে ধন্য হন—এতে কিছুমাত্র সংশয় নেই। কৃপাময় শ্রীহরি অতি অবশ্যই তাদৃশ-উৎকণ্ঠাশীল ভজনেচ্ছু জনকে সেই সুযোগ বা সে ভাগ্য দান করে থাকেন।

## শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়।

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ চৌষট্টি ভজনাঙ্গ বর্ণনার প্রথমেই তিনটি অঙ্গের কথা লিখেছেন—"গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্ বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা" (ভঃ রঃ সিঃ ১২৭৪) (১) শ্রীগুরু পাদাশ্রয় (২) শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক ভাগবতধর্ম শিক্ষা

(৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা। "গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষাগুরুর সেবন।" (চৈঃ চঃ)

'গুরুপাদাশ্রয়' বলতে ভগবদ্ভজনেচ্ছু ব্যক্তির দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে কিছুকাল শ্রীগুরুর শ্রীচরণসমীপে বাস করে তাঁর আনুগত্যে অকপটে তাঁর সেবা-শুশ্রূষাদি দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষ বিধান করা প্রয়োজন। শাস্ত্রেও এরূপ গুরু-শিষ্য পরীক্ষার প্রয়োজন বর্ণিত হয়েছে। এতে গুরুশিষ্য উভয়েই পরস্পরের স্বভাব ও যোগ্যতা বুঝতে পারেন। তা না হলে ভবিষ্যতে উভয়েরই ভজনে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। অর্থাৎ গুরু শাস্ত্রীয় লক্ষণযুক্ত না হলে শিষ্যের এবং শিষ্য যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে গুরুর ভজনবিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। কেবল তাই নয় এর একটি মূল্যবান্ ফলও আছে। দীক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠাশীল সাধক কিছুদিন গুরুসমীপে বাস করে গুরুসেবা করলে তাঁর দীক্ষাগ্রহণের এবং ভজনের যোগ্যতাও লাভ হয়। অপরপক্ষে তাদৃশ মহাভাগবতের নিষ্কপট সেবায় শ্রীগুরুতত্ত্ব করুণার্দ্র হয়ে উঠেন। সেবা-সন্তুষ্ট করুণায় বিগলিতচিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে দীক্ষামন্ত্রলাভ সাধকের পুরুষার্থ বিশেষ। এতে সাধক যথার্থ ভজনামৃত-রসাস্বাদনে ধন্যহতে পারেন। এক্ষেত্রে একথাও জ্ঞাতব্য যে, অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেরা দর্শনমাত্রেই শিষ্যের যোগ্যতা পরীক্ষা করে অথবা অযোগ্যজনে যোগ্যতা দান করে তৎকালেই দীক্ষাদি দানে সমর্থ। তাঁদের জন্য সেরূপ কোন নিয়মের অপেক্ষা নেই। একথা কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য নয়।

## দীক্ষা ।

দীক্ষা কাকে বলে ? শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৩ অনুঃ) শাস্ত্রবাণী উদ্ধৃত করে দীক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥"

অর্থাৎ "যা দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের সংক্ষয় করে. তত্ত্ববেত্তা আচার্যগণ কর্তৃক তা-ই দীক্ষা নামে অভিহিত হয়।" "দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ" (শ্রীজীবপাদ) অর্থাৎ এখানে দিব্যজ্ঞান বলতে মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপ জ্ঞান এবং ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ বিশেষ জ্ঞান ।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ ॥" (চৈঃ চঃ)

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হয়েও অনাদিকাল থেকে ভগবদ্বৈমুখ্যহেতু অবিদ্যা মায়াকর্তৃক কবলিত ও মোহমুগ্ধ হয়ে মায়িক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিগ্রস্ত হয়েছে এবং স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মায়িক দেহকেই 'আমি' জ্ঞান করে শ্রীহরির সহিত নিত্যসম্বন্ধ ভুলে স্ত্রী,পুত্র,অর্থ, সম্পদাদিতে সম্বন্ধ পেতে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে ।

"কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥" (চৈঃ চঃ)

এইরূপে জীবকুল স্বরূপতঃ চিদানন্দসত্ত্বা হয়েও মায়ার বন্ধনে পড়ে নানা দুঃখময় জীবযোনীতে নিদারুণ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করে বেড়াচ্ছেন। শ্রীগুরু কৃপাপূর্বক যদ্দ্বারা মায়ার বন্ধন শিথিল করে হৃদয়ে চিদ্‌বৃত্তি ভক্তির সঞ্চার করে শ্রীহরির সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধের বা সম্বন্ধবিশেষের উদ্বোধন করেন—তারই নাম 'দীক্ষা'।

আবার মন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্বরূপ, শ্রীহরির কারুণ্যঘন বিগ্রহ সাধু-গুরুর কৃপায় মন্ত্ররূপে শ্রীভগবান্ শিষ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তার দেহ মন প্রাণকে ভগবৎসেবোপযোগী চিদানন্দময় করে তুলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

"দীক্ষাকালে করে ভক্ত আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥" (চৈঃ চঃ)

সদ্‌গুরু পাদাশ্রয়ের বা দীক্ষা গ্রহণের এতাদৃশ মহিমা জেনেও যাঁরা মনে করেন দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা নেই,হরিনাম করলেই সব হবে; আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁরা যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ শ্রীগোস্বামিপাদগণের এরূপ মত নয়। শাস্ত্রে ও মহাজনবাণীতে দীক্ষাগ্রহণের নিত্যতা এবং মহিমা দেখে তথা পূর্ব পূর্ব মহাজনগণ থেকে অধুনাতন সাধকসমাজ পর্যন্ত সকলের তাদৃশ সদাচার লক্ষ্য করেও

যারা সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে বিমুখ, তাদের নামগ্রহণটি নামাপরাধেই পর্যবসিত হয়। এতে একদিকে যেমন শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে অবহেলা অপরদিকে তেমনি গুরুতত্ত্বে অবজ্ঞা—এই দ্বিবিধ প্রবল অপরাধই আপতিত হয়ে থাকে।

## দীক্ষামন্ত্র।

দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সমস্ত মন্ত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই প্রধান। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বা নিখিল ভগবৎস্বরূপের মূল। শ্রীকৃষ্ণেরও আবার বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা এই ত্রিবিধ লীলাধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপলীলাতে ভগবত্তার সার মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য বৃন্দাবন-লীলার মন্ত্রসমূহই শ্রেষ্ঠ। আবার চরমোৎকর্ষময় মধুররসের লীলার সংঘটক দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর 'গোপীজনবল্লভ' মন্ত্রই-সর্বশ্রেষ্ঠ। গ্রন্থাদিতে সবমন্ত্র লিখিত থাকলেও উহার জপে কোন ফল হয় না, সদ্‌গুরুর নিকট থেকেই মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কেউ কেউ যোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক হরেকৃষ্ণেতি মহামন্ত্রকে ও দীক্ষামন্ত্ররূপে গণনা করেন, কিন্তু কোন দীক্ষাপদ্ধতিতে হরিনাম মহামন্ত্রকে দীক্ষামন্ত্ররূপে গণনা করা হয় নি। কারণ যার উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন হয়, তা দীক্ষামন্ত্র কিরূপে হতে পারে? তবে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে কোন কোন স্থলে কর্ণশুদ্ধি ও চিত্তশোধনের জন্য হরিনাম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাকে দীক্ষা বলা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে, 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নামকে যখন 'মহামন্ত্র'

বলা হয়, তখন এর গ্রহণে দীক্ষা-সিদ্ধ হবে না কেন ? এর উত্তর এইযে, প্রেমদান বিষয়ে সব মন্ত্র অপেক্ষাও হরেকৃষ্ণেতি নাম মহান্ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলেই একে মহামন্ত্র বলা হয়; তথাপি চতুর্থ্যন্তপদ ও ঋষ্যাদি ষড়ঙ্গ না থাকায় এটি দীক্ষা মন্ত্র নয়। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে নামকীর্তনের সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে দীক্ষা শিক্ষা গ্রহণ পর্যন্তই ফল এবং দীক্ষা গ্রহণের পর নামকীর্তনের প্রেমপ্রাপ্তি পর্যন্ত ফল বলে জানতে হবে।

## দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু।

যিনি মন্ত্রদান করেন তাঁকে দীক্ষাগুরু এবং যিনি ভজন শিক্ষা দান করেন তাঁকে শিক্ষাগুরু বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।" অর্থাৎ "শ্রীগুরুর নিকট থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করে 'তেন' অর্থাৎ তাঁর নিকট থেকেই মন্ত্রবিধি শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করবে।" তাহলে বুঝা যাচ্ছে দীক্ষাদান যাঁর কার্য, মন্ত্রবিধি বিষয়ক শিক্ষাদানও তাঁরই কার্য। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, সুতরাং যিনি সদ্‌গুরু হবেন, তাঁর ভজনশিক্ষা দানের সামর্থ্য নেই, একথা মনে করলে গুরুর গৌরব হানিরূপ অপরাধে লিপ্ত হতে হয়। তবে যদি ভজনশিক্ষা গ্রহণের পূর্বেই দীক্ষাগুরু অপ্রকট হন, তখন তাদৃশ ভজননিপুণ মহৎকে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ-করে ভজনশিক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীগুরুজ্ঞানে তাঁহার সেবা পরিচর্য্যাদি করা বিধেয়। যে গুরুর আশ্রয়ে ভজনজীবনে ভজনশিক্ষা করা যায় তাঁকে শিক্ষাগুরু

বলা হয়। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণই জীবকে ভক্তি প্রদানের জন্য অন্ত-র্যামী শিক্ষাগুরু এবং বাইরে ভক্তশ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে আবির্ভূত হয়ে জীবকে আত্মসাৎ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত—

"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥"

এইবাক্যে জানা যায়, অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই প্রকার শিক্ষাগুরুর মধ্যে যিনি অন্তর্যামিরূপে শিক্ষা দেন, তিনি প্রত্যক্ষ হন না ; তাঁকে চৈত্যগুরু বলা হয়। যিনি পরমাত্মারূপে বহির্মুখ জীবের নিয়ামক ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক, সেই পরমাত্মা ভক্তের হৃদয়ের নিয়ামক নন। সুতরাং তিনি ভক্তের চৈত্যগুরুরূপে শিক্ষা প্রদান করেন না। যে ভগবৎস্বরূপ যে ভক্তের ইষ্টদেব-রূপে পূজিত হন, সেই ভগবৎস্বরূপই সেই ভক্তের অন্তর্যামী শিক্ষাগুরুরূপে চিত্তে আবির্ভূত হয়ে নিজ বিষয়ক ভাববিশেষের রীতি-নীতির প্রেরণাদ্বারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আবার ভক্ত-শ্রেষ্ঠরূপে বাইরে যিনি প্রত্যক্ষভাবে শিষ্যকে ভজনশিক্ষা দিয়ে থাকেন, তিনিও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণই।

কেউ কেউ শিক্ষাগুরুর নিকট থেকে শিক্ষামন্ত্র গ্রহণ না করলে ভজন হয় না, এরূপ অশাস্ত্রীয় মতবাদ প্রচার করে থাকেন। শাস্ত্র ও মহাজনমতে 'শিক্ষামন্ত্র' বলে কোন মন্ত্রের বিধান নেই। সুতরাং এরূপ অশাস্ত্রীয় ভ্রান্ত মতবাদে কেউ যেন প্রতারিত না হন।

## শ্রীগুরুর সেবন ।

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেই যে সাধকের কর্তব্যের সমাপ্তি হল তা নয়। দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীগুরুদেবের সেবার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা সাধকের ভজন-বিরোধী নিখিল অনর্থনাশের এবং ভগবৎপ্রসন্নতার মূলহেতু। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ-ভক্তিসন্দর্ভে লিখেছেন, "তৎপ্রসাদো হি স্ব স্ব নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ ভগবৎপরমপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।" অর্থাৎ "সাধকের নিজের নানাপ্রতিকারের দ্বারা দুস্ত্যজ যে অনর্থসমূহ তার নাশ বিষয়ে এবং শ্রীহরির পরম প্রসন্নতার সিদ্ধি বিষয়ে শ্রীগুরুর প্রসন্নতাই মূলকারণ।" শ্রীল গোস্বামিপাদের এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সাধক যখন ভজনমার্গে প্রবর্তিত হন, তখন তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের অথবা এইজন্মের অপরাধাদি হতে জাত নানাপ্রকার গুরুতর অনর্থ উদিত হয়ে সাধন-ভজনের ব্যাঘাতক হয়। অথচ সাধক স্বয়ং নানাবিধ প্রতিকারের চেষ্টা করেও সেই সব অনর্থের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে সক্ষম হন না। সেই সব অনর্থনাশের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুর প্রসন্নতা।

আবার শ্রীভগবানের প্রসন্নতার সিদ্ধি বিষয়েও শ্রীগুরুর প্রসন্নতাই একমাত্র মূলকারণ। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ভজন-সাধন এবং তার ফল প্রাপ্তি অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনর্থনাশ করে সপ্রেম শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি এ সবের মূলেই রয়েছে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা।

আবার শ্রীগুরুদেবের এতাদৃশ প্রসন্নতা লাভের উপায়ও হচ্ছে—নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা। শ্রীগুরুসেবা বা গুরুভক্তির দ্বারা নিখিল অনর্থনাশের কথা শ্রীমদ্ভাগবত থেকেও জ্ঞাত হওয়া যায়—

"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥"

( ভাঃ ৭।১৫।২২—২৫ )

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বল্লেন—'হে রাজন্! কাম জয় করতে হলে সংকল্প বর্জিত হওয়া চাই অর্থাৎ নিঃশেষরূপে বাসনা জয় করতে পারলে কাম জয় হয়। ক্রোধ জয় করতে হলে কাম বিবর্জন করা চাই, কারণকাম প্রতিহত হয়েই ক্রোধ হয়। অর্থে অনর্থ দৃষ্টির ফলে অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুমাত্রেই অনর্থ জ্ঞান করলে লোভ জয় করা যায়। তত্ত্ববিচারে অর্থাৎ নিরন্তর তত্ত্বানুশীলনে ভয় দূরীভূত হয়। আন্বীক্ষিকী জ্ঞানবলে বা প্রকৃতি পুরুষের বিবেকোদয়ে শোক মোহ নাশ হয়। সাধুপুরুষের সেবায় দম্ভ জয় হয়। মৌন-ব্রত সিদ্ধ হলে কৃষ্ণেতর বার্তা ত্যাগে মনের একাগ্রতা সম্পাদিত

হয়। কামচেষ্টা ত্যাগ করলে হিংসা দূরীভূত হয়। কৃপাগুণ অর্জন করলে আধিভৌতিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সমাধি বলে আধিদৈবিক তাপের নাশ হয়। অষ্টাঙ্গযোগ প্রভাবে আধ্যাত্মিক ক্লেশের উপশম হয়। সত্ত্বগুণের নিষেবণে নিদ্রা জয় করা যায়। সত্ত্ববর্ধনে রজস্তমের জয় হয়। এইরূপ এক একটি সাধনে এক একটি অনর্থের বিনাশ সাধিত হয়ে থাকে, কিন্তু সাধক একমাত্র গুরুভক্তির ফলে যুগপৎ নিখিল অনর্থ অনায়াসে জয় করতে সমর্থ হন। এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যে অনর্থ জয় বিষয়ে গুরুসেবার গুরুত্বের এবং বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি হয়।

## বিশেষ গুরুসেবা।

ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিদ্ধ্যতি ...... তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ "যদ্যপি ভগবৎপাদপদ্মেশরণাগত সাধকের শরণাপত্তির দ্বারাই সর্বসিদ্ধ হয় বটে, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সু ব্যক্তি যদি সমর্থ হন, তাহলে ভগবৎ-শাস্ত্রোপদেষ্টা শিক্ষাগুরুর ও ভগবৎ-মন্ত্রোপদেষ্টা দীক্ষাগুরুর বিশেষভাবে নিত্যই সেবা করবেন।"

শ্রীল গোস্বামিপাদ "বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ" এইবাক্যে 'বিশেষতঃ' পদটি প্রয়োগ করে বিশেষ গুরুসেবার ইঙ্গিত করেছেন। বিশেষসেবা বল্লে একটি সামান্য সেবার কথাও জানা যায়।

দীক্ষাগ্রহণের পর সাধক নিত্যই শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দনাদি দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করে থাকেন। শ্রীগুরুদেবের অর্চন, বন্দনাদিও তারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব যেস্থলে ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনাঙ্গ মুখ্য বা অঙ্গী হয়ে শ্রীগুরুর অর্চন, বন্দনাদি সেবাটি তার অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাকেই সামান্যতঃ গুরুসেবা বলা হয়। শ্রীগুরুভক্তি বা গুরুভজন সহচররূপে থেকে ভগবৎ-ভজনাঙ্গ সাধনায় সাধকের ভগবৎপ্রেমফল লাভ হয়ে থাকে। নিষ্কপট গুরুভক্তি সমন্বিত ভগবদ্ভজনই সফল হয়, এটিই সাধন-রাজ্যের নিয়ম।

আবার যদি কোন একান্ত গুরুভক্তি-পরায়ণ বা গুরুসেবা-নিষ্ঠ সাধক শ্রীগুরুর সেবা পরিচর্যাকেই মুখ্য রেখে ভগবৎ-শ্রবণ কীর্তনাদি ভজনাঙ্গ তাহার আনুষঙ্গিকরূপে অনুষ্ঠান করেন তাকেই বিশেষ গুরুসেবা বলা হয়। সেখানে গুরুপরিচর্যাদি প্রধান বা অঙ্গী-স্বরূপ হয় এবং ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্তনাদি অঙ্গরূপ হয়ে থাকে। এরূপ বিশেষ গুরুসেবানিষ্ঠ সাধককে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ 'বৈশিষ্ট্যলিপ্সু' বলেছেন। এভাবে ঐকান্তিক গুরুসেবানিষ্ঠ সাধকের প্রতি শ্রীভগবানের ( নিজসেবা অপেক্ষাও ) সমধিক করুণারাশি বর্ষিত হয়ে থাকে। শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীদেবহূতিস্তবে দৃষ্ট হয়—

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ ॥"

অর্থাৎ "শ্রীহরিতে আমার যেরূপ ভক্তি আছে, তার থেকে যদি গুরুতে অধিক ভক্তি হয়, তবে সেই সত্যের দ্বারা তিনি আমায় দর্শন দান করুন।" শ্রীগুরু তুষ্ট হলে শ্রীহরি স্বভাবতঃই তুষ্ট হয়ে থাকেন। শ্রীবামনকল্পে দেখা যায়—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরি স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥"

অর্থাৎ 'যা মন্ত্র তা গুরুই সাক্ষাৎ এবং যিনি গুরু তিনি হরিই স্বয়ং, যাঁর প্রতি গুরু তুষ্ট হন, স্বয়ং হরিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।'

## শ্রীগুরুসেবায় সাবধানতা।

এতাদৃশ মহামহিম শ্রীগুরুসেবায় সাধককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলেছেন—"শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, কেবল ভক্তি-সদ্ম, বন্দোঁ মুই সাবধান মনে।" কোনরূপে যদি শ্রীগুরুতত্ত্বে লঘুতাবুদ্ধি বা মনুষ্যবুদ্ধি জন্মে, তাহলে "গুর্ব্বজ্ঞা" রূপ নামাপরাধ জাত হয়ে সাধককে গুরুসেবার এই গুরুত্বপূর্ণ ফল থেকে বঞ্চিত করে দেয়। সাবধানতা যথা - শ্রীগুরুর বাক্য কখনও লঙ্ঘন করবে না। গুরুর পাদুকা, বস্ত্র, স্নানজল, শয্যা প্রভৃতি তাঁর ব্যবহার্য বস্তুসমূহ কখনও লঙ্ঘন করবে না। যথা তথা যেমন তেমন ভাবে শ্রীগুরুর নামোচ্চারণ করবে না। একান্ত প্রয়োজনে প্রণত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে 'অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রী' 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' 'প্রভুপাদ' ইত্যাদি সম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ

করে তারপর নাম বলবে। গুরুর গমন, তাঁর ভাষণ, তাঁর স্বরাদি কোন চেষ্টার অনুকরণ কখনও করবে না। গুরুর সন্নিধানে পাদ-প্রসারণ করে, উরুর উপরে পদ স্থাপন করে, নিজের পদ দেখা যায় এমনভাবে কখনও বসবে না। গুরুদেবের অগ্রে হাইতোলা, উচ্চহাস্য, অঙ্গুলিস্ফোটন, অঙ্গ দোলানো, হস্ত-পদাদি শরীরের কোন অংশ নাচানো প্রভৃতি করবে না। গুরুর সম্মুখে গমন করে তাঁর আদেশ ভিন্ন বসবে না, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়-মান থাকবে। শ্রীগুরুর সমীপে শয্যায় শয়ন করবে না।

শ্রীগুরুর নিকট অবস্থানকালে তাঁর আদেশ না নিয়ে কুত্রাপি গমন করবে না। গুরুর অগ্রে অন্যের পূজা-বন্দনাদি করবে না। গুরুর সমীপে শাস্ত্রব্যাখ্যা, দীক্ষাদান শ্রীগুরুর আজ্ঞাভিন্ন করবে না। শ্রীগুরুর সমক্ষে অন্যের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ, অন্যকে তির-স্কারাদি করবে না। শ্রীগুরুদেবের প্রতি আজ্ঞাসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ অথবা হস্তচালন, নয়ন চালনাদি দ্বারা কোন সাঙ্কেতিক ব্যবহার করবে না। শ্রীগুরুর তাড়নভর্ৎসনাদিতে সর্বদা সহিষ্ণু হবে, কদাপি তাঁর প্রতি বিদ্বেষাচরণ করবে না। শ্রীগুরুর কোন দ্রব্য তাঁকে না জানিয়ে গ্রহণ করবে না। গুরুর সম্মুখে মৌনভাবে থাকা, তাঁকে স্তবাদি না করা, ভজন বিষয়ক কোন প্রশ্নাদি না করা অপরাধজনক। মৌনব্রত অবলম্বন করলেও গুরুর নিকট মৌন ব্রতী হবে না।

মাৎসর্যবশতঃ যদি কোনব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নিন্দা করে,

অথবা তাঁর মহিমার অপকর্ষ করে সেখানে যাবে না। দৈবাৎ গুরুনিন্দাদি শুনলে কর্ণে হস্ত দিয়ে শ্রীহরিস্মরণ করে সে স্থান ত্যাগ করবে। গুরুনিন্দুকের সঙ্গ, তার সঙ্গে বাস, এমনকি তার মুখদর্শন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। শ্রীগুরুদেব আগমন করছেন দেখলে তাঁর অগ্রবর্তী হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হবে, তিনি গমন করলে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করবে।

শ্রীগুরুর পাদপ্রক্ষালন, স্নানাদির জল স্বয়ং আহরণ করবে। শ্রীগুরুদেবের অঙ্গমার্জন, স্নপন, চন্দনাদি অনুলেপন, বস্ত্রধৌত, পাদ-সংবাহনাদি স্বয়ং করবে। শ্রীগুরুদেবের গৃহ, অঙ্গনাদি মার্জন লেপন নিজেই করবে। শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করে ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করবে। সর্বদা সরল প্রীতিময়-ভাবে স্নিগ্ধান্তকরণে কায় মনোবাক্যে স্বীয় দেহ, গেহ, ধন, প্রাণাদির দ্বারা সতত শ্রীগুরু-দেবের সন্তোষ বিধান করবে। শ্রীগুরু-বিষয়ক এই বিধি নিষেধ-গুলি পালন করলে সাধকব্যক্তি অচিরায়-শ্রীগুরু সেবার চরমফল ভগবৎপাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করে ধন্য বা কৃত-কৃতার্থ হয়ে থাকেন।

## দু'একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে লিখেছেন, "এষা তু ভক্তিস্তন্নিত্যপরিকরগণাদারভ্যেদানীন্তনেষ্বপি তদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীব প্রচরতি। ............ সা তথাভূতা নিত্যধাম্নি নিত্যপার্ষদেষু নিত্যং চকাস্তি সুরসরিদিব তদ্ভক্তপ্রণাল্যা প্রপঞ্চেঽ-

বতরতি।" অর্থাৎ "এই ভক্তি শ্রীহরির নিত্য পার্ষদগণের থেকে আরম্ভ করে ইদানীন্তন সাধকভক্তে মন্দাকিনীর ন্যায় প্রচারিত হয়ে থাকেন। ভক্তি নিত্যধামে নিত্যপার্ষদগণে নিত্যই অবস্থান করেন এবং মন্দাকিনীধারার ন্যায় শ্রীহরির ভক্তরূপ প্রণালিকার মধ্য দিয়ে প্রপঞ্চলোকে অবতরণ করেন।" তাৎপর্য এইযে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-নিঃসৃতা মন্দাকিনীধারা যেমন শ্রীভগবানের চরণ হতে প্রবাহিতা হয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এইতিন লোককে পবিত্র করছেন তদ্রূপ শ্রীহরির স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির সারবৃত্তি ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভক্তপ্রণালিকার (গুরুপ্রণালিকার) মধ্য দিয়ে বিশ্ব-সাধকগণের হৃদয়ে অবতরণ করেন। সদ্‌গুরুর নিকট থেকে সাধক এই শ্রীগুরুপ্রণালী প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

ইদানীং এই বিশেষ কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করে ব্রজের উন্নত উজ্জ্বলরসগর্ভা ভক্তি মঞ্জরীভাবসাধনা বিশ্বমানবকে বিতরণ করেছেন। যাঁরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অনর্পিতচরী করুণার অবদান মঞ্জরীভাবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে ধন্য হতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা তাদৃশ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করবেন এবং তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত শ্রীগুরুপ্রণালী ও সিদ্ধপ্রণালী অবলম্বনে ভজন করবেন।

শ্রীগুরুসেবা বা গুরুভক্তির ফলে সাধক নিখিল অনর্থ অনায়াসে জয় করে ধন্য হয়ে থাকেন, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শ্রীহরির করুণা দুটি ধারায় বিশ্বে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন,

— একটি শ্রীবৈষ্ণব, অপরটি শ্রীগুরু। বৈষ্ণবের সঙ্গ-মহিমায় শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের কর্তব্যতা জ্ঞানের উদয় হয় এবং বৈষ্ণবের কৃপার ফলেই সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় লাভ ঘটে। বৈষ্ণবগণ কৃপা করে ভগবদ্ভজনের মূল শ্রীগুরুরূপ অমূল্যসম্পদ্ আমাদের দান করে থাকেন। সুতরাং প্রেমলাভেচ্ছু সাধককে শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণব উভয়ের সেবাই সমভাবে করতে হবে! ভগবদ্ভক্তিময়বিগ্রহ শ্রীবৈষ্ণব ও ভগবদ্ভক্তিময় বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবদবতার শ্রীগুরু উভয়ের অনুগ্রহ মিলিত হয়ে সাধকের ভক্তিসাধনার পূর্ণতা সম্পন্ন করে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন—

"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাসে কয়, জীবার উচিত নয়,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা বিনে॥"

শ্রীভগবদনুগ্রহ দ্বিধাভূত—শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণব। গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা এই দুটি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের করুণারই সেবা। একটির অভাবে অন্যটি অপূর্ণই থেকে যায়। যদি গুরুসেবা করা হয় এবং বৈষ্ণবসেবায় আগ্রহ না থাকে, তবে তা পূর্ণ গুরুসেবা নয় এবং বৈষ্ণবসেবা করা যায় অথচ গুরুসেবায় আগ্রহ নেই, সেটিও পূর্ণ বৈষ্ণবসেবা হয় না! এইজন্য সদ্‌গুরু স্বীয় আশ্রিত শিষ্যকে শ্রীবৈষ্ণবচরণে সমর্পণ করে বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা করে ধন্য হবার উপদেশ প্রদান করে থাকেন এবং সদ্‌বৈষ্ণবও স্বীয় আশ্রিত জনকে

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় ধন্য হবার উপদেশ দিয়ে থাকেন।

গুরু যদি মৎসরাদি বশতঃ শিষ্যকে মহাভাগবত বৈষ্ণবের সেবাকার্যে অথবা সঙ্গ করতে নিষেধ করেন, তাহলে শিষ্যব্যক্তি এটি শ্রীগুরুদেবের শিষ্যের প্রতি তার বৈষ্ণবভক্তির পরীক্ষা মনে করে শ্রীগুরুচরণে প্রপন্ন হয়ে কাতরতার সহিত ঐরূপ আদেশ প্রত্যাহারের প্রার্থনা জানাবেন। তবু যদি গুরুদেব পুনঃপুনঃ ঐরূপ আদেশ দিতে থাকেন তবে শিষ্য নিজের দুর্ভাগ্য মনে করে ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হয়ে সেই গুরুকে দূর হতে আরাধনা করবেন কিন্তু সেই গুরুকে ত্যাগ করবেন না অথবা তাঁর প্রতিকূলাচরণ করবেন না। আর গুরু যদি সাক্ষাদ্ভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষী হয়ে উঠেন তবে তাদৃশ গুরুকে অবৈষ্ণব জ্ঞানে পরিত্যাগ করে পুনরায় যথা-বিধিমতে বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয়ে ভজন করবেন। শ্রীমৎ জীব-গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সুস্পষ্টভাবেই এটি নিরূপণ করেছেন।

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধিয়তে॥"

ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনঃ ইত্যাদিবচনবিষয়াচ্চ।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ—২৩৮ অনুঃ)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বৈষ্ণবশাস্ত্র-নীতির বিরুদ্ধ কথা বলে এবং যে জন ঐ নীতিরহিত কথা শ্রবণ করে, তারা উভয়েই অক্ষয়কাল ব্যাপী ঘোর নরকে বাস করে।" শ্রীগুরুদেবের কোন উপদেশ যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তবে তাদৃশ গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগ করে দূর থেকে তাঁর আরাধনা করা উচিৎ। গুরু যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হন, তবে তাঁকে পরিত্যাগ করাই মঙ্গল। 'দ্বেষ' শব্দে 'নিন্দা' অর্থও বুঝায়, "নিন্দাপি দ্বেষ সমাঃ" ( ভক্তিসন্দর্ভঃ )। বৈষ্ণবদ্বেষ বা নিন্দার উপলক্ষণে ছয় প্রকার বৈষ্ণবাপরাধও বুঝতে হবে। অতএব বৈষ্ণবাপরাধী গুরুপদের যোগ্য নন। এজন্যই তাঁকে পরিত্যাগের বিধান। বিষয়াসক্ত, কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ ও উৎপথগামী ( ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচরণকারী ) গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। কারণ সেই গুরু বৈষ্ণবভাব-রহিত বলে অবৈষ্ণব। 'অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রে নরকগতি হয়ে থাকে' এই শাস্ত্রবাণীতেও অবৈষ্ণব গুরুত্যাগের বিধান দৃষ্ট হয়।

ত্যজ্যগুরু বিষয়ে বিচার এই যে,—গুরু যদি বিসদৃশ কার্য করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবদ্বেষাদি অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহার করেন, কিম্বা ঈশ্বরে ভ্রান্ত হন, অর্থাৎ নিজেকে ঈশ্বররূপে প্রচার করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ গুণ কথা শ্রবণ-কীর্তনে বিমুখ থাকেন, শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা শ্রবণাদি জনিত আনন্দানুভব করেন না। আবার হরিভি-

মানিতাবশতঃ লোকের স্তবদ্বারা প্রমত্ত হয়ে দিনদিন মলিনতা প্রাপ্ত হন তবে তাঁকে পরিত্যাগ করে যোগ্যগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই বিধেয়।
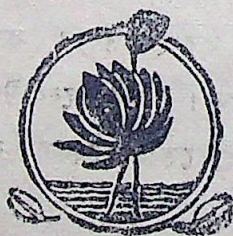
# শ্রীভক্ততত্ত্ববিজ্ঞান

## ভক্ত কাকে বলে ?

ভগবদ্‌ভক্তি যাঁদের আছে, মুখ্যতঃ তাঁদেরই 'ভক্ত' বলা হয়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ" ( ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৭৩ ) অর্থাৎ যাঁদের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁরাই 'কৃষ্ণভক্ত'। এই কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ সাধক ও সিদ্ধ।

"উৎপন্ন-রতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

( ঐ ২।১।২৭৬ )

"শ্রীকৃষ্ণে যাঁদের রতি উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁদের বিঘ্ন নিবৃত্ত হয়নি, যাঁরা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁদের 'সাধক' বলা হয়।"

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥" (ঐ-২।১।২৮০)

অর্থাৎ "যাঁদের অবিদ্যা, অস্মিতাদি নিখিলক্লেশ দূরীভূত হয়েছে, যাঁরা নিত্য কৃষ্ণক্রিয়াশীল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রেমসুখাস্বাদন

পরায়ণ—তাঁরাই 'সিদ্ধ'।" শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে নিমি-যোগীন্দ্র সংবাদে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ভক্তের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। উত্তম ভক্তের লক্ষণ যথা –

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৪৫)

অর্থাৎ "যিনি চেতনাচেতন সর্ব ভূতাধিকরণে স্বীয় অভীষ্ট শ্রীভগবানকে দর্শন করেন এবং স্বীয় চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অভীষ্ট শ্রী-ভগবানেরই আশ্রিতরূপে চেতনাচেতন সকল ভূতকেই দর্শন করেন, অথবা নিজের যে জাতীয় প্রেম শ্রীভগবানে আছে সেই প্রেমের সত্তা সর্বভূতে উপলব্ধি করে থাকেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে উত্তম।" (ক্রমসন্দর্ভ টীকার তাৎপর্যানুবাদ) এই উত্তমভক্তের অবস্থাভেদও আছে- যখন নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানে অনুরাগের গাঢ়তা প্রকাশ পায় তখন আর স্থাবর-জঙ্গমের দর্শন হয় না ; সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্দর্শনই হয়ে থাকে। আবার যখন অনুরাগের কিছু শৈথিল্য ঘটে, তখন স্থাবর-জঙ্গমের মূর্তি দেখা গেলেও তাদের মধ্যে স্বীয় অভীষ্টের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়ে থাকে। এই উত্তম ভক্তের জাতিভেদে অন্যান্য লক্ষণও ভাগবতে ঐপ্রকরণে কয়েকটি শ্লোকে বর্ণিত আছে, আমরা কতিপয় লক্ষণ উদ্ধৃত করছি। যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রসাদি বিষয় গ্রহণ করেও জগতকে বিষ্ণুমায়াময় দেখে তাতে বিচলিত হন না—তিনি ভাগবতোত্তম। যিনি শ্রীহরির স্মৃতিবশতঃ জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা,

ভয় ও পরিশ্রম রূপ সংসারধর্মে বিমুহ্যমান হন না, তিনিও ভাগবতোত্তম। কোনরূপ কর্মবাসনার বীজ যাঁর চিত্তভূমিতে অঙ্কুরিত হয় না, শ্রীবাসুদেবই যাঁর একমাত্র আশ্রয়—তিনিই উত্তম ভাগবত। যিনি স্বীয় ধনে ও পরধনে কিছু মাত্র ভেদ জ্ঞান করেন না, সকলদেহে সমজ্ঞান করেন, সর্বভূতে তুল্যদর্শী হয়ে পরম শান্ত হয়েছেন, তিনিই উত্তমভক্ত ইত্যাদি।

ভক্তিসন্দর্ভের মতে লব্ধ ভগবৎপ্রেম এইসব উত্তম ভক্তেরা ত্রিবিধ—(১) মূর্ছিত কষায়—যাঁদের কষায় বা বাসনা মূর্ছিত বা অতিক্ষীণ হয়েছে, যথা—শ্রীভরত ও দাসীপুত্র জন্মে শ্রীনারদ। (২) নির্ধূত কষায়—যাঁদের বাসনা লেশমাত্রও নেই, যেমন শ্রীশুকদেব। (৩) প্রাপ্ত ভগবৎপার্ষদদেহ—যথা শ্রীনারদ। প্রেমের তারতম্যানুসারে এঁদের মহাভাগবতত্বের তারতম্য হয়। প্রেমের আধিক্য দু'প্রকারে হয়—(১) স্বরূপাধিক্য ও (২) পরিমাণাধিক্য। বিষয় ও আশ্রয়ের দিক্ থেকে স্বরূপাধিক্যের বিচার হয়—অর্থাৎ যাঁর অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম আছে, তিনি অংশাবতার অর্থাৎ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রীতিমান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বিচারে ভগবৎপার্ষদ শ্রীহনুমান, পুণ্ডরীক প্রভৃতি অপেক্ষা মূর্ছিতকষায় শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রেষ্ঠ। এটি বিষয়তত্ত্ব বা ভজনীয় বস্তুর দিক্ থেকে বিচার। আবার ভজনকারীর রতিভেদেও ভক্তের তারতম্য হয়। দাস্যরসের ভক্ত অপেক্ষা সখ্যরসের, তা অপেক্ষা বাৎসল্যরসের, তদপেক্ষা মধুর-

রসের প্রেমিকভক্তের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব। মধুররসের প্রেমিক-ভক্ত যদি মূর্ছিত-কষায় হন, আর প্রাপ্ত পার্ষদদেহ যদি শান্ত, দাস্য, সখ্য অথবা বাৎসল্যরতির ভক্ত হন, তথাপি মধুররতির মূর্ছিত-কষায় মহাজনই রসগতবিচারে শ্রেষ্ঠ হবেন। শ্রীভগবানে প্রীতি যাঁর যত গাঢ় হবে, তিনি তত অধিক প্রেমিক। প্রেমের তারতম্যভেদে ভগবৎপ্রিয়ত্বের তারতম্য। "প্রেমতারতম্যেনৈব ভক্তমহত্তারতম্যং মুখ্যম্" (ভক্তিসন্দর্ভঃ—১৮৭)।

ভগবৎক্ষেত্রের তারতম্যভেদেও প্রেমের তারতম্য হয়ে থাকে, যেমন শ্রীবৈকুণ্ঠের সেবক অপেক্ষা শ্রীদ্বারকার সেবকে প্রীতির আধিক্য, তদপেক্ষা মথুরার সেবকে আধিক্য, তদপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনের, তদপেক্ষা গোবর্ধনের এবং তদপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রেমিক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

প্রেমের পরিমাণাধিক্যে ভক্তত্বের তারতম্য হয়। প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়ে থাকে। অতএব যাঁর স্নেহ-প্রেম-ভক্তি হয়েছে তদপেক্ষা মান-প্রণয়-রাগাদি-প্রেমভক্তির প্রেমিকগণের শ্রেষ্ঠত্ব। যাঁর মহাভাব হয়েছে তাঁর প্রেমের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। এই মহাভাবের ব্রজ ছাড়া অন্যত্র স্থিতি নাই। এখানে অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুররসের আধার একমাত্র গোপীগণেরই প্রেম-সম্পদ্ এই মহাভাব। এই বিচারে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণাশ্রিতা তাঁর অনুচরীগণই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ভক্তগণের ভাবভেদে পঞ্চবিভেদ স্বীকৃত হয়েছে যথা—জ্ঞানভক্ত—ভরতাদি, শুদ্ধভক্ত—অম্বরীষাদি, প্রেমভক্ত—শ্রীহনুমানাদি, প্রেমপরভক্ত—অর্জুনাদি পাণ্ডবগণ ও প্রেমাতুরভক্ত—শ্রীমান্ উদ্ধবাদি যাদবগণ। বৃহদ্ভাগবতামৃতে বিশেষ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা এঁদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীব্রজগোপিকার এককণা শ্রীচরণরেণুর লালসায় শ্রীবৃন্দাবনে তৃণ গুল্ম জন্ম কামনা করেছেন—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমান্ উদ্ধবমহাশয়েরই উক্তিতেই দৃষ্ট হয়। অন্তরে ভক্তি বিরাজ করলে ভক্তের দেহ মনে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর উদয় হয়ে থাকে সুতরাং এগুলিও বৈষ্ণব লক্ষণ বলে জানতে হবে।

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥" (চৈঃ চঃ)

মনে রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণের কোন গুণই পরিপূর্ণরূপে কারও মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না। ভক্তে বিন্দু বিন্দুই সঞ্চারিত হয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই উহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে।

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥

সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥" চৈঃ চঃ)

'সাধবোঽদোষদর্শিনঃ' এরূপ লক্ষণও মুখ্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভক্তিধর্ম দ্বারা যারা মহদন্তঃকরণ হয়েছেন, তাঁরা অদোষদর্শী হন। এই একটিমাত্র গুণে মহৎ, মহত্তর, মহত্তম ও অতিমহত্তমের ভেদ দেখান হয়েছে। যথা—যিনি অন্যের দোষ দেখেন না বরং দোষসমূহকে গুণের অন্তঃপাতীরূপে দেখেন, তিনি সাধু অর্থাৎ মহদ্ব্যক্তি। যেমন কোনব্যক্তি কঠোরভাষী কিন্তু মহদ্ব্যক্তি ঐ কঠোরভাষিত্ব রোগনিবারক নিম্বরসের ন্যায় হিতকর বলে মনে করেন।

আবার যাঁরা পরের দোষ দেখেনই না, কেবলমাত্র গুণই দেখেন তাঁরা মহত্তর। যেমন কোন বণিকের নিকট বহু ক্রেতা দেখে মহত্তর ব্যক্তি মনে করেন, 'এই বণিক্ বড়ই অতিথি পরায়ণ।' তিনি বণিকের লাভমূলক বিক্রয় কার্য্যকে অতিথি সৎকার বলেই মনে করেন।

যাঁরা পরের দোষত দেখেনই না, স্বল্পগুণকে বহুল গুণরূপে গ্রহণ করেন, তিনি মহত্তম সাধু। যেমন কোন শস্ত্রপাণি দস্যু সাধুর গাত্রবসন অপহরণ করলে সাধু মনে করলেন—অহো! এইব্যক্তি শীতে কাতরতা হেতুই বস্ত্র গ্রহণ করেছেন। লোকটি

বড় দয়ালু যেহেতু শস্ত্রপাণি হয়েও হিংসা করেন না, অতএব ইনি ধন্য ইত্যাদি।

আবার যাঁরা অন্যের গুণের অভাবেও সর্বত্রই গুণই দেখেন, তাঁরা অতিমহত্তম সাধু। তিনি মনে করেন, এই বিশ্বে কেউই দুষ্ট নেই, সবাই শিষ্ট। যাঁর দর্শনেও অন্যের মধ্যে ভক্তির উদয় হয় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে উত্তমভক্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন যথা—

"প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥" (ঐ)

উত্তম ভাগবতের প্রেমানুভূতি যথা—

"প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য।
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥" ( চৈঃ চঃ )

মধ্যমভক্তের লক্ষণ যথা—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪৬)

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকার তাৎপর্যার্থ—যিনি পরমেশ্বরে প্রেম করেন, তাঁতে রতিযুক্ত, ঈশ্বরাধীন ব্যক্তিমাত্রে মৈত্রী অর্থাৎ ভক্তজনে বন্ধুতা করেন, বালিশ অর্থাৎ যাঁরা ভগবদ্ভজন করে না অথচ শ্রীভগবানকে ও ভক্তগণকে দ্বেষ বা অবজ্ঞাও করে না, এমন উদাসীন জনের প্রতি কৃপা করেন এবং দ্বেষকারীকে ( স্বীয় দ্বেষী, ভক্তদ্বেষী এবং ভগবদ্দ্বেষীকে) উপেক্ষা করে থাকেন, তিনি মধ্যমভক্ত।

এতাদৃশ ভক্তের অজ্ঞজনের প্রতি যে প্রচুর কৃপা হয়, তার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদস্তবে (৭।৯) 'শোচেততো' এই শ্লোকে জানা যায়। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহের প্রতি বল্লেন, 'হে প্রভো! যারা তোমার কথাসুধা হতে বিমুখচিত্ত হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ লালসায় গুরুতর সংসার ভার বহন করছে সেই তোমার কথাবিমুখ মূঢ়জনের প্রতি আমি শোক করছি।' অতএব ভগবৎ কথাবিমুখ অথচ ভক্ত ও ভগবানের প্রতি দ্বেষরহিত মূর্খগণের প্রতি মধ্যম ভক্তের কৃপা হয়ে থাকে। নিজ দ্বেষকারী ব্যক্তিগণের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ পায়, কারণ সেই দ্বেষে তাঁর কোনরূপ চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় না। বরং সেই দ্বেষকারী জনের প্রতি কৃপাংশ থাকে বলে অজ্ঞবুদ্ধিতে কৃপাই করে থাকেন। নিজের প্রতি ঘোরতর দ্বেষকারী হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের করুণার কথা শুনা যায়। ভক্ত ও ভগবদ্ দ্বেষিগণের প্রতি মধ্যমভক্তের কখনও কৃপার উদয় হয় না, কারণ ঐ দ্বেষে

তাঁর চিত্তে ক্ষোভ জন্মে থাকে। 'দ্বেষ' শব্দে নিন্দা অর্থও বুঝায়—'নিন্দাপি দ্বেষসমা' (ভক্তিসন্দর্ভ)।

মধ্যম ও উত্তম ভক্তের মধ্যে প্রভেদ এইযে, মধ্যম ভক্তের অজ্ঞজনের প্রতি কৃপার স্ফুরণ হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তমভক্তের সর্বত্র শ্রীভগবানের অথবা ভগবদ্বিষয়ক প্রেমের স্ফূর্তি পেয়ে থাকে বলে তাঁদের অজ্ঞজনের প্রতি অধিকভাবে বন্ধুতার উদয় হয়। মধ্যম ভক্তের ভক্ত ও ভগবদ্বেষিগণের প্রতি অনভিনিবেশ স্ফূর্তি পায়, কিন্তু উত্তমভক্তের তাদের প্রতি দ্বেষও প্রকাশ পেয়ে থাকে। "ভোজানাং কুলপাংশনঃ" (ভাঃ ১০।১৩৫) অর্থাৎ 'কংসই ভোজকুলের কুলাঙ্গার' এই বাক্যে শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মহাভাগবতগণের ভক্ত-ভগবদ্দ্বেষিগণের প্রতি দ্বেষও দেখতে পাওয়া যায়!

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে মহাভাগবতগণের সর্বত্র ভগবৎস্ফূর্তির সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাজন বলেন—"তেষান্তু তত্রাপি তদ্বিধশাস্তৃত্বেন নিজাভীষ্টদেব পরিস্ফূর্ত্তির্ন ব্যাহন্যতে এব ইতি বিশেষঃ। তদ্দৃষ্ট্যৈব চ শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি দুর্য্যোধনাদৌ নমস্কারঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ) অর্থাৎ মহাভাগবতগণের তাদৃশ দ্বেষিগণে দুষ্টনিগ্রহগুণযুক্তরূপেই বা বিরোধিজনের শাসনকর্তারূপেই অভীষ্টদেবের স্ফূর্তি হয়, এজন্য শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি মহাভাগবতগণের শ্রীদুর্যোধনাদির প্রতি নমস্কারাদি ব্যবহার দেখা যায়। অর্থাৎ ভক্ত-ভগবদ্দ্বেষিগণে দুষ্টদমনকর্তারূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অভীষ্টদেবকেই তাঁরা প্রণাম করে থাকেন,

কিন্তু দেহদৃষ্টিতে দুষ্টগণকে প্রণামাদি করেন না বুঝতে হবে।

পূর্বে যে বলা হয়েছে, মহদ্ভক্তগণ অন্যের দোষরাশিকেও গুণসমূহরূপেই গ্রহণ করে থাকেন, তা বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষীভিন্ন অন্যত্র সর্বত্র প্রযোজ্য বলেই জানতে হবে।

কণিষ্ঠভক্তের লক্ষণ যথা—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৪৭)

"যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিমাতে শ্রীহরির পূজা করেন কিন্তু তদ্ভক্তগণের এবং অন্যান্যজনের পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃতভক্ত অর্থাৎ অধুনাই ভজন আরম্ভ করেছেন বলে জানতে হবে। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকার তাৎপর্য এইপ্রকার যে, এতাদৃশ ভগবৎ পূজকের শ্রীভগবানে প্রেম না থাকাতে ভক্তগণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জ্ঞান নাই এবং ভক্তমাত্রে ও শ্রীহরির অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে সর্বভূতে আদরদান করা যে ভক্তের লক্ষণ সেও নাই। তবে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে, এটি শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধা নয়। কারণ ভক্তিশাস্ত্র কেবল শ্রীহরির পূজা করতেই বলেন না, কিন্তু শ্রীহরির পূজার সঙ্গে তাঁর ভক্তমাত্রের পূজা এবং তদধিষ্ঠান বুদ্ধিতে প্রাণী-মাত্রের প্রতি আদরদানের কথা বলেন। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে ব্যক্তির ত্রিধাতু-ময় দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী, পুত্রাদিতে নিজজনবুদ্ধি, মৃত্তিকাবিকার দের-প্রতিমাতে পূজ্যবুদ্ধি ও সলিলে তীর্থবুদ্ধি হয়, কিন্তু ভক্তজনে

সেই সকল বুদ্ধি (আত্মীয়বুদ্ধি প্রভৃতি) হয় না; সেই ব্যক্তি গরু গাধার ন্যায় নির্বোধ। এইজন্য তাদৃশব্যক্তি ভক্তগণের পূজায় বিমুখ থাকে, আবার সর্বজীব পূজাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। শাস্ত্রবাক্যও আছে, যে জন গোবিন্দের অর্চন করে অথচ তদীয় ভক্তগণের অর্চনা করে না সে ব্যক্তি ভক্ত নহে, কেবলই দাম্ভিক।' ইনি গৌণ কণিষ্ঠভক্ত সুতরাং ভক্তাভাস। শ্রীজীবপাদ মুখ্য কণিষ্ঠভক্তের কথা উক্ত শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করেছেন, "অজাত-প্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্য কণিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ" অর্থাৎ যে সাধক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত অথচ অজাতরতি তিনিইমুখ্য কণিষ্ঠভক্ত। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হলে ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সমস্ত আচরণ যাজন করার প্রবৃত্তি ও সাহস জন্মিবে বলে বুঝতে হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ এইরূপ করেছেন যথা—

"তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥

প্রভু কহে—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥
× × × × × × × × ×
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু! আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তারা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥"

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, "তদেবং কলৌ নাম-কীর্তনপ্রচার-প্রভাবেনৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধিদর্শিতা" (ভঃ সঃ—২৭৪) অর্থাৎ 'কলিযুগে নামকীর্তনপ্রচারের প্রভাবেই পরম-ভাগবতত্বসিদ্ধি দর্শিত হল।'

শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলেছেন, "যো

মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" অর্থাৎ 'আমার ভক্তই আমার প্রিয়।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের যিনি যতবড় প্রিয়, তিনি যে তত বড় ভক্ত—ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি (গীতা ১২।১৩-১৯) শ্লোকে বহুপ্রকার স্বভক্তনিষ্ঠ ধর্ম বা গুণ উল্লেখ করে ঐ সকল ভক্তনিষ্ঠ ধর্ম সকলের প্রাপ্তির ইচ্ছায় যে সাধকভক্তগণ ঐ শ্রীমুখোক্ত ভক্তনিষ্ঠ ধর্মাবলীর শ্রবণ, পঠন ও বিচারাদি করেন, তাঁদের ঐ শ্রবণাদির ফল উপসংহারে উল্লেখ করলেন—

"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥"
(গীতা—১২।২০)

অর্থাৎ 'হে অর্জ্জুন! আমি পূর্বে বহুবিধ ভক্তের বহুবিধ গুণ উল্লেখ করেছি কিন্তু সেই সিদ্ধভক্তগণ এক এক সদ্‌গুণনিষ্ঠ, অর্থাৎ কেউ সর্ব ভূতের প্রতি দ্বেষশূন্য, কেউ বা তাঁদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ইত্যাদি। এক এক-গুণনিষ্ঠ ঐ সকল ভক্তগণের গুণাভিলাষী হয়ে যে সব সাধকভক্তগণ শ্রদ্ধা সহকারে মৎপরায়ণতা লাভ করে মৎবর্ণিত এই ধর্মামৃতের পর্যুপাসনা করেন অর্থাৎ শ্রবণ, পঠন, বিচারাদিরূপ অনুষ্ঠান করেন; তাঁরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ তাঁরা সাধক হলেও সিদ্ধসকলের গুণাভিলাষী হওয়াতে এক এক গুণযুক্ত সিদ্ধগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' 'অতীব' পদদ্বারা এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে। (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মানুবাদ) যে ভক্তের অপেক্ষা শ্রীভগবানের অতি

প্রিয় বিশ্বে আর কেউই নাই, শ্রীগীতার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-মুখেই তা ব্যক্ত করেছেন—

"য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥" (১৮.৬৮—৬৯)

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"হে অর্জুন! যিনি এই পরমগুহ্যশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট উপদেশ করেন, তিনি পরাভক্তি লাভ করে নিশ্চয়ই আমায় প্রাপ্ত হবেন। এই মনুষ্যলোকে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক পরিতোষকারী পূর্বে কেউ হয় নাই, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। সুতরাং এই বিশ্বে তা অপেক্ষা আমার অতি প্রিয়ও কেউ পূর্বে হয় নাই, এখনও নাই এবং পরেও হবে না।"

এই শ্রীমুখবাক্যে আমরা অবগত হলাম যে, ভক্তিশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীভগবানের অধিক প্রিয়বস্তু বিশ্বে আর কিছুই নাই এবং ভক্তগণের ঐ শাস্ত্রশ্রবণাদি অপেক্ষা অন্য কোন বৃহত্তর সাধনও নাই। যাঁরা শ্রীহরির ভক্তগণকে ভক্তিশাস্ত্রের রসাস্বাদন করান, তাঁরা সর্বাধিক ভগবৎ-প্রিয়তমত্বরূপ সদ্‌গুণ লাভে ধন্য হয়ে থাকেন। প্রকৃত ভক্তগণের শাস্ত্ররস আস্বাদনই একমাত্র জীবাতু। তবে শাস্ত্রোপদেষ্টাগণের যথালাভে সন্তোষ, নিঃস্বার্থ-পরতা এবং শরণাগতিত্বাদি সাধু আচরণ থাকা প্রয়োজন। অসাধু

আচরণকারিগণ শাস্ত্রোপদেষ্টা হলেও শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র হতে পারেন না—ইহাও বোদ্ধব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতপরমহংসের লক্ষণ যথা—

"যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্ম ॥"

(ভাঃ ১।১৮।২২)

"অন্ত্যং পারমহংস্যং ভাগবতপরমহংসত্বং যস্মিন্ যদর্থম্ অহিংসয়া মাৎসর্য্যাদিরাহিত্যেন উপশমো ভগবন্নিষ্ঠা বিধীয়তে ইত্যর্থঃ।" (ক্রমসন্দর্ভটীকা)

"ভগবানে অনুরক্ত সাধুসকল দেহাদির আসক্তি ত্যাগ করে ভাগবতপরমহংস পদবীতে আরোহণ করে থাকেন। যে পদবীতে আরোহণ করলে মাৎসর্যাদি রহিত হয়ে ভগবন্নিষ্ঠাপ্রাপ্তরূপ স্বধর্ম ক্রিয়মান হয়ে থাকে।" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলেছেন—

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥"

( ভাঃ ১১।১৮।২৭ )

"জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত অথবা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা রহিত আমার ভক্ত ( জাতভাব ) চিহ্নের সহিত গৃহাশ্রমাদি ত্যাগ করে অবিধিগোচর হয়ে অর্থাৎ আশ্রমধর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করে বিচরণ করবেন। শাস্ত্র-শাসন অতিক্রম করলেও তাদৃশ ভক্তের শুদ্ধান্তঃকরণত্ব হেতু

শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপাচরণে অর্থাৎ পরনিন্দা, পরহিংসা, পরদার-পর-দ্রব্যাপহরণ, মিথ্যা, অসূয়া, মাৎসর্যাদি অধর্মাচরণে কদাচ প্রবৃত্তি হয় না। জাতপ্রেমভক্ত লিঙ্গসহ আশ্রমধর্ম ত্যাগ করেন আর অজাতপ্রেম ভক্ত আশ্রমে অবস্থান করেও অন্তরে আশ্রমাভিমানশূন্য বলে আশ্রমধর্ম ত্যাগী।* ( শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যার মর্মার্থ।

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"
"বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥" (চৈঃ চঃ)

যাঁরা গুণে দোষ দেখেন না, কিন্তু যথাবস্থিত গুণ ও দোষ উভয়কেই যথাযথরূপে বিবেকদ্বারা গ্রহণ করেন তাঁদিগকে সাধারণ সাধু বা সাধারণ মহৎ বলা হয়। এঁরা শাস্ত্রদৃষ্টিতে দোষ ও গুণ বিচারে মধ্যস্থ। এঁদের সদাচার ভক্তও বলা হয়। "সঙ্গেন সাধুভক্তানাং" "সাধুরত্র সদাচারঃ" (ভক্তিসন্দর্ভ—২০১) এতাদৃশ ভক্তের সঙ্গই কর্তব্য। এতাদৃশ সাধুগণই মাদৃশ জীবের পরম কল্যাণকারী। কারণ মাদৃশ জীবের দোষ গুণ উভয় বিচার করেই

---

*জাতরুচি, জাতাসক্তি, জাতভাব এবং জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণ ও চেষ্টা মৎসম্পাদিত 'মাধুর্যকাদম্বিনী' গ্রন্থে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

দোষ ত্যাগের নিমিত্ত উপদেশ দেন এবং উপদেশ গ্রহণ না করলে নিগ্রহরূপ কৃপাও করে থাকেন। যাঁরা অধমকেও উত্তম বলে মনে করেন কিংবা নিজেকে তৃণাদপি সুনীচরূপে অবগত হয়েছেন, তাদৃশ মহাভাগবতের কৃপা মাদৃশ জীবের প্রতি সর্বদা উদিত হতে পারে না। কোন্ অবস্থায় কোন্ সময়ে জীবের প্রতি তাঁদের কৃপার উদয় হয়, সেই সময় এবং সেই অবস্থাও মাদৃশ জীবের বোধগম্য নয়। অতএব উল্লিখিত সাধারণ মহদ্গণের সঙ্গই সাধারণ সাধকগণের পক্ষে শ্রেয়ঃ বলে জানতে হবে।

## ভক্তসঙ্গ ও ভক্তকৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ।

সকল শাস্ত্রই ভক্তসঙ্গ বা সাধুসঙ্গের মহামহিমা সমস্বরে কীর্তন করেছেন। অনাদিকাল থেকে মায়াবদ্ধ জীবকুল যে চৌরাশীলক্ষ যোনীতে ভ্রমণ করতে করতে ঘোর সংসার প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে, এই মায়াবদ্ধ দশার থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে শ্রী-ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ভক্তসঙ্গ এবং ভক্তকৃপা। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥" (চৈঃ চঃ)

সাধুসঙ্গব্যতীত অন্য কোন উপায়েই যে অনাদিকর্মসংস্কার-দুষ্টচিত্ত বাসনা-কষায়শূন্য হয়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে উন্মুখীন হতে পারে না, শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীমৎজীবগোস্বামিপাদ তা বিশেষ বিচার পূর্বক প্রতিপাদন করেছেন। "অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্। সা হি সংসার-দুরন্তানন্ত-সন্তাপ-

সন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ত্ততে তদসম্ভবাৎ। কৃপা-রূপশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্য তু যদা পরমানন্দরসত্বেনাপহত-কল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ, তেজোমালিন্যস্তিমিরাযোগবত্তচ্চেতস্যাপি তমোময়দুঃখস্পর্শনাসম্ভবেন, তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমানেঽপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে তস্মিন্ তদ্বিমুখানাং ন সংসারসন্তাপশান্তিঃ। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সংসারদুঃখৈর্ন স্পৃশন্ত এব, তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপীত্যতস্তেষাং সংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি............ তস্মাদ্ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ—১৮০) ভগবৎ কৃপাই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের প্রাথমিক কারণ হলেও তা গৌণ। যেহেতু সেই ভগবৎকৃপার দুরন্ত-সংসার-সন্তাপে সন্তপ্ত ভগবদ্বহির্মুখ জীবে স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্তিত হওয়া সর্বথাই অসম্ভব। কারণ কৃপা একপ্রকার চিত্তবিকারবিশেষ, অন্যের দুঃখ কৃপালুর চিত্ত স্পর্শ করলে তা জাত হয়। শ্রীভগবান্ সদা পরমানন্দ-রসস্বরূপ অপহতপাপ্মা জীবের সঙ্গে এই তাঁর মহান্ বৈলক্ষণ্য! তেজোময় সূর্যে যেমন কখনই অন্ধকারের স্পর্শ সম্ভবপর নয় তদ্রূপ অবিদ্যা পীড়িত জীবের মিথ্যা মায়াময় দুঃখ কখনই শ্রীহরির চিত্ত স্পর্শ করে না, তা সর্বথা অসম্ভব। এজন্য শ্রীভগবানের হৃদয়ে সর্বদা

কৃপাসিন্ধু বিরাজমান থাকলেও এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সমর্থ হলেও ভগবৎবহির্মুখ জীবের সংসারদুঃখের অবসান হয় না। অতএব জীবোদ্ধার বিষয়ে মহতের কৃপাই অবশিষ্ট থাকছে। যদ্যপি তাদৃশ ভক্তগণের চিত্তেও মিথ্যা মায়াময় সংসারদুঃখের স্পর্শ হয় না ঠিকই, তথাপি জাগরিত মানবের যেমন স্বপ্নের দুঃখ মিথ্যা বলে মনে হয় কিন্তু তিনি অন্য ঘুমন্ত মানবের স্বপ্নের দুঃখের কথা স্মরণ করতে পারেন এবং তাকে জাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয় তদ্রূপ মোহনিদ্রা থেকে উত্থিত ভক্তগণের মোহনিদ্রায় নিদ্রিত নানাবিধ স্বপ্নবৎ মিথ্যা সংসারদুঃখে ক্লিষ্ট সংসারী জীবের প্রতি কৃপার উদ্রেক হয়। অতএব শ্রীভগবানের যে কৃপা মহতের হৃদয়ে বিরাজ করে, তা সৎসঙ্গ বাহনা বা সৎকৃপা বাহনা হয়েই জীবান্তরে সংক্রমিত হয় স্বতন্ত্র ভাবে নয়। সামান্য দেব দেবীগণও যখন বিনা বাহনে অন্যত্র যান না, তখন সর্বশক্তিচূড়ামণি মহাদেবী ভগবৎকৃপা কি বিনা বাহনে অন্যত্র যেতে পারেন ?

এজন্য একমাত্র ভক্ত সঙ্গকেই ভগবৎ-সাম্মুখ্যরূপ সাক্ষাৎ ভক্তি-প্রাপ্তির অমোঘ কারণ বলা হয়েছে। শ্রীল মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমোযর্হি তদেব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥"

"হে নাথ! সংসার চক্রে ভ্রমণশীল জীবের যখন সংসার-ক্ষয়ের কাল উপস্থিত হয়, তখন সাধুসমাগম হয়ে থাকে ; যখন

সাধুসমাগম হয় তখনি সাধুগণের একমাত্র গতি পরাবরেশ অর্থাৎ কার্য-কারণ নিয়ন্তা তোমাতে মতি জাত হয়।" সৎসঙ্গই যে সংসার ক্ষয়ের প্রতি অব্যভিচারী কারণ সেটি দেখবার জন্যই পূর্বে সংসারনাশের কথা বলে পরে সৎসঙ্গের কথা বলেছেন। অলঙ্কারিকগণ একে চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে বর্ণনা করেন। "চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাম্ যা হি কার্য্যস্য পূর্বোক্তিঃ" অর্থাৎ 'কারণের শীঘ্র কার্যকারিতা বলার অভিপ্রায়ে যেখানে কারণ উল্লেখ করার পূর্বেই কার্যের উল্লেখ করা হয়, তাকে চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়।' এখানে সংসারক্ষয়ের মূলকারণ সাধুসঙ্গ আর সংসারক্ষয়টি তার কার্য হলেও সাধুসঙ্গ এত সত্বর সংসারক্ষয় করে দেয় যে পূর্বে সংসারক্ষয় হল না পূর্বে সাধুসঙ্গ হল তা বুঝতেই পারা যায় না।

এখানে আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এইযে, সংসারক্ষয়টি সাধুসঙ্গের মুখ্যকার্য নয়, শ্রীহরিচরণে ভক্তির আবির্ভাব করিয়ে দেওয়াই সাধুসঙ্গের মুখ্য কার্য। সংসারক্ষয়টি আনুষঙ্গিক। সংসারক্ষয়টি অন্ধকার স্থানীয় এবং সাধুসঙ্গটি সূর্যস্থানীয়। সূর্য উদয়ের সমকালেই যেমন অন্ধকার নিবৃত্তি হয়ে থাকে, তদ্রূপ সাধু-সঙ্গরূপ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যান্ধকাররূপ সংসারের নিবৃত্তি হয়। শ্রীনলকুবর মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ এইজন্যই বলেছেন—

"সাধূনাং সমাচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নোভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥" (ভাঃ ১০।১০।৪১)

'আমাতে অর্পিতচিত্ত সর্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন সাধুগণের দর্শন হতে সূর্যোদয়ে যেমন নেত্রের অন্ধকারজনিত বন্ধন থাকে না, তদ্রূপ জীবের ভববন্ধন থাকে না।' সুতরাং যখনি সাধুসঙ্গ হবে, তখনি তার আনুষঙ্গিক ফলে সংসারনাশ এবং মুখ্যফলে শ্রীহরির চরণে রতির আবির্ভাব হবেই।

প্রশ্ন হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে ভক্তসঙ্গের এরূপ অমোঘ ফলের অনুভব প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেন, বা ভক্তসঙ্গ করেও ভগবদ্বহির্মুখতা দোষের নাশ এবং ভগবচ্চরণে রতি মতি দৃষ্ট হয় না কেন ? এর উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, সেটি অপরাধিজনের জন্যই। নিরপরাধ হলে অতি অবশ্য উক্ত ফলের অনুভব হবেই। সাধুসঙ্গ হলেও সাপরাধ জনকে সাধুগণ কৃপা করার ইচ্ছাই করেন না, যথা-

"তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাকৃতান্তর্মনসঃ পরেশঃ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥"

( ভাঃ ৩।৫।৪৪ )

অর্থাৎ 'হে উরুগায়, হে পরেশ ! যারা অসদ্ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা সাপরাধ চেষ্টাময় ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা তোমা'হতে পরাবৃত্ত মনা; সেই অসজ্জনগণের প্রতি তোমার পাদপদ্ম-বিলাস-লক্ষ্মী-ভাজন ভক্তগণ নিশ্চয়ই দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছা করেন না' এই প্রমাণে সাপরাধ ভগবদ্‌বহির্মুখ জনগণের প্রতি যে শ্রীভগবানের ভক্তগণ কৃপাদৃষ্টিপাত করেন না তা দেখান হ'ল।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উক্তশ্লোকের

'অসদ্ ইন্দ্রিয়বৃত্তি' বলতে কেবল বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিই ব্যাখ্যা হতে পারে না, যেহেতু মহতের কৃপাদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সকলেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয়াভিমুখীই থাকে। এজন্য তার 'সাপরাধময় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি' এরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। যেহেতু সাধারণ ভগবদ্বহির্মুখ জনগণের প্রতি মহতেরা কৃপাবর্ষণ করেই থাকেন। যথা—

"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥"

(ভাঃ ৩।৫।৩)

শ্রীবিদূর মহাশয় শ্রীল মৈত্রেয় ঋষির প্রতি বললেন, 'হে প্রভু! প্রাচীন কর্মবশে অধর্মশীল ও অতিশয় দুঃখিত কৃষ্ণ-বহির্মুখ জনগণকে কৃপা করার জন্যই আপনাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তগণ বিশ্বে বিচরণ করে থাকেন।'

সুতরাং যদি কোনও ব্যক্তি অপরাধশূন্য কেবল ভগবৎবহির্মুখতা দোষে দুষ্ট থাকে, তাহলে সাধুসঙ্গমাত্রেই সেই দোষ নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং তার ভগবদুন্মুখতা ঘটে, আর যদি কেউ সাপরাধ ভগবদ্বহির্মুখ হয়, তাহলে ভক্তসঙ্গমাত্রেই ভগবদ্বৈমুখ্য-দোষ নিবৃত্ত হয়ে ভগবচ্চরণে উন্মুখ ভাব জন্মায় না। তবে যদি তারা কোন মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারে, তাহলে সেই অপরাধাদি দোষের নিবৃত্তি হয়ে শ্রীহরিচরণে তাদের উন্মুখতা ঘটতে পারে, এরূপ সমাধানই জানতে হবে। নির-পরাধ জনগণের প্রতি ভক্তমহানুভবগণের কৃপা অবশ্যই হবে।

অর্থাৎ তিনি যদি 'ইনি মহাপুরুষ' এরূপ অনুসন্ধান না-ও করেন এবং যিনি মহাপুরুষ তিনিও যদি 'এই দুর্গত জীবের প্রতি কৃপা করা উচিৎ' এরূপভাবে তাঁকে কৃপাদৃষ্টির বিষয় না-ও করেন, তবু তাঁদের সঙ্গ মাত্রেই ভগবচ্চরণে মতি লাভ হবে। কিন্তু সাপরাধ জনের পক্ষে অপরাধের দিকে দৃষ্টিপাত না করে মহাপুরুষ যদি নিজ করুণ স্বভাবে কৃপা করেন, তবেই সেই অপরাধি-জনের শ্রীহরিচরণে মতি হতে পারে মহতের কৃপাভিন্ন কেবল মহতের সঙ্গ প্রভাবেই অপরাধিজনের শ্রীহরিচরণে মতি হওয়া সম্ভবপর নয়।

এই উভয়বিধ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত শ্রীনলকুবর মণিগ্রীব ও সাধারণ দেবতাগণ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীযমলার্জুন ভঞ্জন লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে দেখ যায়, শ্রীনলকুবর মণিগ্রীব দেবর্ষি নারদকে অবজ্ঞা করে অপরাধী হয়েছিলেন তবু শ্রীপাদ দেবর্ষি তাঁদের অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে অহেতুক করুণস্বভাবে তাঁদের পূর্বস্মৃতির সহিত নিরপরাধে বৃন্দাবনে বাস, শ্রীবালগোপাল-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন এবং তাঁর চরণে অচলা ভক্তি দান করে তাঁদের কৃতার্থ করেছিলেন! মহৎমর্যাদালঙ্ঘনকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ কিন্তু শ্রীপাদ দেবর্ষিকে পুনঃপুনঃ দর্শন করলেও শ্রীহরিচরণে ভক্তি লাভ করতে পারেন নাই। তবে যে তাঁরা মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তবাদি করেন, সেটি কেবল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে! তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির

প্রতিকূলে শ্রীভগবান্ যদি কিছু করেন, তবে তাঁরা তাঁর প্রতি দ্রোহ করতেও ছাড়েন না, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযাগভঙ্গ লীলাই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

এই সিদ্ধান্তের উপরে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন, "নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে" 'হে নাথ! আমি এই সংসারচক্রে ভ্রমণশীল সুদুঃখিত জীবগণকে পরিত্যাগ করে একাকী মুক্তির ইচ্ছা করি না, এই নিরাশ্রয় সংসারী জীবগণের একমাত্র তোমা ভিন্ন অন্য কাকেও আশ্রয় দিবার উপযুক্ত কৃপালু দর্শন করি না।' তাহলে শ্রীপ্রহ্লাদের বিশ্বের সমস্ত সংসারী জীবের প্রতি কৃপা হওয়া সত্ত্বেও সর্বজীব উদ্ধার না হবার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, জীব অনন্ত, শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের হৃদয়ে অনন্ত জীবের সবার কথা উদিত হয়নি। তিনি যাঁদের দুঃখ দর্শন এবং শ্রবণ করেছিলেন, শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট তাঁদের জন্যই প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং তাঁদের যে নিস্তারও হয়েছে তা সুনিশ্চিত। জীববন্ধু শ্রীমৎজীবগোস্বামিপাদের ইহাই সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মর্ষি ভরত রাজা রহূগণের প্রতি মহদ্‌গণের পাদরজের নিষেবণ ব্যতিরেকে অন্য কোন সাধনার দ্বারাই যে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করা যায় না, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥"
(ভাঃ ৫।১২।১২)

'হে মহারাজ রহূগণ! মহাপুরুষগণের পাদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে তপস্যা, বৈদিককর্ম, অন্নাদিদান, গৃহাদি-নির্মাণার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, জল, অগ্নি অথবা সূর্যের উপাসনা—এ সমস্ত দ্বারাও ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' শ্রীল প্রহ্লাদ মহাশয়ও মহতের পাদরজের নিষেবণকেই ভগবৎ-পাদপদ্মে মতি লাভের অব্যভিচারী উপায় বলে বর্ণনা করেছেন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩২)

"যে পর্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য সাধুগণের চরণধূলির দ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্যন্ত লোকসকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করতে পারে না। অর্থাৎ সে পর্যন্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কারও মতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হলেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়ে যায়।"

"ভক্ত পদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে ভক্তের শ্রীচরণামৃতে অধরামৃতে নিষ্ঠাবান্ শ্রীল কালিদাস রায় নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যের অলভ্য কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।* শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"বৈষ্ণবের পদজল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত"। ইত্যাদি
"বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস"॥ ইত্যাদি
"ভগবদ্ভক্তপাদাব্জ-পাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্॥"

'যাঁদের সঙ্গ অখিল সাধ্য-সাধনের ফলস্বরূপ, সেই ভগবদ্ভক্তগণের পাদুকাসমূহকে আমি নমস্কার করি।"

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ভক্তসঙ্গ অশেষ পুরুষার্থস্বরূপ।

ভক্তসঙ্গে সর্বানর্থ-নিবৃত্তি ও সর্বার্থ প্রাপ্তি হয়। যথা—

"যথোপশ্রয়মানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥"

( ভাঃ ১১।২৬।৩১ )

'ভগবান্ অগ্নিদেবের আশ্রয়ে যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সাধুগণের আশ্রয়ে কর্মজাড্য, সংসার-ভয় এবং ভজনবিঘ্ন রূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন 'স্বীয়ৌ-দনসিদ্ধ্যর্থমুপাশ্রয়মাণস্য অপ্যেতি, তথৈব ভজনসিদ্ধ্যর্থং সাধূন্ সংসেবমানস্য কর্ম্মাদি জাড্যং ভজনবিঘ্নশ্চ।" অর্থাৎ 'অন্নাদি রন্ধনের নিমিত্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সান্নিধ্যে যেমন আনুষঙ্গিকভাবেই শীত, ভয় ও অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভজনসিদ্ধি বা প্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধুভক্তের সঙ্গ করলে আনুষঙ্গিকভাবেই কর্মাদি জড়তা, সংসার ভয় ও ভজনবিঘ্নরূপ অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

সৎসঙ্গ সর্বতীর্থ অপেক্ষা মহিমান্বিত -

"গঙ্গাদি পুণ্য তীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ॥"

( পদ্মপুরাণ )

"যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত গঙ্গায় স্নান করেন, আর যিনি সৎসঙ্গ করেন, উভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গকারীই শ্রেষ্ঠ।"

সর্বসৎকর্মের অধিক সৎসঙ্গ—

"যঃ স্নাতঃ শান্তিসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।

কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥"(ঐ)

"যিনি শান্তি সিতা ( শ্বেতবর্ণা ) সাধুসঙ্গরূপ গঙ্গায় স্নান করেছেন, তাঁর দান, তীর্থভ্রমণ, তপস্যা ও যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন ?"

অনর্থকালেও যাঁদের সঙ্গ পরমার্থ দান করে, যথা বাশিষ্টে—

"শূন্যতাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।

আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন-সমাগমে॥"

'ভক্তি-বিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের সমাগম হলে বন্ধুবিয়োগাদি দ্বারা শূন্যতা প্রাপ্ত গৃহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মরণও অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ-পাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে, আপদ মহাসম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়।'

ভক্তসঙ্গসুখ দেহ-দৈহিকাদির বিস্মারক, যথা—

"তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং,

যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।

যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ,-

সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥" (ভাঃ ৪।৯।১২)

"হে কমলনাভ! আপনার পাদপদ্মের সুগন্ধে যাঁদের

হৃদয় অতিশয় লুব্ধ, সেই সব ভক্তগণের সঙ্গে যে ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তারা অত্যন্তপ্রিয় এই মনুষ্যদেহ এবং দেহের অনুবর্তি যে সব গৃহ, বিত্ত, মিত্র, পুত্র, কলত্র তা কিছুই স্মরণ করেন না।

ভক্তসঙ্গ বিশ্বের আনন্দদায়ক—

"রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী।
নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা ॥" ( পদ্মপুরাণ )

"সর্ববিধ রোগহারী, তাপহারী, পরমানন্দদায়ী-বৈষ্ণবাশ্রয়-রূপচন্দ্রিকা বা চন্দ্রকিরণ কাকে না আনন্দিত করে?"

ভক্তসঙ্গই সর্বসার, যথা বৃহন্নারদীয়ে—

"অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্ ॥"

'হে ব্রহ্মানন্দন' অসারভূত সংসারে যাঁরা হরিভক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তসঙ্গই সার অর্থাৎ শ্রেষ্টসাধন।'

ভগবৎকথামৃতপানের একমাত্র হেতু ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ—

"যত্র ভাগবতা রাজন্, সাধবো বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্‌গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্‌ভয়শোকমোহাঃ ॥"

( ভাঃ ৪।২৯।৪০ ৪১ )

শ্রীনারদ মহারাজ প্রাচীনবর্হির প্রতি বল্লেন, 'হে রাজন্! যে স্থানে নির্মল পবিত্রাশয় ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভগবানের গুণানুকথন শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করেন, সেই সাধুসঙ্গে মহদ্ ব্যক্তিগণের শ্রীমুখ থেকে ভগবান্ মধুসূদনের চরিত কথা সারাৎসার অমৃততরঙ্গিণীর ন্যায় চারদিকে ক্ষরিত হতে থাকে। সেই ভগবৎকথামৃত অলং বুদ্ধিশূন্য হয়ে এবং সাবধান কর্ণে যাঁরা পান করেন অর্থাৎ সেই কথা শ্রবণ করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি তাঁদের বাধা দিতে পারে না।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখেছেন—"সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব কথা চিন্তনাদাবালস্যাদিনা রসাবেশাভাবতঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভিভূতস্য ভক্ত্যসম্ভবাদবশ্যং সৎসঙ্গো বিধেয়ঃ, ততশ্চ ভগবৎকথামৃতরসপানাদিরূপা ভক্তিঃ স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাব;" অর্থাৎ "সৎসঙ্গব্যতীত নিজে নিজে হরিকথার চিন্তনাদিতে আলস্যাদি জন্মে, রসাবেশের অভাববশতঃ ক্ষুৎপিপাসাদিতে অভিভূত মানবের ভক্তির আস্বাদন সম্ভবপর হয় না বলে অতি অবশ্যই সৎসঙ্গ কর্তব্য। সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথামৃতরসপানাদি রূপ ভক্তি স্বতঃই সম্পাদিত হয়ে থাকে।" কেন না ভক্তসঙ্গ স্বতঃই ভক্তি সম্পাদক যথা বৃহন্নারদীয়—

> "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
> সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

'ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গ হলে ভগবদ্ভক্তি জাত হয়, পূর্বে সঞ্চিত

সুকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সৎসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে।

সৎসঙ্গ সাক্ষাৎ ভগবদ্বশীকারক যথা -

"অথৈতৎ পরমগুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥"

(ভাঃ ১১।১২।১—২)

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বল্লেন, 'হে যদুনন্দন! এই পরমগুহ্য রহস্য শ্রবণ কর, যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা তাই অতি সুগোপ্য বিষয়ও তোমায় বলব। অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম বা বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, অগ্নিষ্টোমাদি ইষ্ট এবং কূপারামাদি নির্ম্মাণরূপ পূর্ত, দান, একাদশ্যাদি ব্রত, দেবপূজা, মন্ত্ররহস্য, তীর্থ সেবা, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় সংযমাদি এ সকল আমায় তাদৃশ বশীভূত করতে পারে না, সর্বপ্রকার সঙ্গের বা আসক্তির অপহারক ভগবদ্ভক্তসঙ্গ আমায় যাদৃশ বশীভূত করে থাকে।'

যেহেতু ভগবদ্ভক্তসঙ্গ স্বতঃই পরমপুরুষার্থ—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" (ভাঃ ১।১৮।১৩)

শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতমুনির প্রতি বল্লেন, 'হে সূত! ভগবৎসঙ্গিগণের অর্থাৎ ভক্তগণের সঙ্গলেশের সহিত আমরা স্বর্গ ও মোক্ষেরও তুলনা করি না। অতএব মানবগণের প্রার্থনীয় রাজ্যাদি বিষয়ের কথা আর কি বলব।' এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ।" ( ১২। ১০।৭ ) অর্থাৎ 'সাধুসঙ্গই মানবগণের পরম লাভ।' শাস্ত্র ও মহাজনগণের মতে জানা যায়, প্রেম এবং ভগবৎপাদপদ্মে সেবা-লাভই মানবগণের পরম লাভ বা সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। সাধুসঙ্গ সেই প্রেমপ্রাপ্তির সাধন, তবে এখানে সাধুসঙ্গকেই পরমলাভ বলা হচ্ছে কেন? এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। এর উত্তরে বলা হয়েছে, সাধুসঙ্গই ভক্তির সাধন, সাক্ষাৎ ভক্তিও সাধুসঙ্গ, ভক্তির ফলও সাধুসঙ্গই। প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতার একমাত্র কারণ, সৎসঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন, তখন প্রেমের কারণ সৎসঙ্গ ও কার্য প্রেমে যে কিছুমাত্র ভেদ নেই তা জানা গেল। "কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ।" সাধুভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গের ফলে অনায়াসেই শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রেমলাভে মানবগণ ধন্য হয়ে থাকেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥" ( ভাঃ ৩।২৫।২৪ )

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহূতির প্রতি বল্লেন,

'হে মাতঃ! সাধুগণের প্রকৃষ্টসঙ্গ হলে আমার মহিমা প্রকাশক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা উপস্থিত হয়। প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কথা নিষেবণ করলে অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ আমাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমের উদয় হয়ে থাকে।' এখানে কায়মনোবাক্যে সাধুভক্তের প্রতি অভিনিবিষ্টতাই প্রকৃষ্ট সৎসঙ্গ। অর্থাৎ দেহের দ্বারা সাধুর সেবা পরিচর্য্যা, মনে তাঁদের উপদেশের প্রতি এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখা এবং বাক্যে তাঁদের মহিমা কীর্তন ও প্রচার। কায়-মনোবাক্যে তাঁদের আদর্শের অনুসরণ, তাঁদের উপদেশানুসারে ভজন। এইটিই যথাযথ প্রকৃষ্ট সৎসঙ্গ, কেবল তাঁদের নিকট গমন বা তাঁদের সান্নিধ্যলাভই প্রকৃষ্ট সঙ্গ নয়।

ভক্তিলাভের পরেও রসাস্বাদনের নিমিত্ত সৎসঙ্গ প্রয়োজন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখেছেন—

'সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥" (১।২।৯১)

অর্থাৎ 'সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও রসিক সাধুভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের রস আস্বাদন করবেন।' ভক্তি-সাধনে নানাপ্রকার বিভেদ থাকায় সাধক যে জাতীয় ভজনানুষ্ঠান করেন তিনি নিজের সমজাতীয় ভক্তিবাসন সাধুর সঙ্গই করবেন। ভক্তিধর্মে স্বীয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজনাভিজ্ঞ বা উচ্চকক্ষায়স্থিত এবং দয়ালুত্বাদি গুণে স্বভাবস্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গই করতে হবে। এখানে 'সজাতীয়াশয়' এই বিশেষণের দ্বারা তাদৃশ সাধুর সঙ্গে ভক্তিরসা-

স্বাদনটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এটি যেমন দেখালেন, তেমনি 'স্বতো বর' এই বিশেষণের দ্বারা তাদৃশ মহাভাগবতসঙ্গে ভক্তিরসের উদয় হয় এটিও দেখালেন। অর্থাৎ তাদৃশ মহতের দর্শন, স্পর্শ, সম্ভাষণাদি এবং ভগবৎপ্রসঙ্গময় সঙ্গাদির দ্বার দিয়ে সাধকের অন্তরের রতি শীঘ্র রসরূপে পরিণতি লাভ করে আস্বাদ্যমানা হয়ে থাকে বলে জানতে হবে।

## ভক্তসেবার মহত্ত্ব।

ভক্তসেবার মহামহিমা সর্বশাস্ত্রে এবং মহাজনবাণীতে দুন্দুভিনিনাদে বিঘোষিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিদুর মহাশয় শ্রীমৈত্রেয় মুনির প্রতি বলেছেন—

"যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।

রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥" ( ৩।৭।১৯ )

'হে মুনে ; যে সব ভগবদ্ভক্তের সেবার ফলে নির্বিকার, সংসার দুঃখহারী ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের শ্রীচরণযুগলে তীব্রপ্রেমোৎসব জাত হয়ে থাকে।' শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে ( ২।৪৪ অনুঃ ) লিখেছেন,—"তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গ মাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি।" সেবা দ্বিবিধ—পরিচর্যা রূপা এবং প্রসঙ্গরূপা। শ্রীবৈষ্ণবের সন্তোষজনক অর্থ, ভোজ্যাদি দান ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁর আনুকূল্য করা পরিচর্যা রূপা সেবা এবং শ্রীহরিকথা হরিনাম শ্রবণ করানো প্রসঙ্গরূপা সেবা। এই দ্বিবিধ সেবার

মধ্যে আবার পরিচর্য্যারূপ সেবার মহিমাধিক্য দেখান হয়েছে। এর ফলে অচিরেই ভগবৎপ্রেমসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলেছেন, 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' 'আমার পূজা অপেক্ষা, আমার ভক্তের পূজা আমার সমধিক প্রীতিকরী।' বৈষ্ণবসেবা যাঁরা করবেন তাঁদের শ্রীবৈষ্ণবকে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুরই স্বরূপজ্ঞানে সেবা করতে হবে সাবধান! বৈষ্ণব দুর্জাতি হলেও দুরাচার হলেও পরিচর্যা দ্বারা যথাযোগ্য সেব্য, প্রণম্য ও বন্দনীয়। কোন রূপই যেন ভাগবতচিহ্নধারী কোন বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা, অনাদরাদি না জন্মায় এই অনাদরই অপরাধের স্বরূপ। যখন সেবা করবেন, তখন জাতি, বর্ণ, আচারাদি নির্বিশেষে বৈষ্ণবমাত্রেরই সেবা করবেন, কিন্তু যখন সঙ্গ করবেন তখন সদাচারী সদ্ভক্ত বৈষ্ণবেরই সঙ্গ করতে হবে। দুরাচার ভক্তের সঙ্গ উপাদেয় নয়—ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীঋষভদেব স্বীয় সন্তানগণের প্রতি উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন—"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" (ভাঃ ৫।৫।২) অর্থাৎ 'মহতের সেবা বিমুক্তি বা প্রেমভক্তি প্রাপ্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ নরকের দ্বার স্বরূপ।' পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

শ্রীমন্মহাদেব বল্লেন, 'হে দেবি! নিখিল দেব-দেবীর

আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ এবং তা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের আরাধনা সমধিক শ্রেষ্ঠ।' শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ হেতু শ্রীবৈষ্ণবগণকেই সর্বতোভাবে প্রসন্ন করতে হবে—"তস্মাদ্বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।" (ইতিহাসসমুচ্চয়) শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সবাই কৃষ্ণ পায়॥"
"কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল নিজ দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে ভক্তের সেবা করে ভক্তসেবার উপাদেয়তা বিশ্বমানবকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব ভক্তিলাভেচ্ছু মানব মাত্রের ভক্তের সেবা অপরিহার্য। মহাপ্রভুর ভক্তসেবা বিষয়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন—

"নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতি-বস্ত্র তুলি কারো দেন ত' আপনে॥
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোনদিন চলে কারো ঘরে॥"

সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
'কি কর' 'কি কর'! তবু করে বিশ্বম্ভরে॥"

কিজন্য যে প্রভু নিজ সেবকের দাস্য বা সেবা করেছেন প্রভু সেই উদ্দেশ্যটিও ব্যক্ত করে বলেন—

"তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥"
"তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।" ইত্যাদি

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানীহ।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥" (১।২।২১৯)

অর্থাৎ 'এস্থলে ভগবদ্ভক্তির যে সব অঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তার অধিকাংশ প্রায়ই ভক্তবিষয়ক ভক্তিরও অঙ্গ বলে বিদ্বান্‌গণ জানেন। যদি প্রশ্ন হয়, এই যে শাস্ত্র ও মহাজনগণ বৈষ্ণবের আরাধনা বা ভক্তের ভজনের কথা বলেছেন তা কিরূপে করা হবে? শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন হয় বৈষ্ণবকে ভজন করতে হলে তাঁর ভক্তির অঙ্গ কিরূপ হবে? এই জিজ্ঞাসার সমাধান করেই শ্রীল গোস্বামিপাদ বলেছেন, শ্রী-ভগবানের ভজনাঙ্গ যে শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, স্মরণাদি বলা হয়েছে সেগুলির অধিকাংশ প্রায় বৈষ্ণবভজনেরও অঙ্গ হবে। যেমন বৈষ্ণবের নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্তন, তাঁদের অর্চন, বন্দন, দর্শন,

প্রণমন, পরিক্রমা স্তবাদি পরম ভক্তির সহিত করতে হবে। কারণ বৈষ্ণবভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তিই। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র বলেন—"বৈষ্ণবানাং পরাভক্তিঃ" অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের প্রতি পরমাভক্তিই করবে।
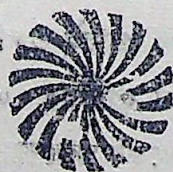
# শ্রীভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান

## ভগবান্ কাকে বলে ?

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ ভগবৎসন্দর্ভ ৩য় অনুচ্ছেদে লিখেছেন—"অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্তুং পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দ-সন্দোহান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথা-নুভবৈকসাধকতম-তদীয়স্বরূপানন্দশক্তি-বিশেষাত্মকভক্তিভাবিতে-ষ্বন্তর্বহিরিপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্ বা তদ্বদেব বিবিক্ততাদৃশশক্তি-শক্তিমদ্ভাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

এর সরলার্থ এই যে, এক অখণ্ড আনন্দস্বরূপতত্ত্ব যখন স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তির সহিত কোন অনির্বাচ্য বৈশিষ্ট্য ধারণ-পূর্বক পরাশক্তিগণের মূলাশ্রয়রূপে স্ফূর্তি পেতে থাকেন—যার অনুভবে ব্রহ্মানন্দী ভাগবতপরমহংসগণের হৃদয়ে তৎকালে তদীয় স্বরূপশক্তির মুখ্যা হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষরূপা ভক্তির আবির্ভাব হতে থাকে—যে ভক্তির প্রভাবে সেই ভাগবতপরমহংসগণের ভক্তিভাবিত অন্তরিন্দ্রিয়ে ও বহিরিন্দ্রিয়ে যে পরতত্ত্ব শক্তি ও

শক্তির বৈচিত্রী লীলাদির সহিত তাহার নায়করূপে দেদীপ্যমান হন, সেই তত্ত্বকেই ভগবান্ বলা হয়।

এক কথায় বলতে গেলে পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট পরতত্ত্বই শ্রীভগবান্ ; সুতরাং ভগবত্তত্ত্বে চিৎ অচিৎ সর্বশক্তির যুগপৎ বিদ্যমানতা বুঝতে হবে। "তদেবং সর্ব্বাভির্মিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্।" ( ঐ ১৭ অনুঃ )

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০.১২।১১। শ্লোকের) বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে—"ভগবাংস্তাবদসাধারণস্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যস্তত্ত্ববিশেষঃ। তত্রস্বরূপং পরমানন্দ ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্তস্বাভাবিকপ্রভুতা মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিকরূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবম্।" অর্থাৎ "অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যতত্ত্ববিশেষের নাম 'ভগবান্।' স্বরূপ অর্থে 'পরমানন্দ' ঐশ্বর্য বলতে অসমোর্ধ্ব অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা, এবং অসমোর্ধ্ব সর্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির সৌষ্ঠব বা সুন্দরতার নামই 'মাধুর্য।'" সার কথা এইযে, যাঁর সমান অথবা অধিক সর্বশক্তিমত্বাদি প্রভুতা কারও নেই, যাঁর সমান অথবা অধিক সর্বমনোহর রূপ, গুণ, লীলার সুন্দরতাও কারও নেই—এরূপ অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা ও সৌন্দর্যাদি সমন্বিত সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বের নামই "ভগবান্।"

পরব্রহ্মের স্বরূপ যে সচ্চিদানন্দময়, তা শ্রুতি ও উপনিষদে বহুস্থানে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। যথা—"সচ্চিদানন্দময়ং পরব্রহ্ম" নৃ পূর্ব্ব ১।৬। "সর্ব্বপূর্ণরূপোঽস্মি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ" মৈত্রী

৩।১২। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈ ২।১।১। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" বৃ ২।৯।২৮। "আনন্দং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" তৈ ২।৬।১। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি। পরব্রহ্মের নিরতিশয় ঐশ্বর্যের কথাও শ্রুতি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। তিনি অন্তর্যামী, বিধাতা, মহেশ্বর, বিরাট্—তাঁর প্রশাসনে চন্দ্র সূর্যাদি জোতিষ্কমণ্ডল, অগ্নি স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থেকে বিশ্বের সৃষ্টি সংহারক হন। সেই ঈশ্বরের ভূমা সত্তায় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। যথা—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্।" ঈশ ১। "সর্ব্বস্য প্রভুম্ ঈশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ" শ্বেত ৩।১৭।৩। "এষ সর্বেবশ্বর এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্য্যামী' মাণ্ডুক্য-- ৬। "বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ" শ্বেত—৩।১৮। অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম তাঁর শাসনাধীন। যাজ্ঞবল্ক গার্গীর প্রতি বলেছেন—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত" ইত্যাদি। শ্রীগীতাও বলেন,—"শশিসূর্য্যনেত্রম্" 'চন্দ্র সূর্য্য শ্রীভগবানের নয়ন।' শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্বীয় বিভূতি বর্ণনে অসমর্থ হয়ে অর্জুনের প্রতি বলেছেন—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥" (গীতা—১০।৪১)

অর্থাৎ "এই বিশ্বে ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবান্বিত যত বস্তু আছে, তা সমস্তই আমার তেজের অংশসম্ভূত বলে জানবে।"

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের একপাদ বিভূতি—ত্রিপাদ ঐশ্বর্য চিন্ময় ধামে। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত" ইতি সেই 'ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?' এর উত্তরে বলা হয়েছে—"স্বে মহিম্নীতি" 'স্বীয় অসীম মহিমায় !'

বেদ, উপনিষদে ভগবদ্-মাধুর্যেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। আর্য ঋষিগণ শ্রীভগবানের উপাসনা প্রভাবে এই বিশ্বের সর্বত্রই এক অখণ্ড রসস্বরূপ মাধুর্যময় পরমপুরুষের অভিব্যক্তি অনুভব করতেন। ঋগ্বেদে "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব" ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হয়েছে—'বায়ু মধুধারা বহন করে, সিন্ধু মধুক্ষরণ করে, ওষধিসমূহ, দিবারাত্রি, পার্থিব রজঃ সবই মধুময় হয়।' অন্তরে তাঁরা যদি কোন এক অপরূপ রসময় মধুময় তত্ত্বের সন্ধান না পেতেন, তাহলে কখনই বহির্জগতে ঐরূপ মধুর-ভাবটির উপলব্ধি হত না। বৃহদারণ্যক মধুবিদ্যায় উক্ত আছে—"অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ মধু" অর্থাৎ 'পরমাত্মা শ্রীভগবান্ সর্বভূতেরই মধুস্বরূপ।'

অখণ্ড স্বরূপৈশ্বর্য-মাধুর্যময় শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দসিন্ধু। প্রেমময়, রসময় এবং আনন্দময় তাঁর বিগ্রহ। প্রাকৃত গুণময় নয় বলে তাঁর বিগ্রহ নিত্য। আনন্দই তাঁর দেহ—"আনন্দমাত্রকর-পাদমুখোদরাদিঃ।" যা তাঁর দেহ, তাই তাঁর আত্মা, ভগবৎ-স্বরূপে দেহ দেহী ভেদ নেই-"দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" এই কূর্মপুরাণবাক্যে শ্রীভগবানের যে দেহদেহী ভেদ

নেই, তা বুঝতে পারা যায়। বরাহপুরাণে উক্ত আছে—"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥" শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্তিই নিত্য শাশ্বত। ঐ সমস্ত মূর্তির গ্রহণ নেই, ত্যাগ নেই - উহা প্রাকৃত নয়, সবই অপ্রাকৃত চিন্ময়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। অস্পৃষ্ট ভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥" (ভাঃ ১০।১৩।৫৪) অর্থাৎ "ভগবানের মূর্তিসমূহ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও একমাত্র আনন্দরসস্বরূপ। বেদান্তজ্ঞান-সুনির্মলচিত্তেও ঐ সমস্ত মূর্তির অসীম মাহাত্ম্য অনুভূত হয় না।" তাই জ্ঞানবাদিগণ ঈশ্বরের বিগ্রহকে মায়াময় বলে মনে করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রতি বলেছেন, "ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী। অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবানের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় বলেই তাতে যুগপৎ পরিচ্ছিন্ন ও বিভুস্বভাবের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতেই এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ সম্ভবপর হয়। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সকল বিভু বলেই তা সর্বদেশ সর্বকাল, সর্ববস্তুতে নিত্য ব্যাপ্ত। মূর্ত হলেই পরিচ্ছিন্ন হবে এইযে নিয়ম এটি জগতের লৌকিক বস্তু সম্বন্ধেই জানতে হবে। অলৌকিক ভগবত্তত্ত্বে এই নিয়ম চলে না। শ্রীভগবান্ কালাতীত,

কর্মাতীত ও গুণাতীত— তাঁর মূর্তিও তদ্রূপ। স্বরূপ থেকে মূর্তি অভিন্ন। তাতে আগম-অপচয় নাই। সুদূর অতীতে যা ছিল, বর্তমানেও তাই আছে এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। শ্রীভগবানের দেহ পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত নয়, কেবল অনুভবানন্দের সেই মূর্তি। যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীভগবানের দেহকে পঞ্চভৌতিক বলে মনে করে, সে শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সমস্ত সংকার্য থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য। "যে বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্ বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ॥" প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের জন্ম, কর্মাদি সব দিব্য বা অপ্রাকৃত, তাতে মায়াশক্তির কোন সংস্পর্শ নেই, তা কেবলই চিন্ময়ী লীলাশক্তির বিলাস। লীলারসের অক্ষয় উৎস পরব্যোম, তা অনন্ত ভগবৎস্বরূপের নিত্যলীলাস্থল। সেখান থেকে জীব-জগতের প্রতি কৃপা করে শ্রীভগবান্ নানা স্বরূপে জন্মাদির অনুকরণ পূর্বক বিশ্বে অবতীর্ণ হন এবং দিব্য লীলামাধুর্যের প্রকাশ করে যথাকালে লীলাসম্বরণ করেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবের এটিই রহস্য। যাঁরা তত্ত্বতঃ শ্রীভগবানের এই দিব্য জন্ম কর্মাদির রহস্য জানেন, তাঁদের আর জন্ম-কর্মের বন্ধন থাকে না, তাঁরা মায়ামুক্ত হয়ে শ্রীভগবানকেই লাভ করে থাকেন। যথা—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" (গীতা ৪।৯)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য লিখেছেন,

"মদীয় দিব্যজন্ম-চেষ্টিতযাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্ত-সমস্তমৎসমাশ্রয়ণ-বিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মমাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতীতি।" অর্থাৎ "আমার দিব্য জন্ম-কর্মের যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা আমার চরণাশ্রয়ের বিরোধী নিখিল অনর্থরাজি বিনষ্ট হয়ে যায় ও এইজন্মেই আমার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আমার প্রিয় হয়ে আমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

## শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তি।

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
× × × × × × × × ×
চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্যতিনশক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥" (চৈঃ চঃ)

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট পর-তত্ত্বেরই নাম 'ভগবান্'। এক্ষণে সেই শক্তির বিচার উপস্থাপিত করা হচ্ছে। শক্তিদ্বারাই শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবানের মুখ্যতঃ তিনটি শক্তি। অন্তরঙ্গা

চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। এই তিনটি শক্তিসম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

## অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি।

"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে যে পরাশক্তির কথা বলা হয়েছে, এরই নাম 'অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি'। এই শক্তিটির সহিত শ্রীভগবানের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ বলেই একে 'অন্তরঙ্গাশক্তি' বলা হয়। এটি জড় প্রতিযোগী স্বপ্রকাশলক্ষণযুক্ত বলেই একে 'চিচ্ছক্তি' বলা হয়। এই শক্তিটি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত বলে একে 'স্বরূপশক্তিও' বলে। স্বরূপে ও মহিমায় অপর দুটি শক্তির থেকে এটি শ্রেষ্ঠা বলে একে 'পরাশক্তি' ও বলা হয়। এইভাবে এর অন্তরঙ্গাশক্তি, চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি ও পরাশক্তি এইকয়টি নাম পাওয়া যায়। এই স্বরূপ-শক্তির আবার তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁর সৎ, চিৎ ও আনন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিব্যক্তি প্রাপ্তা এই চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে কথিত হয়।

"সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটির মধ্যে যেমন

কোন একটিকে অপর দুটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই তিনটি শক্তিরও কোনও একটিকে অপর দুটির থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আমরা বলেছি চিচ্ছক্তি স্বপ্রকাশবস্তু, যা নিজেকেও প্রকাশ করে এবং অন্য বস্তুকেও প্রকাশিত করে। যেমন সূর্য উদিত হয়ে নিজেকে প্রকাশিত করে এবং অপর বস্তুকেও প্রকাশ করে থাকে তদ্রূপ। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ-বৃত্তি বিশেষের দ্বারা শ্রীভগবান্, তাঁর স্বরূপ বা স্বরূপশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন, সেই বৃত্তিবিশেষকে বলা হয়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' এই বিশুদ্ধসত্ত্বে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ-শক্তির যুগপৎ অভিব্যক্তি থাকলেও তাদের প্রত্যেকের অভিব্যক্তির পরিমাণ সমভাবে থাকে না। আবার কোনস্থলে বা তিনটিরই সমপরিমাণে অভিব্যক্তিও থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সন্ধিনী শক্তির প্রাধান্য থাকে, তখন তাকে 'আধার শক্তি' বলা হয়, এর থেকে ভগবানের ধামের প্রকাশ হয়।

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥" (চৈঃ চঃ)

সম্বিদংশপ্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'আত্মবিদ্যা'। এই

আত্মবিদ্যার দুটি বৃত্তি—জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্তক। এরদ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

"কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান—সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥" ( ঐ )

বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে তখন তাকে বলে 'গুহ্যবিদ্যা'। এই গুহ্যবিদ্যার দুটি বৃত্তি—ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক। এর দ্বারা প্রীত্যাত্মিক ভক্তি বা প্রেমভক্তির প্রকাশ হয়।

"হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥" ( ঐ )

সত্তা স্বরূপ হয়েও শ্রীভগবান্ যে শক্তির দ্বারা নিজের সত্তাকে ধারণ করেন ও অপরকে ধারণ করান, সেই শক্তির নাম 'সন্ধিনী'। জ্ঞানস্বরূপ হয়েও শ্রীভগবান্ যে শক্তির দ্বারা নিজেকে জানেন ও অপরকেও জানান তার নাম 'সম্বিৎ'। আনন্দ-স্বরূপ হয়েও শ্রীভগবান্ যে শক্তির দ্বারা নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন ও অপরকেও আস্বাদন করান, সেই শক্তির নাম 'হ্লাদিনী'। উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে এই ত্রিবিধশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এরূপ ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে।

বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন তিনটি শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'মূর্তি'। এই শক্তিত্রয়-প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ হয়ে থাকে।

## বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রতি স্বীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীমুখে বলেছেন—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥"
( ভাঃ ২।৯।৩৩ )

অর্থাৎ "পরমার্থবস্তু আমা-ব্যতিরেকে যার প্রতীতি হয়, আমি বিনা ( আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীত ) যার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তাকেই আমার মায়া বলে জানবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার ।"

মায়ার প্রথম লক্ষণ এই যে, পরমার্থভূতবস্তু শ্রীভগবান্ ব্যতীত যার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রতীতি না হলেই মায়ার প্রতীতি হয়। এখানে 'প্রতীতি' বলতে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি বুঝায়। ভগবদ্-উপলব্ধি না হলে অথবা ভগবদুন্মুখতা না জন্মিলে যার কার্যকে বা যাকে সত্য বলে মনে হয়—তাই 'মায়া'। এই লক্ষণে এই কথাই বুঝা গেল যে, যারা ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি, কিম্বা যারা ভগবদ্‌বহির্মুখ—তারাই মায়াকে বা মায়ার কার্য দেহ-দৈহিকাদিকে সত্য বলে মনে করে। তদ্দ্বারা আরও সূচিত হল যে, ভগবৎ-প্রতীতি হলে মায়ার প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ ভগবদনুভবী কিংবা ভগবদুন্মুখব্যক্তি

বুঝতে পারেন যে, মায়ার কার্য সবই অনিত্য, তাঁরা কখনই মায়িক সুখভোগাদিতে প্রলুব্ধ অথবা আসক্ত হন না।

শ্রীভগবান্ মায়ার আর একটি লক্ষণ বল্লেন, 'যার আপনা-আপনি প্রতীতি হয় না—"যৎ ন প্রতীয়েত চাত্মনি।" অর্থাৎ ভগবদাশ্রয় ব্যতীত যার স্বতঃ প্রতীতি নেই। যদিও ভগবৎ-প্রতীতি না হলেই মায়ার প্রতীতি হয় সত্য, তথাপি মায়া সর্বদা ভগবদাশ্রয়ে অবস্থিতা বলে ভগবদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। শক্তি শক্তিমানের আশ্রয়ব্যতীত থাকতে পারে না, সুতরাং মায়া যে ভগবানের শক্তি এরদ্বারা তাই প্রমাণিত হল। পূর্বলক্ষণে বলা হয়েছে, ভগবানের বাইরেই মায়ার প্রতীতি, সুতরাং মায়া যে ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি সেও প্রমাণিত হল।

মায়ার এই দুটি লক্ষণকে পরিস্ফুট করার অভিপ্রায়ে শ্রী-ভগবান্ দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,—"যথাভাসো যথা তমঃ।" অর্থাৎ যেমন আভাস ও তমঃ। 'আভাস' অর্থে উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি-বিশেষ। যেমন আকাশস্থ সূর্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর জলে দেখা যায় : জলস্থিত সেই প্রতিচ্ছবিই 'আভাস'। সূর্যের এই প্রতি-চ্ছবি যেমন সূর্য থেকে বহু দূরে প্রকাশমান সূর্য আকাশে এবং এই প্রতিবিম্ব পৃথিবীর জলে, তদ্রূপ মায়াও ভগবদভিব্যক্তির বহির্ভাগে অবস্থিত। শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তির স্থান পরব্যোমাদি চিন্ময়রাজ্য এবং মায়ার অভিব্যক্তির স্থান প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড।

প্রশ্ন হতে পারে, শক্তি শক্তিমানের মধ্যেই অবস্থান করে, মায়া যখন পরব্রহ্ম হতে এত দূরে অবস্থিত, তখন একে কিরূপে পরব্রহ্মের শক্তি বলা যেতে পারে ? এর উত্তরে বলা হয়েছে, শক্তিমানের আশ্রয়েই শক্তির অবস্থান, শক্তিমানের আশ্রয়ব্যতীত শক্তি থাকতে পারে না। গগনস্থ সূর্য ব্যতীত জলে তার আভাস বা প্রতিবিম্ব—কখনই সম্ভবপর নয়। সুতরাং মায়া পরব্রহ্ম থেকে দূরে অবস্থান করলেও তাঁহার আশ্রয়েই অবস্থান করে বলে মায়া পরব্রহ্মের শক্তি। শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অস্তিত্ব এবং অনুভূতি।

আর একটি দৃষ্টান্ত—"যথা তমঃ।" সূর্যের প্রতিচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতিচ্ছবি স্বীয় উদ্ভট চাকচিক্য-চ্ছটায় দৃষ্টিশক্তিকে আবরিত করে এবং স্বীয় উপকণ্ঠে বর্ণশাবল্য প্রকাশ করে। এই বর্ণশাবল্য অন্ধকারময়, অতএব একেই "তমঃ" বলা হয়েছে। এই বর্ণশাবল্য বা তমঃ যেমন আকাশস্থ সূর্যের বহির্দেশেই থাকে, সূর্যের মধ্যে থাকে না ; অথচ সূর্যের আশ্রয়েই যেমন এই বর্ণশাবল্যের অস্তিত্ব ও অনুভূতি, তদ্রূপ পরব্রহ্মের বাইরে অথচ পরব্রহ্মের আশ্রয়েই মায়ার অস্তিত্ব এবং অনুভূতি। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলেন—এই দৃষ্টান্তে 'জীবমায়া' ও 'গুণমায়া' এইদ্বিবিধ বহিরঙ্গামায়ার কথাও বলা হয়েছে। পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্যের প্রতিচ্ছবি যেমন স্বকীয় অত্যন্ত উদ্ভট তেজোরাশিদ্বারা দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তিকে আবরিত করে

জীবমায়াও তেমনি জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে। এর আবরিকা ও বিক্ষেপিকা এই দুটি বৃত্তি। আবরিকা বৃত্তি জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে, অর্থাৎ জীব যে স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু তা জানতে দেয় না আর বিক্ষেপিকাবৃত্তি জীবের মধ্যে অন্যথা জ্ঞান জন্মায় অর্থাৎ চিদ্-প্রতিযোগী জড়দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মায় এবং দেহেন্দ্রিয়ের ভোগ-যোগ্য মায়িক ভোগ্যবস্তুতে চিত্তবৃত্তিকে বিক্ষিপ্ত করে।

আবার অত্যন্ত উদ্ভট চাকচিক্যময় সূর্য-প্রতিচ্ছবি যেমন স্বীয় উপকণ্ঠে বর্ণশাবল্য উদ্গিরিত করে, কখনও বা সেই বর্ণশা-বল্যকে পৃথক্‌ভাবে নানাকারে পরিণত করে, তদ্রূপ মায়াও সত্ত্বাদি গুণসাম্যরূপা গুণমায়াখ্যা জড়াপ্রকৃতিকে উদ্গিরিত করে, কখনও বা সত্ত্বাদি গুণ সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানাকারে পরিণত করে। ইহাতে বুঝা গেল মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণই গুণমায়া। মায়ার এই তিনটি গুণ বিশ্বের গৌণ উপাদান কারণ।

"জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

## তটস্থা জীবশক্তি।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের শক্তি, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ "বিষ্ণুশক্তি ( স্বরূপশক্তি ) পরা-শক্তি নামে অভিহিতা; অপর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি ( জীবশক্তি ), অন্য একটি তৃতীয়াশক্তি অবিদ্যাকর্ম সংজ্ঞায় ( বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলে ) অভিহিতা হয়ে থাকেন।" শ্রীগীতাতেও দৃষ্ট হয়—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি বল্লেন—"হে মহাবাহো! ইহা (মায়াশক্তি) হতে ভিন্না জীবশক্তিরূপা আমার একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে বলে জানবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই বিশ্বকে ধারণ করে আছে।"

"জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥" (চৈঃ চঃ)

এই জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় পৃথক্ একটি শক্তি বলে একে 'তটস্থাশক্তি' বলে। "অথ তটস্থত্বঞ্চ × × × × × উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব।" জীবশক্তি চিৎরূপা, শ্রীভগবান্ বিভুচিৎ এবং তাঁহার বিভিন্নাংশ জীব অণু চিৎ। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে,—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করে তার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করলে যে ধারণাতীত সূক্ষ্ম

অংশ হয়, তাই জীবের পরিমাণ। অর্থাৎ জীব সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। জীব সংখ্যায় অনন্ত! সেই জীব আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যা তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একোবর্গঃ অনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্তু অনাদিত এব ভগবৎ-পরাঙ্মুখঃ স্বভাবতঃ তদীয় জ্ঞানভাবাৎ তদীয় জ্ঞানাভাবাৎ চ।" (পরমাত্মসন্দর্ভঃ) অনাদিকাল থেকেই যাঁদের ভগবদ্‌জ্ঞান বা ভগবদুন্মুখতা আছে, তাঁরা অনাদিকাল হতেই ভগবদুন্মুখ এবং অনাদিকাল থেকেই যাদের ভগবদ্বিস্মৃতি বা ভগবদ্বহির্মুখতা আছে তারা অনাদি ভগবদ্‌বহির্মুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় বলেছেন

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম—ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥" (চৈঃ চঃ)

## শ্রীভগবানই ভজনীয়তত্ত্ব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলেছেন—

"কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ)

অনাদি ভগবৎ-বহির্মুখতাবশতঃ জীবহৃদয় সর্বদাই মলিন, এজন্যই জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দের অংশ বা আনন্দস্বরূপ হয়েও অনাদিকাল থেকে মায়াপরাভূত দশায় নানাযোনীতে সংসার দুঃখ ভোগ করে বেড়াচ্ছে। ভগবৎপাদপদ্ম-ভজনব্যতীত জীবের এই মায়াবন্ধনমোচন এবং শাশ্বত আনন্দলাভের অন্য কোন উপায়ই নেই। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (৭।১৪)

"হে অর্জুন! এই ত্রিগুণাত্মিকা জীবমোহিনী আমার মায়া অতি দুরতিক্রমণীয়া, ক্ষুদ্রজীব প্রবলা মায়াশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একে জয় করতে সমর্থ হয় না। যাঁরা আমারই শরণাগত হন, তাঁরাই এই মায়াসিন্ধু উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন।" এইবাক্যে ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগতি বা ভগবদ্ভজন-ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই বা সাধনেই যে দুস্তর মায়াসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তা স্পষ্টই জানা গেল।

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার॥" (চৈঃ চঃ)

অতএব কৃষ্ণনিত্য দাস জীব মায়ান্ধকারের পরপারে প্রেমালোকের রাজ্যে গিয়ে যদি সচ্চিদানন্দময় ভগবৎসেবানন্দলাভে

চিরধন্য হওয়ার বাসনা করেন, তাহলে অতি অবশ্যই তাঁদের ভগবদ্ভজনপথ আশ্রয় করতে হবে। এ জন্য শ্রীভগবান্ অর্জুনের প্রতি বলেছেন –

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥"

(গীতা — ১৮।৬২)

"হে ভারত! তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁর প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।" শ্রীগীতাশাস্ত্রে নিষ্কামকর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনার কথা বলে পরিশেষে বলেছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

(ঐ ১৮।৬৪ - ৬৬)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি বলেছেন, "হে অর্জুন! সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমায় পুনরায় বল্‌ছি, আমার সেই পরমবাণী তুমি শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়—তাই তোমার হিত বল্‌ছি। তুমি আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও,

আমারই অর্চনা কর, আমাকেই নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি সত্য অঙ্গীকার করছি যে এরূপ করলে তুমি আমাকেই পাবে। তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, অতএব শোক করো না।"

"পূর্ব্বে আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে শেষে সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম জ্ঞাপন করেছেন এবং সেই নিগূঢ় মর্ম যে ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগতি বা ভগবদ্‌ভজনই, তা সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। জীবন স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী নানাধর্মের অনুষ্ঠান করে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন পূর্বক শ্রেয়ঃ লাভ করতে হলে জীবনলীলা সমাপ্ত হয়ে যায়—শ্রেয়ঃ লাভ আর হয় না। তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ সকল ধর্ম উপেক্ষা করে অর্জুনকে সর্বতোভাবে তাঁর চরণে শরণাগত হয়ে তাঁর ভজনের উপদেশ প্রদান করেছেন। আশ্রিত-বৎসল শ্রীভগবান্ তাঁকে ভক্তিযোগ সিদ্ধির অন্তরায়স্বরূপ নিখিল পাপরাশি থেকে রক্ষা করবেন—এরূপ আশ্বাসও প্রদান করেছেন। জীব তার অনাদি সংস্কার-মলদুষ্ট চিত্তের রাগদ্বেষাদি কষায়সমূহ কোনরূপেই স্বীয় সামর্থ্যে ক্ষালন করতে সমর্থ হয় না,

সুতরাং বুদ্ধিমান্ জন ভগবৎপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হয়ে তাঁর ভজনপথ অবলম্বনে ধন্য হয়ে থাকেন। সর্ববিষয়ে স্বীয় কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জনপূর্বক ভগবচ্চরণে নির্ভর করে শরণাগত সাধক ভগবৎকৃপার স্নিগ্ধ শীতল পরশ পেয়ে পরাশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হন। সুতরাং যাঁরা ত্রিতাপজ্বালা জুড়াতে ও প্রেমপাথারে অবগাহন করতে বাসনা করেন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে শরণাগত হয়ে তাঁর ভজনপথ অবলম্বন করে কর্মফললব্ধ দেহের অবসানে পার্ষদরূপে ভগবৎসেবানন্দে মগ্ন থেকে অনন্তকাল শ্রীহরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলার মাধুর্য নিত্য নব নব ভাবে আস্বাদন করে ধন্য হয়ে থাকেন - এবিষয়ে কোন শাস্ত্র অথবা মহাজনমতের কোনরূপ বিরোধ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলেছেন—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥"

(ভাঃ ১১।১১।৩২)

অর্থাৎ "হে উদ্ধব! আমা' কর্তৃক বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট ধর্মসমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জেনেও তাদৃশ ধর্মানুষ্ঠান মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলে মদ্ভক্তিবলেই সর্বসিদ্ধি হবে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় সহকারে সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও উত্তম সাধুরূপে গণ্য হয়ে থাকেন।

"শ্রীপাদ শুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ভাগবতকথনারম্ভে

নিখিল কৃষ্ণেতর বস্তুতে আবেশ ত্যাগ করে শ্রীভগবদ্‌ভজনেরই উপদেশ প্রদান করেছেন—

"তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥" (ভাঃ ২।১।৫)

'অতএব হে মহারাজ পরীক্ষিত! অভয়লাভেচ্ছু-ব্যক্তির পক্ষে সর্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য ও স্মর্তব্য।" এইশ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ লিখেছেন—"সর্ব্বাত্মেতি প্রেষ্ঠত্বমাহ। ভগবানিতি সৌন্দর্য্যম্, ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বম্, হরিরিতি বন্ধহারিত্বম্, অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা।"

শ্রীল শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম এইপ্রকার যে, শ্রীভগবানই যে জীবের ভজনীয়তত্ত্ব শ্রীপাদ শুকমুনি উক্তশ্লোকে শ্রীভগবানের চারটি নাম দ্বারা তাই বুঝাতে চেয়েছেন। শ্রীভগবান্ 'সর্বাত্মা' অর্থাৎ সবজীবেরই নিত্যপ্রিয়। কল্যাণময়ী শ্রুতি মাতাও বলেন—"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরযদয়মাত্মা" (বৃ—১।৪।৮) অর্থাৎ "পুত্র, বিত্ত ও অন্যান্য নিখিলবস্তুর থেকে সেই অন্তরতর আত্মা প্রীত্যাস্পদ।" "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ 'সকলবস্তু সেই বস্তুসমূহের জন্য প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্য সবই প্রিয় হয়।' আত্মার চিদাভাস জড়ের উপর প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে চেতিত করে এবং তাকে প্রীতির বিষয় করে তুলে।

আবার আত্মার আত্মা পরমাত্মা বা শ্রীভগবানের প্রিয়তার নিমিত্তই আত্মার এত প্রিয়তা। পরমাত্মাই নিরুপাধী প্রীত্যাস্পদ। বিশ্বের নিখিলবস্তুর সঙ্গে সেই এক মহান্ আত্মা ওতঃ-প্রোতভাবে অনুস্যূত থেকে আত্ম, অনাত্ম নিখিলবস্তুকে প্রিয় করে তুলেছেন ! "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" এই শ্রী-শুকোক্তিতে এই তত্ত্বই জানা যায়। যেমন জলের স্বাভাবিক গতি সিন্ধুর দিকে, তদ্রূপ সব জীবের ভালবাসার স্বাভাবিক গতি শ্রীভগবানেরই দিকে। আবার "প্রিয় এব বরণীয়ো ভবতি" অর্থাৎ 'প্রিয়বস্তুই বরণীয় হয়ে থাকে,' এই সুপরিচিত সত্যের দ্বারা শ্রী-ভগবানের সুখারাধ্যতা জানা যায়।"

প্রশ্ন হতে পারে, কেবল একনিষ্ঠ ভক্তগণেরই ভালবাসার গতি শ্রীভগবানের দিকে, এটিই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং সকলের ভালবাসার গতি ভগবানের দিকে, একথা আমরা কিরূপে বুঝব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, জলের স্বাভাবিক গতি সমুদ্রের দিকে হলেও সব জলই যে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় তা দেখা যায় না, কেবল গঙ্গাদি নদীর জলই সিন্ধুর পানে ধাবিত হয়। কোন গর্তে বা ডোবায় যে জল আবদ্ধ হয়ে যায়, তার গতি রুদ্ধ হয়, তা ক্রমশঃ কর্দমাক্ত হয় এবং শেষে পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে তাতে অজস্র পোকা কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে। জলের কার্য যে স্নান-পানাদি তদ্দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না। তবু কিন্তু সেই জলেরও সিন্ধুর দিকে ধাবিত হওয়া স্বভাব অথবা যোগ্যতা নাশ

পায় নি। তখন যদি বিপুল বারিপাত হয় এবং সেই প্রচুর বর্ষার জলের জলধারা সেই গর্তে প্রবিষ্ট হয়, তখন সেই জল স্ফীত হয়ে উঠে; তার দুর্গন্ধ পোকাদি কোথায় হারিয়ে যায়, সেই জল নির্ম্মল হয়ে নদী নালার মধ্যদিয়ে গঙ্গায় এসে প্রবিষ্ট হয় এবং গঙ্গাধারার সঙ্গে মিশে অবিরত সিন্ধুর পানে ছুটতে থাকে। তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসারী জীবের ভালবাসা বিষয়গর্তে আবদ্ধ হয়ে স্বার্থপরতায় পঙ্কিল হয়ে যায়। সহস্র সহস্র বিষয়বাসনারূপ কীট তাতে কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে। ভালবাসার কাজ পরার্থপরতাদি তার দ্বারা কিছুই হয় না। তখনও কিন্তু তার শ্রীভগবানের প্রতি ধাবিত হওয়া স্বভাব থাকে। যদি সাধুসঙ্গে প্রচুর হরিকথামৃতের বর্ষণ হয় এবং সেই কথামৃতধারা মহৎকৃপা সম্বলিত হয়ে তার কর্ণদ্বার দিয়ে হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়; তাহলে তার ভালবাসা বিষয়নিষ্ঠা, স্বার্থপরতাদি ত্যাগ করে নির্ম্মল হয়ে যায় এবং তার শ্রীহরির দিকে ধাবিত হওয়া স্বভাব ফুটে উঠে। ক্রমশঃ ভক্তি-মন্দাকিনী ধারার সঙ্গে মিশে উহা অবিরত শ্রীভগবানের প্রতি ছুট্‌তে থাকে। শ্রীপাদ শুকমুনি 'সর্ব্বাত্মা' এই শব্দের দ্বারা এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করেছেন।

আবার তিনি 'ভগবান্‌' অর্থাৎ অপার সৌন্দর্য-মাধুর্যময়। বিশ্বের সব মানবই সৌন্দর্যের উপাসক। তারা চক্ষে সুন্দর রূপ দেখতে চায়, কাণে সুন্দর কথা সুমিষ্ট গান শুনতে চায়, জিহ্বায় সুন্দর সুস্বাদু ভোজ্য আস্বাদন করতে চায়, নাসিকায় সুন্দর সুগন্ধি

দ্রব্যের ঘ্রাণ নিতে চায়, ত্বকে সুন্দর সুকোমল বস্তুর স্পর্শ কামনা করে, মনে সুন্দরের কথা চিন্তা করে ও সুন্দরকেই ভালবাসে। এই যে সর্বেন্দ্রিয়ে মানবের সৌন্দর্যোপাসনার প্রবৃত্তি এতে সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' অনন্ত সুন্দর অনন্ত মধুর শ্রীভগবদুপাসনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। কারণ প্রাকৃত জগতের জড়ীয়রূপ, রসাদি বিষয়সমূহ দুঃখদ এর নিষেবণে কারো কোন দিন তৃপ্তি আসে না। যখন মহৎকৃপায় মানবের ইন্দ্রিয় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ, রসাদির সন্ধান পায়, তখন তার সর্বেন্দ্রিয় তাতেই চিরতরে মগ্ন হয়ে যায়। জড়ীয় রূপ রসাদি তার নিকট অতিশয় ঘৃণ্য বোধ হয়ে থাকে। শ্রীপাদ শুকমুনি 'ভগবান্' এই শব্দের দ্বারা শ্রীভগবানই যে বিশ্বমানবের ভজনীয়, এই তত্ত্বের ইঙ্গিত করেছেন।

আবার 'ঈশ্বর' এই নামের দ্বারা প্রতিটি মানবেরই যে তাঁর ভজনের একান্ত আবশ্যকতা আছে, তা জানা যায়। কারণ ঈশ্বরের ভজনেই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় হয়ে থাকে। জড়ীয় দেহ-দৈহিকাদিতে 'আমি আমার' বুদ্ধি-নিবন্ধন সংসারভয়ে যাদের চিত্ত সতত উদ্বিগ্ন, নিত্য অচ্যুতের ভজন প্রভাবেই সর্বতোভাবে তাদের ভয় নিবৃত্ত হয় এবং অভয় অমৃতস্বরূপ ভগবৎপ্রেমলাভে তাঁরা চিরতরে ধন্য হয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩০) দৃষ্ট হয়—

"মনোঽকৃতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥"

পক্ষান্তরে যারা ঈশ্বরের ভজন করে না, তারা দুষ্কৃতি, অতি নরাধম, মায়াচ্ছন্নবুদ্ধি ও আসুরিক-ভাবাশ্রিত। ঈশ্বরই সেই সব নরাধমগণকে সর্প, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র যোনীতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করে থাকেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী গীতা থেকে এই কথাই জানা যায়।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥" (৭।১৫)
"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপামজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনীষু ॥" (১৬।১৯)

এই সব প্রমাণে প্রতিটি মানবেরই ঈশ্বর-ভজনের একান্ত আবশ্যকতা জানা যায়। শেষে বলা হয়েছে 'হরি'। জীবের সংসার বন্ধন হরণ করতে ভগবান্ ব্যতীত আর অপর কেউই সমর্থ নন। হরি কেবল সংসারবন্ধনই হরণ করেন না, প্রেমদিয়ে মনটিকেও হরণ করে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলেছেন—

"হরি শব্দের নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন ॥" ( চৈঃ চঃ )

জীবের সংসার বন্ধনের মৌলিকহেতু পাপপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অমঙ্গল শ্রীহরি হরণ করে থাকেন। যা চাইলে পাওয়া যায় না, এরূপ মূল্যবান্ বস্তুই লোকে হরণ করে থাকে ; শ্রীহরি চাইলেই ত তাঁকে সকলে অমঙ্গল দান করবেন, হরণ করার প্রয়োজন কি ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, জগতের মানুষ বিষয়-বাসনাদি অমঙ্গলকেই

নিজের মঙ্গল বলে মনে করে, তাই শ্রীহরি গোপনে তা হরণ করে থাকেন এবং বিষয়বাসনায় পূর্ণ হৃদয় শূন্য হল জেনে প্রেম দিয়ে হৃদয়টি পূর্ণ করে স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি গুণে মনটিকেও হরণ করে থাকেন। এজন্য শ্রীহরিই মানবের ভজনীয় তত্ত্ব।

শ্রীপাদ শুকমুনি অপর একটি শ্লোকে শ্রীভগবানই যে জীবের ভজনীয়তত্ত্ব তা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র॥"
(ভাঃ ২।২।৬)

শ্রীভগবদ্ভজনই জীবের পরম কর্তব্য, যেহেতু তিনি সকলের চিত্তে সর্বদা বিরাজিত, তিনি সকলের আত্মা সুতরাং পরমপ্রিয়, তিনি নিত্য সত্য অবিনশ্বর স্বরূপ, ভজনীয় গুণসম্পন্ন, তাঁর ভজনটি স্বতঃই আনন্দপূর্ণ, দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে তাঁর ভজনে রত হলে অনায়াসে অবিদ্যার উপরম হয়ে থাকে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ লিখেছেন—"ভজনীয়ত্বে হেতবঃ স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধঃ, যত আত্মা অতএব যঃ প্রিয়ঃ তস্য চ সেবা সুখরূপৈব। অর্থঃ সত্যঃ নত্বানাত্মবন্মিথ্যা। ভগবান্ ভজনীয়গুণশ্চ অনন্তঃ নিত্যঃ। য এবম্ভূতঃ তং ভজেত। নিয়তার্থঃ নিশ্চিতস্বরূপঃ। তদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃ সন্নিতি স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতম্। কিঞ্চ যত্র যস্মিন্ ভজনে সতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া উপরমো নাশো ভবতি।" "অত্র চকারাত্তৎপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া।" (শ্রীজীবপাদ)

তাৎপর্য এইযে, এইশ্লোকে শ্রীপাদ শুকমুনি শ্রীভগবানই যে জীবের ভজনীয়তত্ত্ব, সে বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ বা অনন্যসাধারণ কারণ দেখিয়েছেন। প্রথম কারণ—শ্রীভগবান্ সকল জীবের অন্তরে সতত বিরাজ করেন, সুতরাং তাঁর ভজনের নিমিত্ত তাঁকে কোথাও অন্বেষণ করতে হয় না। তিনি অন্তরের কথা সবই জানেন বলে তাঁর সেবায় বাহ্যোপচার না থাকলেও তিনি মানসে অর্পিত প্রীতি-উপচারেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।* তিনি আমাদের অনন্ত ভূত, ভবিষ্যৎ সবই অবগত আছেন বলে, আমরা যদি শত সহস্র জন্ম পরেও তাঁর ভজন করি, তিনি এখন থেকেই আমাদের ভজনোপযোগী কৃপা বিতরণ করতে থাকেন। আমরা তাঁর ভজনপথে একপদ অগ্রসর হলে তিনি আমাদের দিকে সহস্র পদ এগিয়ে আসেন। এরূপ গুণাবলী শ্রীহরি ব্যতীত অপর কোন দেব-দেবীতেই সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীভগবান্ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, এজন্য সকলের সর্বাধিক প্রিয়। প্রিয়জনের সেবা স্বতঃই সুখস্বরূপ—সুতরাং শ্রীহরি সকলেরই সততই সুখারাধ্য।

তৃতীয়তঃ শ্রীভগবান্ সত্যস্বরূপ, অনাত্ম দেহ-দৈহিকাদির ন্যায় মিথ্যা বা নশ্বরবস্তু নন, সুতরাং তাঁর ভজনটিও পরম সত্য বস্তু। উহা জীবের আত্মিক সম্পদ্ অর্থাৎ অনন্তকালের নিমিত্ত

---

* ভক্তিতত্ত্ববিজ্ঞানে সেবাধ্যান প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

আত্মার সম্পদ্রূপে বিরাজ করে। প্রাকৃত ধর্ম কর্মাদির ন্যায় উহা তুচ্ছ বা নশ্বর নয়। যথাকথঞ্চিৎ ভজনও দৈবাৎ সাধকের অসৎসঙ্গজনিত প্রবল অনর্থে ভক্তিপথে অগ্রগতি পুনঃপুনঃ ব্যাহত হলেও জন্মান্তরেও স্থূল অনর্থাদির অপগমে ভজনসম্পদটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থতঃ শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্য কারুণ্যাদি অপার ভজনীয় গুণসম্পন্ন। স্বল্পভজন বা সেবা বহু বলে মনন করে থাকেন, তাঁকে এক-গণ্ডুষ জল ও একপত্র তুলসী সমর্পণ করলেও তিনি ভক্তকে আত্মদান করে থাকেন।

আবার শ্রীহরির ভজনে কোন ক্লেশ নেই. তাঁর ভজনটিই সাক্ষাৎ সুখস্বরূপ। আনন্দময় শ্রীভগবান্, তাঁর নাম, গুণ, লীলাতেই সেই আনন্দের অভিব্যক্তি; সুতরাং যখন শ্রবণ কীর্তনাদিতে ভক্ত সেই আনন্দের আস্বাদ লাভ করেন, তখন ভক্তের ভজনটি স্বাভাবিক এবং পরম সুখকর হয়ে উঠে। সেই অনায়াস-নিষ্পন্ন এবং পরম সুখকর ভগবদ্ভজনের আনুষঙ্গিক ফলেই সূর্যের উদয়ে অন্ধকার নাশের ন্যায় সংসার ক্লেশের হেতু অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত

হয় এবং ভজনের মুখ্যফলে ভক্ত অচিরায় শ্রীভগবানের দর্শন এবং সাক্ষাৎ সেবা লাভে অনন্ত কালের জন্য ধন্য বা কৃতার্থ হয়ে থাকেন।

এস্থলে ইহাও বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রই বিশ্বমানবকে অনাদি, অনন্ত, লোকাতীত ও দুর্জ্ঞেয় শ্রীভগবৎস্বরূপের পরিচয় প্রদান করে থাকেন। সুতরাং বেদশাস্ত্র প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপই হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের উপাস্য। বর্তমানযুগে কালের প্রভাবে কোন ঐন্দ্রজালিক অথবা যোগসিদ্ধপ্রভাবসম্পন্ন মানবগণকে ভগবান্ বানিয়ে উপাসনা করার হুজুক্ সর্বত্রই দৃষ্ট হচ্ছে। বিশেষতঃ মানুষকে ভগবান্ বানাবার প্রবণতা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আবার সর্বাধিক দৃষ্ট হয়ে থাকে। বঙ্গদেশে এই সব অবতারের উপদ্রব এতই অধিক যে, সাধারণ সরলপ্রকৃতি মানবগণ তুচ্ছ ধন-জনাদির আকাঙ্ক্ষায় জীব-প্রতারক এই সব মানুষ-ভগবানের উপাসনা করে দেব-দুর্লভ মানব জীবনকে ব্যর্থ করছেন। তাই বলি—সাধু সাবধান! আমাদের ভগবানের অভাব নেই যে নূতন ভগবানের অনুসন্ধান করে তাঁর উপাসনা করতে হবে। এই বিশেষ কলিতে প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে বেদশাস্ত্র ও সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতি

নিগূঢ় উপাসনাপদ্ধতি প্রচার করে এযুগের মানবগণকে ধন্য করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূলাশক্তি শ্রীশ্রী-রাধারাণী এবং মাধুর্য-মূরতি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপা-সনাতেই মানবগণ চিরকৃতার্থ হয়ে থাকেন। পরবর্তি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব বিজ্ঞানে এই প্রসঙ্গ সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

# শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান

## শ্রীকৃষ্ণই বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

সর্বোপনিষৎ সার শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলেছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।" (গীতা—১৫।১৫) 'হে অর্জুন! আমিই সর্ববেদের বেদ্য, আমি বেদান্তকর্তা এবং আমিই বেদবিৎ।' এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপসংহারে স্বীয় প্রিয়সখা, পরমভক্ত ও মাতুলেয় অর্জুনকে কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন এবং সর্বস্বরূপের সর্বপ্রকার ভজনকে অতিক্রম করে সরাসরি স্বচরণারবিন্দ-ভজনকেই সর্ব গুহ্যতম তাঁর পরমবাণীরূপে ঘোষণা করেছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥"
(গীতা—১৮ ৬৪)

'হে অর্জুন! আমি তোমায় ইতিপূর্বে গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলেছি, কিন্তু তাই আমার সর্বশেষ

উপদেশ নয়। যা সর্বশেষ উপদেশ সর্বগুহ্যতম জ্ঞান তা এক্ষণে বলছি, তুমি মন দিয়ে শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিতের নিমিত্ত যা সর্বোত্তম মঙ্গল, সেই কথা এক্ষণে বলব। এরূপে শ্রীকৃষ্ণ যা তাঁর সর্বশেষ উপদেশ সর্বগুহ্যতম ভজন বিষয়ে অর্জুনের মনোযোগ আকর্ষণ করে বল্লেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

(ঐ ১৮.৬৫-৬৬)

"হে অর্জুন! তুমি আমাতে মন সমর্পণ কর অর্থাৎ সতত আমাকেই চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ সর্বদা আমার শ্রবণ-কীর্তনাদি কর, আমার পূজা অর্চনা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর—তাহলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, আমি তোমার নিকট একথা সত্য করে বলছি। তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমারই শরণ গ্রহণ কর—আমি তোমায় সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত করব - অতএব শোক করো না।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইভাবে শ্রীগীতার উপসংহারে সর্বাতিক্রম পূর্বক স্বচরণারবিন্দ ভজনের উপদেশ দান করে তিনিই যে নিখিল বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য শ্রীঅর্জুনের লক্ষ্যে বিশ্বমানবের নিকট এই তথ্যই জ্ঞাপন করেছেন।

শ্রীগীতার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতও শ্রীকৃষ্ণৈক তাৎপর্যময়। শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে বিশ্বমানবকে আপ্যায়িত করার জন্যই তাঁর শুভ আবির্ভাব। সর্গ, বিসর্গাদি দশটি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত থাকলেও দশটি বিষয় বর্ণনাই তাঁর উদ্দেশ্য নয় – একমাত্র আশ্রয়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই তাঁর উদ্দেশ্য। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণিত আছে—"দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।" অর্থাৎ দশম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিমিত্তই সর্গাদি নয়টি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত। সেই দশমতত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণই। "দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥" ভাবার্থদীপিকা (ভাঃ ১০।১।১) অর্থাৎ 'যিনি আশ্রিতদিগের আশ্রয়বিগ্রহ, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগৎসমূহেরও আশ্রয়—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থকে নমস্কার করি।' এইবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতেরও যে তিনি পরমাশ্রয়, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করেছিলেন—

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া॥
তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥"

(ভাঃ ২।১।১২—১৩)

"হে সূত! তোমার কল্যাণ হোক্। যদুপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য সাধনের নিমিত্ত শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন তা তুমি জান। কৃষ্ণকথা শ্রবণেচ্ছু আমাদের নিকট তুমি নিরন্তর কৃষ্ণকথাই বর্ণনা কর—সমগ্র বিশ্বজীবের কল্যাণের এবং সমৃদ্ধির নিমিত্ত যাঁর শুভ-আবির্ভাব।" এইপ্রশ্নের উত্তরেই শ্রীসূতমুনির ভাগবত বর্ণনায় প্রবৃত্তি, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যে শ্রীকৃষ্ণৈকপর—এতে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না। বিশেষতঃ শ্রীসূতমুনি শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনার প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপেও ঘোষণা করেছেন।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃষামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

"শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির সহিত স্বধামে প্রস্থান করলে কলিকালের নষ্টদৃষ্টি মানবগণের নিমিত্ত তাঁর প্রতিনিধিরূপে এই পুরাণসূর্য শ্রীমদ্ভাগবত সমুদিত রয়েছেন।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীমদ্‌ভাগবত যে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোন বস্তু প্রতিপাদন করবেন একথা চিন্তাও করা যায় না। তা' ছাড়া গরুড়পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে "সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হতে প্রকাশিত বলেছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনই তাঁহাব্যতীত অন্যবস্তুর প্রতিপাদক হতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেষ্টা তা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও সুস্পষ্টভাবেই লিখিত আছে—"যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি

পূর্ব্বং যো বিদ্যা হইস্মৈ গাপয়তি কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষু বৈঁ শরণমহং প্রপদ্যে॥” ‘যে ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে আত্মবিদ্যা দান করেছিলেন, সেই আত্মবিদ্যা প্রকাশক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আমি শরণ গ্রহণ করি।’ এরূপে ব্রহ্মার হৃদয়কে দ্বার করে নারদ-ব্যাসাদি ক্রমে যে আত্ম-বিদ্যা বিশ্বে আত্ম-প্রকাশ করেছেন—তাঁরই নাম ভাগবতীবিদ্যা, তাই শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য।

কেউ কেউ মনে করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম ও উপ-সংহারে “সত্যং পরং ধীমহি” ব’লে ভাগবত-প্রতিপাদ্যতত্ত্বের ধ্যান আছে, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত কোনও বিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি-পাদক নন। তদুত্তরে বলা যেতে পারে, ‘সত্য’ শ্রীকৃষ্ণেরই একটি নাম। মহাভারতে ভীষ্মদেবের উক্তিতে দৃষ্ট হয়

“সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥”

“শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ সত্য হতেও পরমসত্য, তাই শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম সত্য।” শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও ‘সত্য’ নামেই দেবকীগর্ভগত শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেছেন—

“সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনীং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥”

(ভাঃ ১০।২।২৬)

"আমরা সত্যসঙ্কল্প, সত্যসাধনলভ্য, ত্রিকালসত্য, পঞ্চভূতের উৎপত্তিকারণ, অন্তর্যামী ও পরমার্থতত্ত্ব, সত্যবাক্য ও সমদর্শনের প্রবর্তক, সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রপন্ন হলাম।" সুতরাং 'সত্যং পরং' বলতে 'সত্য' শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং 'পর' শব্দটি তিনিই যে পরব্রহ্ম তার স্মারক।

তা'ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর প্রিয়ভক্ত শ্রীউদ্ধবের প্রতি তিনিই যে নিখিল শ্রুতি-শাস্ত্রের চরমতাৎপর্য তা' সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥"

শ্রুতিসকল কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যদ্বারা কার বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা কার অভিধান করে, জ্ঞানকাণ্ডে কাকে অনুবাদ করে বিকল্প অর্থাৎ তর্ক-বিতর্ক করে এসকল রহস্য আমি ভিন্ন কেউই জানে না। বস্তুতঃ শ্রুতিসকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করে, মন্ত্রবাক্যে আমারই অভিধান করে, আমাকেই তর্কের বিষয় ক'রে দ্বিতীয় বস্তু নিরাসপূর্বক শেষে আমাকেই স্থাপন করে। আমিই নিখিল বেদের তাৎপর্য। বেদ আমাকে আশ্রয় ক'রে মায়াময় জগতের নিষেধ পূর্বক পরমার্থভূত আমাতেই সব অনু-

স্মৃত বলে নিবৃত্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এইবাক্যে বুঝতে পারা যায় যে, তিনিই নিখিল বেদের চরম প্রতিপাদ্য। এজন্য শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি স্পষ্টই বলেছেন—"কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ" "এষ ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ" ইত্যাদি।

## শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতমুনি বলেছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ( ১।৩।২৮ ) 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দটি শ্রীমদ্ভাগবতের নিজস্ব। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করেই এই শব্দের প্রয়োগ। অন্য কোন শাস্ত্রে অন্য কোন স্বরূপের উদ্দেশ্যে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয় নাই। আচার্যপাদগণ বলেন, এটি ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতিজ্ঞা বাক্য। এই বাক্যকে অবলম্বন করেই মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পারম্য বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অবতার প্রকরণে 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তৃতীয়াধ্যায়টি 'জন্মগুহ্যাধ্যায়' নামে খ্যাত। উক্ত অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির রহস্যটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনার প্রকার হচ্ছে এই—"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥" ( ভাঃ ১।৩।১ ) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা পুনরায় লোকসমূহ সৃষ্টির ইচ্ছায় ষোড়শকলাত্মক দিব্য পুরুষমূর্তি ধারণ করলেন। এই পুরুষমূর্তি প্রাকৃতগুণময় নয়, এটি 'বিশুদ্ধ-

সত্ত্বমূর্জ্জিতম্' অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বময় এবং স্বপ্রকাশ। এই পুরুষ-মূর্তিকে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ বলা হয়। তাঁকে দ্বার করে দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী এবং তাঁকে দ্বার করে বিশ্বে নিখিল অবতারের আবির্ভাব হয়ে থাকে। এজন্য এই দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদশায়ী নারায়ণকে অবতারের বীজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সমস্ত অবতার কে কে, এই প্রসঙ্গে অবতারের নাম করতে করতে সনকাদির থেকে আরম্ভ করে বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ, কপিলাদি ক্রমে ঊনবিংশ ও বিংশতি সংখ্যায় এসে বলেছেন, "একোনবিংশে-বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্।" অর্থাৎ "ঊনবিংশ এবং বিংশতি সংখ্যাতে বৃষ্ণিবংশে বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীভগবান্ পৃথিবীর ভার অপহরণ করলেন।" এই অংশটি পাঠ করলে প্রথমতঃ মনে হবে, শ্রীসূতমুনি যখন ঐ সমস্ত অবতারের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের নামটিও উল্লেখ করেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ঐ সমস্ত অবতারেরই একতম অবতার। কারণ প্রকরণটি অবতারেরই প্রকরণ। এই প্রকরণে যখন শ্রীকৃষ্ণের নাম উক্ত হয়েছে, তখন তাঁকে ও অবতার বলাই উচিৎ। এরূপ ধারণা যে নিতান্ত অসঙ্গত ও ভ্রান্তি মূলক, এখানে তাই প্রদর্শিত হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রসঙ্গক্রমে অবতার প্রকরণে পঠিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ পুরুষের অবতার নন, তিনি মূল অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। এবিষয়ে

তাঁদের যুক্তি হচ্ছে "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ" এইশ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত 'ভগবান্' শব্দটির উপক্রম করেছেন এবং "রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্বয়ম্" এইশ্লোকে 'ভগবান্' শব্দটির উপসংহার করেছেন। তাতে শ্রীভগবান্ হতে পুরুষমূর্তির আবির্ভাব এবং পুরুষমূর্তির থেকে অবতার সকলের আবির্ভাব এই প্রকারটি ব্যক্ত হয়েছে। ভাগবত একের পর এক যেসব অবতারের নামোল্লেখ করেছেন, কোথাও 'ভগবান্' শব্দটির প্রয়োগ করেন নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা বলার পরেই "ভগবান্" শব্দের উল্লেখ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এরূপ পদ-প্রয়োগের ভঙ্গী দেখে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়, ভগবান্ বেদব্যাস অন্য কোন অবতারকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বা মূলস্বরূপ বলতে প্রস্তুত নন। পরন্তু ঐ সমস্ত পুরুষের অবতার, পুরুষ শ্রীভগবানের অবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এটিই তাঁর হৃদয়ের নিগূঢ় অভিপ্রায়। উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা করলে এরূপ অর্থই পাওয়া যায়। উপক্রম উপসংহারের একবাক্যতা ষড়্‌বিধ তাৎপর্য লিঙ্গের অন্যতম। যে তাৎপর্যলিঙ্গ দ্বারা গ্রন্থ তাৎপর্য নির্ণীত হয়ে থাকে। বেদান্তদর্শনের এই বিচার পদ্ধতিকে অবলম্বন করে অভিপ্রেতার্থের অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারা যাবে যে মূলস্বরূপ বিশ্বসৃষ্টির প্রথমে পুরুষরূপ গ্রহণ করেছিলেন এবং যার থেকে নিখিল অবতারের আবির্ভাব হয়েছিল—তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপর কেউ নন।

এই সিদ্ধান্তে যাতে কারও মনে কোনরূপ সংশয় না থাকে, এই নিমিত্তই সূতমুনি পুনরায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" "হে ঋষিগণ ! ইতিপূর্বে যে সব অবতারের কথা আপনাদের নিকট বলেছি, তাঁদের কেউ সেই পুরুষের অংশ, কেউ কলা ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।" সর্বশক্তি পরিপূর্ণ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন তিনি অবতারী, তিনি অংশ নন অংশী, কলা নন কলানিধি, পুরুষ নন পুরুষোত্তম, ভগবান্ নন—স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার প্রতিপাদক এইশ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্লোকের মুকুটমণি। ভগবান্ বেদব্যাস এই শ্লোকটিকে প্রতিজ্ঞা বাক্যরূপে প্রয়োগ করেছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি শ্রীভাগবতের মহানুভব ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকটির সাহায্যেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে পরমতত্ত্ব রূপে স্বীকার করে শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের মতে এইশ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের মৌলিকতত্ত্বের পরিভাষা। "অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা" অর্থাৎ যে ভাষা বা বাক্য অনিয়মিতভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহকে কোন নিয়মে শৃঙ্খলিত করে, তারই নাম পরিভাষা। পরিভাষা শাস্ত্রে একবার মাত্রই পঠিত হয়, আবৃত্তি হয় না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই শ্লোকটিও সমগ্র ভাগবতে একবার মাত্রই পঠিত হয়েছে। স্বসিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করতে এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। মহারাজ চক্রবর্তীর ন্যায় এই মহাবাক্যের স্বাধীন বিজয়-পতাকা ভাগবতের সকল বাক্যের

মস্তকোপরি সগৌরবে উড্ডীয়মান! এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "কৃষ্ণস্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ আবিষ্কৃত-সর্ব্বশক্তিত্বাৎ" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কারণ তাঁতে সর্বদা সর্বশক্তির আবির্ভাব বিদ্যমান। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলেন, "অনেন তস্য মূলাবতারিত্বং সিধ্যতি।" অর্থাৎ 'স্বয়ং ভগবান্' এই শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে মূল অবতারী, তাই সুসিদ্ধ হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করতে হলে এই শ্লোকটিকে উত্তমরূপে বিচার করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে, কেনই বা ভগবান্ বেদব্যাস একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বলে নির্দেশ করেছেন। আর কেনই বা তিনি "স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ" এই ভাবে পদপ্রয়োগ না করে "কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্" এরূপ পদপ্রয়োগ করেছেন। শাব্দিকগণ বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্লোকে 'কৃষ্ণ' পদটি উদ্দেশ্য এবং 'স্বয়ং ভগবান্' পদটি বিধেয়। "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" 'অনুবাদ বা উদ্দেশ্যকে না বলে বিধেয়কে বলবে না' এই নিয়মানুসারে শ্লোকে 'কৃষ্ণ' শব্দটির পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, পশ্চাৎ তার গুণরূপে "স্বয়ং ভগবত্তা" এই পদটি তাতে বিহিত হয়েছে। এতে ফল হয়েছে এইযে, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা, স্বয়ং ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ নন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ থাকলেই স্বয়ং ভগবত্তা থাকবে, স্বয়ং ভগবত্তা তাঁরই অসাধারণ ধর্ম। স্বয়ং ভগবান্ বলে অন্য কোন তত্ত্ব আছে তাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে, এরূপ নয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই বিষয়টি

সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যথা—

"সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥
তবে সূতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অবতংস ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ॥
তারে কহে—কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥
'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥

তৈছে ইহা অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
'এতে' শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয় সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥
'কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ্য-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
বিরুদ্ধার্থ কর তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ ॥,
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥

× × × × × × × × ×

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥"

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ এবং অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ কেউ তাঁর অংশ, কেউ তাঁর কলা, একথা শুধু শ্রীমদ্ভাগবতেই নয়, শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র হতেও তা জানা যায়। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা প্রথমেই "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । অনাদি-রাদি গোঁবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পর-মেশ্বর ও সর্বকারণের কারণরূপে প্রতিপাদন করে পরে বলেছেন—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

"যে পরমপুরুষ রামাদি মূর্তিসমূহে নিয়মিত শক্তির অভি-ব্যক্তি করে প্রপঞ্চে বিবিধ অবতার প্রকাশ করেছেন এবং যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ—আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের ভজন করি।"

এই সমস্ত সুসিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কেউ কেউ আপত্তি করেন যে, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, এরূপ অর্থ প্রতীত হলেও শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় তা নয়। কারণ তাহলে পূর্বে অবতার-পর্যায়ে তাঁর নাম কখনও পঠিত হত না। অবতার প্রকরণে রামাদি অন্যান্য অবতারের সহিত তিনি অবতার

রূপেই কীর্তিত হয়েছেন। বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবানের বিশ্বে অবতরণের কোন কারণ নেই, যেহেতু দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালনাদি কার্য শ্রীভগবানের অবতারগণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বয়ং ভগবানের স্বীয় আনন্দনিকেতন চিন্ময় ধাম থেকে এই জড়জগতে আবির্ভাবের কোনই কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং অবতার রূপে উক্ত বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উক্তশ্লোকস্থ 'কৃষ্ণ' শব্দের বাচ্য নন, পরন্তু ভগবান্ শ্রীনারায়ণই ঐ কৃষ্ণ শব্দের লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে 'কৃষ্ণ' শব্দে নারায়ণকে বিষয় করা হয়েছে। অতএব পরব্যোমাধিপতি শ্রীমন্নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, সৃষ্টির আদিতে তিনিই প্রথম কারণার্ণবে পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন এবং উক্ত পুরুষ থেকেই নিখিল অবতারের আবির্ভাব ঘটে—এটিই শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অধ্যায়ের তাৎপর্যলব্ধ অর্থ।

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থাপনে মীমাংসা দর্শনের বিচার পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করে বাদীপক্ষের উল্লিখিত প্রকার আপত্তি খণ্ডন করেছেন যথা—"ন চাবতারপ্রকরণেঽপি পঠিত ইতি সংশয়ঃ, পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্য প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ। যথাগ্নিষ্টোমে যদ্যুদগাতা বিচ্ছিন্দ্যাদদক্ষিণেন যজেত যদি প্রতিহর্ত্তা সর্ব্বস্বদক্ষিণেনেতি শ্রুতেঃ। তয়োশ্চ কদাচিদ্দ্বয়োরপি বিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধয়োঃ প্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে চ পরমেব প্রায়শ্চিত্তং সিদ্ধান্তিতং তদ্বদিহাপি ইতি। অথবা কৃষ্ণস্ত্বিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধাৎ।" একথার তাৎপর্য—

অবতার প্রকরণে পঠিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তায় বাধা উপস্থিত হচ্ছে এরূপ সংশয় করা উচিত নয়। মীমাংসাশাস্ত্রে একটি সূত্র দেখা যায় "পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" যদি কখনও শাস্ত্রের পূর্ববিধি ও পরবিধির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে পূর্ববিধির দুর্বলতা প্রযুক্ত পরবিধির দ্বারা তা বাধিত হয়ে যাবে। তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—"প্রকৃতিবৎ" অর্থাৎ প্রাকৃত যেন বৈকৃতের দ্বারা বাধিত হয় তদ্রূপ। প্রাকৃতকে বাধিত না করে কখনও বৈকৃত উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পরভবিক বিকৃতি যেমন প্রবল তদ্রূপ পূর্ববিজ্ঞান ও পর-বিজ্ঞানের মধ্যেও পরবিজ্ঞানই প্রবল। "পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পর-বিধির্বলবান্" এই ন্যায়টিও ঐ সিদ্ধান্তকেই পুষ্ট করে।

অপর একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টিকে অধিকতর সুখবোধ্য করা হচ্ছে। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে একটি নিয়ম আছে, যাগসমাপ্তি কালে উদ্গাতা (ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক্) ও প্রতিহর্তা (সামবেদীয় ঋত্বিক্) পরস্পরের পরিহিত বসনের পশ্চাদ্ভাগের বস্ত্রান্ত (কাছা) ধারণপূর্বক যজ্ঞবেদীকে পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা কালে যদি কোনরূপে উদ্গাতা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হন, তবে তার প্রায়-শ্চিত্ত জন্য কিছু দক্ষিণা না দিয়ে পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়। আর প্রতিহর্তা বিচ্ছিন্ন হলে সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যদি দৈবাৎ উদ্গাতা ও প্রতিহর্তা এক-কালে উভয়েই বিচ্ছিন্ন হন, তখন কি প্রায়শ্চিত্ত হবে ? কারণ

অদক্ষিণ ও সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ একসঙ্গে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব! এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি বলেন, এই প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ের বিরুদ্ধ সমবায়ে পূর্ববিধিকে বাধিত করে পরবিধিই বলবান্ হবে। অর্থাৎ সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞেরই বিধান হবে। তদ্রূপ পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব এবং পরে স্বয়ং ভগবত্তা বিহিত হওয়ায় পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধের সমুচ্চয় অসম্ভব বলে পরবিধি স্বয়ং ভগবত্তা পক্ষই বলবান্ হবে এতে সংশয় নেই।

যদি এতেও কারও কোনরূপ সংশয়ের অবশেষ থাকে, শ্রীল গোস্বামিপাদ তা আরও পরিষ্কার করার জন্য মীমাংসা শাস্ত্রের অপর একটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ-স্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এদের সমবায়স্থলে অর্থবিপ্র-কর্ষহেতু যথাক্রমে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পরের দৌর্বল্য বুঝতে হবে। শ্রুতি সর্বাপেক্ষা বলবতী। প্রকরণের সামর্থ্য তা থেকে অতি দুর্বল। বিরোধস্থলে শ্রুতি দ্বারা প্রকরণ বাধিত হবে— "শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধাৎ।" আবার "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এখানে 'তু' কারের অর্থ 'অবধারণ'। সুতরাং এটি সাবধারণী শ্রুতি। 'সাবধারণী শ্রুতির্বলবতীতি ন্যায়াৎ" সাবধারণী শ্রুতি অন্য শ্রুতি অপেক্ষাও বলবতী এই ন্যায়ানুসারে পদ্মপুরাণাদিতে প্রতিপাদিত মূল নারায়ণের স্বয়ং ভগবত্তা অপেক্ষা মহাপুরাণ শ্রী-মদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা

মুখ্যতর হয়ে উঠে এবং মূল নারায়ণের স্বয়ং ভগবত্তা আপেক্ষিক ও গুণীভূত হয়ে পড়ে।

বাদীপক্ষ যে বলেছেন, স্বয়ং ভগবানের বিশ্বে অবতরণের কোনই কারণ নেই, যেহেতু দুষ্টদমন, শিষ্টপালনাদি কার্য অবতারগণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে ? এর উত্তরে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলেন—"ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনাত্ত্ব স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদি লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়েবেত্যায়াতম্।"

এর তাৎপর্য এইযে, শ্রীকৃষ্ণকে অবতার মধ্যে গণনা করা হলেও তিনি অন্যান্য অবতারের ন্যায় ভূভারহরণাদি কার্যানুরোধে আবির্ভূত হন নি। ভূভারহরণাদি কার্য পুরুষের অবতার সকলের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে যে শ্রীকৃষ্ণ ভারহরণ করেছেন একথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য এই—স্বয়ং ভগবানের অবতরণকালে তাঁর অংশাবতারগণও তাঁতে প্রবিষ্ট থাকেন। তাঁদের দ্বারাই ভূভারহরণাদি কার্য হয়, স্বয়ং ভগবানে ইহা আরোপিত হয় মাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল।
ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ, অর্থাৎ স্বীয় নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যভিচার না ঘটায়ে নিজ পরিজনবৃন্দের আনন্দ-বিশেষাত্মক চমৎকারিত্ব সম্পাদন করার জন্য নিজ জন্মাদিলীলা বা ক্রমলীলাদ্বারা কোন অনির্বচনীয় মাধুর্য পোষণ করে (যা নিত্য-লীলা থেকেও অতীব চমৎকারিত্বপূর্ণ এবং সাতিশয় মাধুর্যপূর্ণ) কখনও কখনও লোকলোচনের গোচরীভূত হয়ে থাকেন, এটিই তাঁর বিশ্বে অবতরণের হেতু। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয়েও প্রাপঞ্চিক লোকমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিশেষ প্রকাশ করে থাকেন—শ্রীল সূতমুনি এই রহস্যটি প্রকাশ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে অবতারগণমধ্যে উল্লেখ করেছেন, তিনি অংশাবতার এটি প্রতিপাদন করার জন্য নয়। বস্তুতঃ তিনি সর্বাবতারী সর্বমূল স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপ বলে আবির্ভাবকালে তাঁর কারও অপেক্ষা নেই। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষ স্বরূপকেই

'স্বয়ংরূপ' বলা হয়। "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।" যে রূপটি অন্যের কোন অপেক্ষা না রেখে স্বয়ংসিদ্ধরূপে নিত্যধামে নিত্যবর্তমান, প্রপঞ্চে অবতরণকালেও সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রকট অপ্রকট উভয়লীলাতেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেই রূপটিই শাস্ত্রে 'স্বয়ংরূপ' বলে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণরূপটিই অনন্যসিদ্ধ স্বয়ংরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত "লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্" বলে সেই রূপেরই বর্ণনা করেছেন।

"সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভবসত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" "স্বয়মেব হরিঃ" এইরূপ তিনবার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে 'স্বয়ং' শব্দের উল্লেখ করে শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, একথা ত্রিসত্যের ন্যায় দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেছেন। মূল নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা অভিন্ন-তত্ত্ব হলেও রসতত্ত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ সর্ববাদীসম্মত—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

মূল নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রেষ্ঠত্ব "কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ" এই শ্রুতিবাক্যে, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ" এই গীতাবাক্যে, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদা-

নন্দবিগ্রহঃ" এই ব্রহ্মসংহিতা বাক্যে এবং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" "গূঢ়ং পরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গম্" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যে প্রতিপাদিত হয়েছে।

## রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষত্ব।

"রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিবাক্যে রস শ্রীভগবানের স্বরূপ একথা জ্ঞাত হওয়া যায়। রস শ্রীভগবানের স্বরূপ হলেও কোনও কোনও অবতারে কোনও কোনও রসের বিকাশ দেখা যায়। কোনও অবতারেই একাধারে সবরসের বিকাশ দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি তাঁতে সকল রসই সম্যক্‌রূপে সুবিকশিত। তার কারণ তাঁতে রসপোষক কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, যেগুলি তাঁরই নিজস্ব সম্পদ্ অপর কোন ভগবৎস্বরূপে উহা দৃষ্ট হয় না। মহাজনগণ এগুলিকেই শ্রীকৃষ্ণের 'মাধুর্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন। মাধুর্য-মূরতি শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত—তাঁর মাধুর্যও অনন্ত, তবু শ্রীল গোস্বামিপাদগণ তাকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন—

"লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৪৩)

লীলামাধুরী, প্রিয়জনের প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী—এই মাধুর্য চতুষ্টয় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেই অসাধারণ, এ আর অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ যে

ভাবে এই মাধুর্য চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তদনুরূপ কিঞ্চিৎ বিবৃতি দিতেছি । "সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ।" শ্রীভগবান্ রসময় তাই লীলাময় । লীলাতেই তাঁর রসরূপতার অভিব্যক্তি । লীলা স্বভাবতঃই মধুময়ী - চমৎকারিতায় পূর্ণ, সর্বোপরি ব্রজলীলার মাধুর্যের তুলনা নেই । ব্রজে তিনি অত্যদ্ভুত লীলারসের কল্লোলিত সিন্ধু !

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥" ( চৈঃ চঃ )

ব্রজের নরবৎলীলা সর্বোত্তম । কারণ কেবল ভগবদ্ভাবের লীলায় লীলার মাধুর্য ভালভাবে ফুটে উঠে না, সম্ভ্রম-সঙ্কোচের উদয় হয় । আবার কেবল নরভাবের লীলায় গাম্ভীর্য থাকে না, প্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় । যেখানে ঐশীভাব ও নরভাব পাশাপাশি আপনাপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়ে বিবিধ বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে চালিত হয়, সেখানেই লীলার চমৎকারিত্ব। তত্ত্ববাদিনী শ্রুতিগণ যে ভাবে শ্রীভগবানকে চিত্রিত করেন, লীলাশক্তি তার উপরে করেন বিচিত্র রঙের সমাবেশ ! শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি সমস্ত বিরুদ্ধধর্মের সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করে থাকেন । শ্রুতিতে যিনি আত্মারাম, আপ্তকাম, অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণস্বরূপ—লীলাক্ষেত্রে তিনি ক্ষুধিত-পিপাসিত,

নরাকৃতি, ভক্তগণের প্রেমাস্বাদন লালুপ। অচিন্ত্যশক্তি সমাধান না করলে সর্বজ্ঞের মুগ্ধতা, অনন্তের পরিচ্ছিন্নতা, সর্বশক্তিমানের ভীরুতা, আত্মারামের রমণস্পৃহা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদিও তত্ত্বের ভিত্তিতেই লীলারসের প্রতিষ্ঠা, তবুও তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও লীলারস উভয়কে পৃথক দৃষ্টিতে বিচার করে আস্বাদন করতে হবে। তত্ত্বে শ্রীভগবানের কোন ইচ্ছাই নাই, তিনি নির্বিকার : লীলাতে তিনি রসের পিপাসু। এই রসপিপাসা নিবৃত্তির জন্যই তিনি লীলাময়-লীলাপুরুষোত্তম। এইজন্যই সেই সর্বময় সর্বব্যাপক শ্রীহরি লীলাক্ষেত্রে মাতা যশোমতীর রজ্জুদামে আবদ্ধ। সেই সর্ববন্দনীয় চরণ শ্রীভগবান্ পিতা শ্রীনন্দমহারাজের পাদুকাযুগল মস্তকে বহন করে কৃতার্থ। সেই সর্বশক্তিমান্ শ্রীদামের সঙ্গে খেলায় পরাজিত হয়ে তাঁকে স্বন্ধে বহন করে ধন্য। সেই সর্বারাধ্যতত্ত্ব শ্রীহরি মানময়ী শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জের দ্বারে গললগ্নীকৃতবাসে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলে শ্রীমতির শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণ করে আনন্দরসমগ্ন !! লীলাশক্তি যে কিভাবে শ্রীভগবানকে দারুযন্ত্রের মতো রসস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, একথা ভাবলেও আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। কিসে ? মায়ায় না লীলায় ? যেখানে ভগবান্ সেখানে মায়া নেই "কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া ঘোর অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥" (চৈঃ চঃ) লীলায় ভগবান্ মুগ্ধ। সর্বোপরি সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার সমুজ্জ্বল রসে ভগবান্ আত্মহারা !

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যদিও আমার গোপাললীলা সবই মনোহর, তথাপি রাসলীলার কথা মনে পড়লে আমার প্রাণ যে কেমন করে উঠে ; তা আমি নিজেই বলতে পারি না।" আনন্দময় শ্রীভগবানের অন্তরে উল্লাসাতিশয্যই এই আত্মবিস্মৃতির হেতু! শ্রুতি বলেন, শ্রীভগবান্ পূর্ণস্বরূপ। পূর্ণস্বরূপে হ্রাস-বৃদ্ধি থাকিতে পারে না। তা হলে উল্লাসাতিশয় কিরূপে সম্ভবপর হতে পারে? লীলাতে এরূপ সংশয় করা চলে না। কারণ উল্লাসাতিশয্যই লীলার স্বভাব। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃই বর্ণিত রয়েছে—

"তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৬)

'শ্রীরাসমণ্ডলে ব্রজগোপিকাগণমধ্যে ভগবান্ দেবকীসুত অর্থাৎ যশোদানন্দন (যশোদারও একটি নাম দেবকী) স্বর্ণকান্তমণিগণমধ্যে মহামরকতমণির ন্যায় নিরতিশয় শোভা ধারণ করেছিলেন।' দেশ কাল পাত্রের কি অপূর্ব মনোহর সন্নিবেশ! আনন্দময় বৃন্দাবনধাম, চারদিকে রূপের পাথার। পূর্ণিমার নিশি। আকাশে অখণ্ড চাঁদের আলো। তার স্নিগ্ধ কিরণকণাসমূহ আকাশের গা' বেয়ে অবিরাম ঝরে ঝরে পড়ছে। প্রকৃতির মুখে

যেন হাসি আর ধরে না। মৃদুল মলয় হিল্লোল মল্লিকা মালতীর বুকে শিহরণ দিতে দিতে নেচে নেচে চলেছে। বনভূমি ভরপুর ফুলের গন্ধে। জাতী, যূথি, মল্লিকা, মালতী মনের আবেগে কুঞ্জে কুঞ্জে লুটিয়ে পড়ছে। ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুধ্বনি, ময়ূরের নৃত্য! নীল যমুনার বুকে ফুটেছে কুমুদ, কমল, কহ্লার! তাদের বক্ষপুটে ভৃঙ্গকুলের মধুর রসবিলাস! যমুনার কালো জলে চাঁদের ঝিকিমিকি খেলা! যমুনা যেন আজ এই রাসোৎসবে সোনার জরী দেওয়া নীলশাড়ী পরে অভিসারিকা নায়িকার ন্যায় তরঙ্গ-ভঙ্গে নেচে নেচে রাসনায়িকাগণ সঙ্গে রাসবিহারীর মধুর রাস-লীলার বার্তা নিজপতি সমুদ্রের নিকট ঘোষণার উৎকণ্ঠায় ত্বরান্বিতা হয়ে ছুটে চলেছেন। সেই নীল যমুনার শ্যামলতটে সুমধুর রাস-বিলাস!! মণ্ডলে বিচরণশীলা অগণিত মহাভাবের ছবি রাস-নায়িকাগণের সঙ্গে রসরাজ শ্যামসুন্দরের মণ্ডলাকারে নৃত্য। দুই দুই গোপিকার মধ্যে এক এক কৃষ্ণ! অপরূপ ছটায় সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত!! কত তান, কত মান, কত কত সুর, কত কত রাগরাগিণী!! কি চমৎকার শোভা! বিশ্বমনোলোভা সেই মাধুরী!! চারদিকে নূপুরের সুরসাল রুনু রুনু শব্দ, কিঙ্কি-ণীর কিনি কিনি ধ্বনি। তার মাঝে রবাব মুরজ মুরলীর তান! মোহন যুবরাজ মোহন মালা গলায় পরে পরমাসুন্দরী উৎ-ফুল্লা আভীরী নাগরীগণ সঙ্গে নৃত্যরসে মগ্ন!! শ্রীপাদ শুকমুনি এই বৃন্দাবনেই এই সুমধুর রাসলীলার সন্নিবেশ করেছেন। অন্যত্র

কোন ধামে কোন স্বরূপে এই লীলা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই কোন না কোন মহাপুরুষের অনুভবের মধ্যে তা ধরা পড়ত! অথবা শাস্ত্রেও বর্ণিত থাকত। নেই বলেই লীলামাধুর্যে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ—অতুলনীয়।

পার্ষদগণের প্রেমমাধুরীর বর্ণনায় শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বলেছেন—"অতুলমধুর-প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ" ব্রজধামের প্রিয় পার্ষদবর্গ অতুলনীয় প্রেমমাধুর্য-মণ্ডিত। ব্রজের প্রেম যেমনি নিষ্কাম ও নির্মল, তেমনি ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য বিশুদ্ধমাধুর্যময়। ঐশ্বর্যজ্ঞানজনিত সম্ভ্রম সঙ্কোচ যেখানে যত বেশী, প্রেমের উল্লাসও সেখানে তত কম। প্রেম নিঃসঙ্কোচকে বুকে করে রাখতে চায়, সঙ্কোচ এলেই যেন প্রেমের বুক ভেঙ্গে যায়। সুতরাং ভগবানকে যদি কখনও একান্ত আপনার করে পেতে হয়, তাহলে যেখানে প্রেমের নিবিড় বাঁধন, সেখানেই তাঁকে বাঁধতে হবে; এমন-ভাবে বাঁধতে হবে, যাতে সে বাঁধন কখনও কিঞ্চিন্মাত্রও শিথিল না হয়। ব্রজপ্রেমের মাঝে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই মাধুর্যস্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পরস্পর পরস্পরকে অন্তরতমভাবে জড়িয়ে ধরেন – এটিই ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য! সেখানে ছোট বড় ভাব নেই, উচ্চ-নীচ ভেদ নেই, প্রেম সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রেমের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ ও আশ্রয়ালম্বন ব্রজপ্রেমিকগণের হৃদয়কে যেন একটি ছাঁচে ঢালাই করে দিয়েছে! প্রেমমন্দাকিনী সেখানে শতমুখী হয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুল্‌তে তুল্‌তে অসীমের দিকে ছুটে

চলেছে ! এই প্রেমমাধুর্যেই মাতা যশোমতী সন্তানজ্ঞানে শ্রী-ভগবানকে লালন, পালন, তাড়ন, ভৎ'সনাদি করেছেন। সখাগণ তাঁকে এঁঠো ফল খাইয়েছেন। গোপীগণ মানে অভিমানে তাঁকে কত শত তিরস্কার করেছেন। এতেই যে তাঁর পরমসুখ। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করেন লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥" (চৈঃ চঃ)

সর্বোপরি শ্রীশ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রেমমাধুরী, যার কুত্রাপি তুলনা নেই। উভয়েই প্রেমের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে-ছেন। দিনের পর দিন কত প্রেমবৈচিত্র্য—কত শত রসবিলাস ! বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরায় এই রসবিলাসের কথা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেন নি। এজিনিষ মুনি-ঋষিগণের ধ্যান-ধারণার অগোচর। এ কেবল স্বয়ং ভগবানেরই নিজস্ব ভাবনা। নিত্য-নূতন রসভাবনা তাঁর মনে। মনেরও শেষ নেই—ভাবনারও অন্ত নেই। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ এক দিনের কথা লিখেছেন—

"সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-নিনদং কংসদ্বিষো কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচন-লোলশঙ্খবলয়ক্কানং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়ং ইতি প্রগল্‌ভ-জরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণ-কোন-কোলী-বিটপী-ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥"

( উঃ নীঃ )

সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের নিশীথ রাত্রি। চারদিক্ নিস্তব্ধ। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। ভালভাবে পথ চেনা যায় না। এমন সময় এক তরুণ কিশোর যাবটের পথ ধরে ধীরে ধীরে অভিমন্যুর গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। সম্মুখে একটি বৃহৎ কোলিবৃক্ষ। তার ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রাবলীর নিম্নদেশ বেশ অন্ধকার। দূর হতে কিছু দেখা যায় না। আগন্তুক অতি সন্তর্পণে পা বাড়াতে বাড়াতে চুপি চুপি চোরের মতো সেখানে এসে দাঁড়ালেন। গৃহবাসিগণ মনে হয় কেউ জেগে নেই! এত রাত্রে আর কে জেগে থাকবে। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তরুণ একবার চারদিকে চেয়ে নিলেন। বুঝতে পারলেন, সত্যই কেউ জেগে নেই। সময় বুঝে একটি সঙ্কেত করলেন "কুহু কুহু।" একটি সুন্দরী তরুণী পূর্ব্বের থেকেই এই সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করছিলেন। যেমনি তিনি দ্বারমোচন করে বাইরে আসতে চাইলেন, তাঁর হাতের চুড়িগুলি ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ করল—'ঝুন্ ঝুন্'। পাশ্বের ঘরে তাঁর শ্বশ্রূমাতা বৃদ্ধার চোখে নিদ্রা নেই। দুশ্চিন্তা তাঁকে জাগিয়ে রেখেছে। তাঁর নবীনা বধূর রূপের অন্ত নেই।

নন্দনন্দনও লম্পট। গোপবধূগণের প্রতি তার বড় লোভ। কি জানি কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে। তাই মায়ে ঝিয়ে দিবারাত্র বধূকে পাহারা দেয়। কাজেই কঙ্কণের শব্দ শুনে বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠল—'কেও কেও? কে শব্দ করে বউমা' তরুণীর বুক কেঁপে উঠল। নীরবে দ্বারবন্ধ করে অন্তরালে দাঁড়ালেন। ওদিকে তরুণও বৃদ্ধার ভীষণ কণ্ঠস্বর শুনে শঙ্কিত হৃদয়ে অন্ধকারে কোলিবৃক্ষের অন্তরালে আত্মসঙ্গোপন করলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল—কোথাও কোন সাড়া নেই। তামসী নিশার নীরব গম্ভীরভাব দেখে মনে হল, এখন নিশ্চয়ই আর কেউ জেগে নেই। তাই আবার 'কুহু কুহু' সঙ্কেত হল। প্রিয়াজী আবার দ্বার উন্মোচন করলেন। কিন্তু হায়! তখনও বৃদ্ধার কণ্ঠ গর্জে উঠল 'কে কে দ্বার খোলে?' অমনি দুটি ব্যাকুল হৃদয় সভয়ে যথাস্থানে পিছিয়ে গেল। এমনি করে সারারাত ধরে 'কুহু কুহু' শব্দ, দ্বারোন্মোচন এবং তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার তর্জন গর্জন! এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হল। পূর্বাশায় অরুণালোক ফুটে উঠল। ভগ্নহৃদয় বিরহ-বিধুর তরুণ নন্দগ্রামের অভিমুখে ফিরে গেলেন। ভাবুক ভক্তবৃন্দ! আপনারা নিশ্চয়ই তরুণটিকে চিনতে পেরেছেন ইনিই সেই বেদান্তের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "রসো বৈ সঃ" ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" ইনিই শ্রীগীতার "লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

স্বয়ম্"। আর তরুণীটি পদ্মপুরাণের "বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" ব্রহ্মসংহিতার "শ্রিয়ঃকান্তা" নারদপঞ্চরাত্রের "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা" শ্রীমদ্ভাগবতের "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ!" সচ্চিদানন্দসিন্ধুর বুকে এতখানি কামনারতরঙ্গ জাগাতে আর কোন ব্রজপার্ষদই পারেন নাই তাই প্রেমমাধুর্যে শ্রীরাধারাণীই সবশ্রেষ্ঠা। এঁরাই রসরাজ ও মহাভাব। রসেরও অন্ত নেই, ভাবেরও শেষ নেই। এই মদনমোহন ও মদনমোহন-মনমোহিনীর ন্যায় প্রেমমাধুরী ভগবৎরাজ্যে আর কুত্রাপি নেই।

বেণুমাধুর্যের বর্ণনায় শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের লেখনি "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ" শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর মধুরাস্ফুটধ্বনি ত্রিজগতের জনমনাকর্ষি। তাঁর এই গুণে ভুবন পাগল। পাগল করা বাঁশী কেবল বৃন্দাবনেই বাজে। "মধুর মধুর বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন।" "শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে" সেই সুর, সেই ধ্বনি, সেই স্বরালাপ ভগবৎরাজ্যের এক মহামাধুর্যবৈভব। সেই মাধুর্যবৈভবে সমস্তই মধুময় হয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন —"অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্" বাঁশীর সুরে সচল অচল হয়, তরুলতা পুলকিত হয়। নিখিল স্থাবর জঙ্গমকে বিপরীত ধর্ম প্রাপ্ত করায় এই স্বরলহরী। বাঁশির এই বিস্মাতানো সুর চতুর্দশ ভুবনকেই বিস্মিত ও অভিভূত করে।

"রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।

উৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥"

"মেঘের গতিরোধ, গন্ধর্বরাজ তুম্বুরুর চিত্তে চমৎকারিত্ব সম্পাদন, সনন্দনাদির সমাধিভঙ্গ, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, বলিরাজের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির সহিত চাঞ্চল্য সম্পাদন, নাগরাজের মস্তক ঘূর্ণন এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ভিত্তি ভেদপূর্বক বংশীধ্বনি ত্রিভুবনে ভ্রমণ করেছিল।" শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন—"অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ" ত্রয়ীমূর্তির ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ বেদমাতা গায়ত্রীর কথা বলেছেন। গায়ত্রী-মন্ত্রই মুরলীর সুরে সুরে ত্রিভুবনে ধ্বনিত হয় এবং সবার জড়ীয় স্বভাব দূর করে ভগবদ্ভাব জাগিয়ে ব্রজের পথে আকর্ষণ করে। মুরলীর কলকূজনের এই স্বভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

"সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ডভেদী বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কানে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেবা করে আকর্ষণে,
তার আগে কিবা গোপীগণে॥"

গোপীগণের শ্রীমুখবাক্যেই ইহা প্রমাণিত হয়—"কাস্ত্র্যঙ্গ

তে কলপদায়ত-বেণুগীত-সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ?" "হে প্রিয় ! ত্রিভুবনে এমন কোন রমণী আছে যে, মুরলীর ঐ কলধ্বনি শ্রবণ করে বিমোহিতা হয়ে পতিব্রতাধর্ম ত্যাগ করে তোমার চরণে শরণ গ্রহণ না করে ?" গোপীভাবাবিষ্ট শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরের শ্রীমুখে এই শ্লোক শুনে ভাবাবেশে এর অর্থ আস্বাদন করেছেন—

"নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ॥
কৈলে যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥
ধর্ম্ম ছাড়াও বেণুদ্বারে, তান কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকলি ছাড়াও।
এবে আমায় কর রোষ, কহ পতিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হৈয়া ধর্ম্ম শিখাও ॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ,
ছাড়হ এসব কুটিনাটি ॥

× × × × × × × × ×

যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূল্যে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
যে বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তেঁহো সে কাকলি শুনি,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায়॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, লীলাপুরুষোত্তম, বৃন্দাবন তাঁর লীলাভূমি। লীলায় বেণুর দান অপরিসীম। অনির্বচনীয় তার মাধুরী—অচিন্ত্য তার স্বভাব। যে মাধুর্যে ত্রিভুবন বিমত্ত হয়, তাতে ব্রজবাসিগণ যে ভেসে যাবেন, এতে আর আশ্চর্য কি! এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্রেক ঘটায় বেণুর সুর!

"যশোমতী শুনে বাঁশি ননী দে মা নন্দরাণী।
পিতা নন্দ শুনে বাঁশি এই যে বাধা আনি॥
সখাগণ শুনে বাঁশি চল গোষ্ঠে যাই।
কমলিনী শুনিলা বাঁশি বাহির হও রাই॥"

এই মাধুর্য একমাত্র ব্রজধাম ভিন্ন আর কুত্রাপি নেই। বেণু-মাধুরী শ্রীবৃন্দাবনেরই অনন্যসাধারণ সম্পদ্। এই সব গুণেই শ্রী-

বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি মূল নারায়ণ অপেক্ষাও পরম শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী বিষয়ে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তি—"অসমানোর্দ্ধ-রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ" শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-সাধারণ রূপমাধুর্য স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদক। শ্রী-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মাধুর্যেরই মূর্তি। তাঁর রূপমাধুরী অনন্ত, কুত্রাপি তার তুলনা নেই। শ্রীল উদ্ধব মহাশয় বলেছেন—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গম্॥"

( ভাঃ ৩।২।১২ )

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়া-নাম্নী চিচ্ছক্তির প্রভাব দেখাবার জন্য মর্ত্যলীলার উপযোগী বিবিধ আশ্চর্য মাধুর্যাদিপূর্ণ পরম মনোহর দ্বিভুজ মুরলীধারী মূর্তি বিশ্বে প্রকাশ করেছেন। সেই মূর্তি এতই মনোহর যে তাতে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময় জন্মে, তা মহাশ্চর্য সৌন্দর্য পরমাবধিরও নিত্যোৎকর্ষ বিধায়ক এবং তার অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রী-চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের প্রতি উক্তিতে এই শ্লোকের অতি অপূর্ব আস্বাদনী প্রকাশ করেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা,        সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় সর্ব্বভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্যধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ-নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণের মন॥"

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য বর্ণনার মূল উৎস শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের হাতে ধরে মথুরা-নাগরীগণের উক্তির একটি শ্লোক পাঠ করে তারও ব্যাখ্যামাধুরী প্রকাশ করেছেন।

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥" (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)

"তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাঁহা ডুবায় না হয় উদগম ॥
সখি হে ! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী, পিবি-পিবি নেত্রভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥
যে-মাধুরী-উর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেহোঁ সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেই ত মাধুর্য্যসার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তেঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।

আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥

× × × × × × × × ×

সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ রত্নালয়।

আনের বৈভব-সত্ত্বা, কৃষ্ণদত্ত-ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে আকৃষ্টা হয়ে বৈকুণ্ঠেশ্বরী রমা দেবী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভের আশায় ব্রজে তপস্যা করছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। এর থেকে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈকুণ্ঠাধিপতি মহানারায়ণ অপেক্ষা দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী অধিকতর চমকপ্রদ ও রসপ্রদ। পক্ষান্তরে এটিও দেখান যেতে পারে যে, শ্রীনারায়ণের কথা কি, শ্রীকৃষ্ণ নিজেও গোপিকার নিকট চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়ে তাদের ভাবান্তর জন্মাতে পারেন নি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত—

"স্বয়ং ভগবত্তে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥"

এর দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীনারায়ণের সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য অপেক্ষা ন্যূন। নাগপত্নীগণ থেকে আরম্ভ করে শ্রীলক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত, ব্রহ্মাণ্ড হতে আরম্ভ করে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত সর্বচিত্তাকর্ষক বলেই তাঁর নাম 'কৃষ্ণ'। স্বীয় রূপ, গুণ, লীলার অনুরঞ্জিনী শক্তির দ্বারা সর্বচিত্তকে অনুরঞ্জিত করে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করাই তাঁর স্বভাব। তাই মহাজন বলেছেন—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষযোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥" (চৈঃ চঃ)

রাসরজনীতে ব্রজগোপিকাগণ বলেছেন—"ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥" হে প্রিয়! ত্রিভুবনসুন্দর তোমার এই রূপমাধুরী দর্শন করে ধেনুগণ নির্নিমেষ নয়নে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শুকশারি প্রভৃতি বিহঙ্গমকুল শাখি-শাখে বসে মুনির ন্যায় নিমীলিত নেত্রে ঐ রূপের ধ্যান করে। বৃক্ষলতাগুলি অঙ্কুর উদ্গমছলে পুলক ও মধুধারা বর্ষণ ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে। মৃগগুলি আনন্দ-জড় হয়ে চিত্রলেখার ন্যায় অবস্থান করে। অনুরাগিণী গোপিকাগণের নয়নে এই রূপ পরম আশ্চর্যময়। শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর পূর্বানুরাগবতী শ্রীরাধারাণীর উক্তিতে লিখেছেন—

"এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ ।
শুনইতে মানবি স্বপন-স্বরূপ ॥
কমল-যুগল পর চাঁদ কি মাল ।
তা' পর উপজল তরুণ তমাল ॥
তা' পর বেঢ়ল বিজুরী লতা ।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা ॥
শাখা শিখর পর সুধাকর পাঁতি ।
তঁহি নবপল্লব অরুণক ভাঁতি ॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ ।
তা পর কীর থির করু বাস ॥
তা পর চঞ্চল খঞ্জন জোড় ।
তা পর সাপিনী ঝাপল মোর ॥
এ সখি রঙ্গিণি কহল নিশান ।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান ॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ভান ।
সুপুরুষ মরম তুঁহু ভাল জান ॥"

কখনও বা বলেন —

কিরূপ হেরিনু মধুর মূরতি পিরিতি রসের সার ।
হেন মনে লয় এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক যার ॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন চাঁদ ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবনমোহন ফাঁদ ॥

নব জলধর রসে ঢর ঢর বরণ চিকণকালা ।
অঙ্গের ভূষণ রজতকাঞ্চন মণি মুকুতার মালা ॥
জোড়ভুরু যেন কামের কামান কেনা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি বিষম কুসুমবাণ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ব্যতীত আর কোন ভগবৎরূপেরই এইপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় না । রূপানুরাগের উদ্বেল তরঙ্গ যেন সামাজিকের চিত্তকে আপ্লাবিত করে দেয় । এজন্য প্রায় সব মহাকবিই রূপমাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীবৃন্দাবনবিহারীকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন ! তার কারণ এমন অধরবিম্বে মধুর, মন্দহাস্যে মঞ্জুল, অমৃতনাদে শিশির, দৃষ্টিপাতে শীতল এবং বেণুনাদে বিশ্রুত নায়ক আর কুত্রাপি নেই । রূপরসের বৈশিষ্ট্যে, বেশভূষার বৈচিত্র্যে, ভাবভঙ্গীর লালিত্যে—ধীরললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ! কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুরীর মধুচক্র ! ভক্তবৃন্দ ! তাঁর অতি সুরসাল অমরকাব্যে সেই “রসো বৈ সঃ” মন্ত্রের দেবতার রসমাধুরী আস্বাদন করুন—

“রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥
চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্ ।
প্রচুর-পুরন্দর-ধনু-রণুরঞ্জিত মেদুরমুদির-সুবেশম্ ॥
গোপ-কদম্ব-নিতম্ববতী মুখ-চুম্বন-লম্ভিত-লোভম্ ।
বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্মিতশোভম্ ॥”

রূপসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গমালাকে উদ্বেলিত করে সামাজিকের হৃদয়কে ভাসিয়ে দিতে শ্রীজয়দেব অদ্বিতীয়। পদকর্তা গোবিন্দদাসও সে বিষয়ে কিছু কম যান না। প্রাণ ঢেলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাব্যমাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে!

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায়॥
কিবা নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী-ফুলের মালাটি গলায়
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥

কপালে চন্দন- যোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল,—
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥"

কি অপরূপ বর্ণনা! রূপ রস মিলে যেন এক আনন্দমূর্তি গড়ে উঠেছে !! আর এক কৃষ্ণরূপ বর্ণনার মহাকবি শ্রীপাদ লীলা-শুক। তাঁর রূপানুরাগের তুলনা নেই। অনুরাগের নেত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ যখন যেমন দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। তিনি ভাবের আবেগে কখনও বলেছেন - শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত বস্তু, আবার কখনও বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব জ্যোতিঃ, কখনও বা বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ এক অপার্থিব আনন্দ! 'বস্তু' বলে তিনি বস্তুর মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, 'জ্যোতিঃ' বলে তার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া পরিয়েছেন, 'আনন্দ' বলে আনন্দের অধরে মধুর মুরলী বিন্যাস করেছেন। কি মধুর তাঁর ভাব—কি উচ্চকোটির তাঁর ভাষা !! শেষকালে যেন রূপানুরাগের বিশালপ্লাবনে সবই হারিয়ে ফেলেছেন, কেবল 'মধুর' 'মধুর' শব্দগুলির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে সেই উত্তাল রূপসিন্ধুর অসীমতার ইঙ্গিত করেছেন মহাকবি—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৯২)

"কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ—সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিকে বহে যার পূর॥"

( চৈতন্যচরিতামৃতে ঐ শ্লোকের পদ্যানুবাদ )

শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপ-মাধুরী এই মাধুর্যচতুষ্টয় অনন্যসাধারণ। এই মাধুরীগুলি শ্রী-কৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত থাকাতে শ্রুতি, স্মৃতি ও মহাজন গণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ বলে কীর্তন করেছেন।

## শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিরোধীবাক্য সমূহের সমাধান।

গীতা, ভাগবতাদি সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বা

স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদিত হলেও আবার কতকগুলি স্বয়ং ভগবত্তার বিরোধী বাক্যও দেখা যায়। এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐরূপ বাক্য অনেক আছে। সেইসব বাক্যের পূর্বাপর অবিরোধে সঙ্গতি-মূলক সমাধান কি, তাও সুধী ভক্তগণের পক্ষে অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের প্রারম্ভেই মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করেছেন—

"যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥" (ভাঃ ১০।১।২)

'হে মুনিসত্তম! নিতান্ত ধর্মশীল মহারাজ যদুর বংশে অংশতঃ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।' দশমের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দেবগণের স্তবেও দেখা যায়— "দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।" (১০।২।৪১) দেবগণ দেবকীদেবীর প্রতি বলেছেন—'হে মাতঃ! পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য অংশতঃ আপনার কুক্ষিগত হয়েছেন।' শ্রীনন্দমহারাজের উক্তিতে দেখা যায় —"মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।" (ভাঃ ১০।২৬।২৩) অর্থাৎ 'অক্লিষ্ট কর্মকারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি শ্রীনারায়ণের অংশ বলেই মনে করি।' এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব প্রতিপাদক বাক্য শ্রীভাগবতে অনেক আছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের আদি ব্যাখ্যাকার আচার্য শ্রীধরস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অংশত্ব প্রতিপাদক বাক্যে কেবল লোক প্রতীতির অনুবাদ করা হয়েছে মাত্র,

এগুলি শ্রীভাগবতের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নয়, নচেৎ শ্রীমদ্ভাগবতেরই স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদক বাক্যের সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। পূর্বাপর অবিরোধে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করাই পাণ্ডিত্য। তা ছাড়া মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে "তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য" এই বাক্যে শ্রী-কৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অংশ এরূপ অর্থ না করে 'অংশেন' পদে সহার্থে তৃতীয়া করে 'অংশস্বরূপ শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ' এরূপ অর্থ করে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে।

দেবগণের দেবকীস্তবে 'পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাৎ' এইবাক্যে 'অংশ' শব্দের অর্থ 'শক্তি'। শক্তির সহিত বর্তমান যে পরমপুরুষ তিনি দেবকীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন, এরূপ অর্থ গ্রহণ করলে আর বিরোধ থাকে না। মহারাজ নন্দ যে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলেছেন, এটি মহারাজ নন্দের ধারণা - শ্রীমদ্ভা-গবতের সিদ্ধান্ত নয়। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অন্যান্য 'অংশ' শব্দ-গুলির সমাধান জানতে হবে।

এইপ্রকার কোন কোন স্থানে 'কলা' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। 'অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।' ( চৈঃ চঃ ) "বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ" ( ভাঃ ১০ ২০। ৪৮ ) এই শ্লোকের আপাত প্রতীয়মান অর্থে বুঝা যায়—'শ্রী-হরির কলাতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের আবির্ভাবে পৃথিবী পক্বশস্যশালিনী হয়ে নিরতিশয় শোভা ধারণ করেছিলেন।' এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনারায়ণের কলা বলে মনে করলে একবার

শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্, আর একবার অংশের অংশ বা কলা বলা এতে গ্রন্থকারের উন্মত্ত প্রলাপ দোষের প্রসক্তি ঘটে। আসলে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ—'কলাভ্যাং' পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ করে 'কলা' ও 'আভ্যাং' এই দুটি পদের অর্থ হবে যে শ্রীহরির কলা পৃথিবী 'আভ্যাং' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দ্বারা বা তাঁদের আবির্ভাবে নিরতিশয় সম্পদ্শালিনী হয়েছিলেন। এরূপ অর্থগ্রহণ করলে একই শাস্ত্রের পূর্বাপর কোন বিরোধ থাকে না। বস্তুতঃ আচার্যপাদগণ এইরূপ অবিরোধ অর্থেরই পক্ষপাতী। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৯।৫৮ শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা,
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ॥"

এই শ্লোকের আপাত-প্রতীয়মান অর্থে মনে হয় ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি বলেছেন, "তোমাদের দু'জনকে দেখার নিমিত্ত আমি বিপ্রপুত্রগণকে এখানে আনয়ন করেছি। পৃথিবীর ধর্মরক্ষার নিমিত্ত তোমরা দু'জন আমার কলাতে অবতীর্ণ হয়েছ। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করে শীঘ্র তোমরা আমার নিকট আগমন কর।" শ্লোকটির এরূপ যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করলে শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যেরই পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। তাই কোন আচার্যই ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁরা শ্লোক-

টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যথা 'কলাবতীর্ণৌ' পদটির সন্ধি করে 'কলা' ও 'অবতীর্ণৌ' এরূপ ভাগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে 'কলা' শব্দে পৃথিবী অর্থ গ্রহণ করে তাতে অবতীর্ণ যে কৃষ্ণার্জুন দুজন, সেই তাঁদের দেখার জন্য ভূমাপুরুষ বিপ্রপুত্র-গণকে অপহরণ করেছেন। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণকে বধ করে ভূমাপুরুষের লোকে পাঠাবার নিমিত্ত ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণা-র্জুনকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। এইটিই শ্লোকের মর্মার্থ। তাৎ-পর্য এই যে, স্বয়ং ভগবান্ সৌন্দর্য-মাধুর্য-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের নিমিত্ত ভূমাপুরুষের লালসা। কিন্তু ভূমাপুরুষের পক্ষে দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে মহাকালপুরে আনয়ন করে দর্শন করা সর্বথা অসম্ভব। তবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণের কার্য সমাধানের জন্য তিনি সবই করতে পারেন ভেবেই ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় দ্বারকার ব্রাহ্মণ-সন্তানদের অপহরণ করেছেন। "বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথা ত্বিহ" ( হরিবংশ ) ব্রাহ্মণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসতে পারেন, অন্যথা নয়। 'নান্যথা' শব্দের ধ্বনি এইযে, শ্রী-কৃষ্ণের দর্শন বিষয়ে ভূমাপুরুষের নিজের কোন কর্তৃত্ব নেই, সে বিষয়ে কৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসা এবং শ্রী-কৃষ্ণ ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য—এ সবই ভূমাপুরুষের অংশত্বের এবং শ্রী-কৃষ্ণের অংশীত্বের প্রতিপাদক।

বিশেষতঃ ভূমাপুরুষের সংবাদটি 'আখ্যান' ভাগের অন্তর্গত আর 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এটি শ্রুতি। আখ্যান অপেক্ষা নির-

পেক্ষ রব শ্রুতি অতিশয় বলীয়সী। বিরোধে প্রবলের দ্বারা দুর্বলের রোধ, এটি মীমাংসা দর্শনের মত। সুতরাং মহাপুরুষের আখ্যানে যে বাক্যই থাকুক না কেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বলবৎ প্রমাণে তা পরাস্ত হতে বাধ্য। এই যুক্তি পূর্বেও প্রদর্শিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষকে প্রণাম করেছেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা এতে ভূমাপুরুষের উৎকর্ষই আবিষ্কৃত হয়। এই যুক্তি ভ্রমাত্মক। কারণ প্রণামের দ্বারা প্রণম্যের উৎকর্ষ আবিষ্কৃত হলেও এখানে সেরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নয়। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাই ভূমাপুরুষকে প্রণামের হেতু। নরলীলার আবেশে শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করেছেন, গোবর্ধনকে, সূর্যকে, অগ্নিকে প্রণাম করেছেন, তবে কি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে স্তুতি করেছেন, প্রণাম করেছেন, তাই বলে কি বলতে হবে সমুদ্র রামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? বস্তুতঃ ঐ সব কার্য নরবৎ লীলার মাধুর্যের পরিপোষক। আবার শ্রীঅর্জুন মহাকালপুরে যে ভূমাপুরুষের দর্শন করেছিলেন, তা অষ্টভুজ নারায়ণ। নারায়ণতত্ত্বে অষ্টভুজ অপেক্ষা চতুর্ভুজের শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তবে "নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ" এই শ্লোকে ব্রহ্মা স্পষ্টতঃ চতুর্ভুজ নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলে বর্ণনা করেছেন।

এইপ্রকার বিষ্ণুপুরাণাদির কেশাবতার প্রসঙ্গটিও স্বার্থে তাৎপর্যহীন বলেই বুঝতে হবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও

হরিবংশে একটি আখ্যান আছে। ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত প্রার্থিত হয়ে স্বীয় সিত ও কৃষ্ণ দুটি কেশ উৎপাটিত করেছিলেন। সেই দুটি কেশই যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামরূপে আবির্ভূত হয়ে ধরণীর ভার হরণ করেছেন। এখানে 'কেশ' শব্দের অর্থ চুল নয়, কারণ চিরকিশোর অকাল কবলিত শ্রীবিষ্ণুর কোন স্বরূপেই শ্বেত বা পক্ক কেশ সম্ভবপর নয়। এখানে 'কেশ' শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ : শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন— "অংশবো যে প্রকাশন্তে তে মম কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্ মামাহুর্মুনিসত্তমাঃ॥" (মহাভারত) অর্থাৎ "আমার থেকে যে জ্যোতিঃসমূহ প্রকাশিত হয় তার নাম 'কেশ', এজন্যই সর্বজ্ঞ মুনিগণ আমায় 'কেশব' নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন।" অতএব ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ 'শ্বেত' ও 'কৃষ্ণ' দুটি জ্যোতিঃ দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বর্ণের এবং শোভার ইঙ্গিত করেছেন। মস্তকের উপরে জ্যোতির্দ্বয় দেখিয়ে এও জানিয়েছেন যে, আমার ও অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের শিরোধার্য পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ এবার অবতীর্ণ হচ্ছেন, অতএব ধরাভার হরণের নিমিত্ত আর কোন চিন্তাই নেই। তা না হলে শ্রীকৃষ্ণকে একবার স্বয়ং ভগবান্ বা সকল ভগবৎস্বরূপের মূলাবতারী বলে আবার তাঁকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার বললে সেই বাণী উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় হয়। অতএব ঐসব শ্লোকের যথাশ্রুতার্থে তাৎপর্য নেই। অথবা এভাবেও কেউ কেউ পরস্পর বিরোধী

এই সব শাস্ত্র বাক্যের সমাধান করে থাকেন, যথা

"কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥" (চৈঃ চঃ)

# শ্রীরাধাতত্ত্ববিজ্ঞান

## শ্রীরাধাই সর্বশক্তিবরীয়সী।

শ্রীভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানে আমরা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির কথা বলেছি। সেই স্বরূপশক্তির শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনীশক্তি। হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবীই শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অতএব পূর্ণশক্তিমান্, তাঁর কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তি। তিনি সর্বশক্তি-বরীয়সী, সর্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও অংশিনী! পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে।

"ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্বিদ্যাত্মিকা পরা।
পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥
কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে।
যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥
ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তবেশিতুঃ।
তবাংশমাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে॥
মায়াবিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তুমায়ার্ভকমায়িনঃ।
পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥"

"হে দেবি! বিশুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব অর্থাৎ হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের মূল। তুমি পরা-শক্তিরূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম আনন্দ-সন্দোহ ধারণ করেছ। তুমি ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণেরও দুর্গম, তোমার বিভব প্রতি অংশেই আশ্চর্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি সর্বশক্তির তুমিই ঈশ্বরী। নিখিল ভগবৎশক্তি তোমারই অংশ বলে আমার অনুভব হয়। অর্ভকমায়াধারী বা নরলীল সেই পরমেশ্বর ভগবান্ মহাবিষ্ণুর অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মায়াবিভূতি আছে, সে সকলও তোমারই অংশ স্বরূপ।"

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ এবং সর্বগুণ ও সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী—একথা প্রীতিসন্দর্ভে (১২০ অনুঃ) শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদও লিখেছেন, "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তিঃ দ্বিধা বিরাজতে। অন্তরেঽনভিব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্ম্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ব্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি।" যে স্বরূপ-শক্তির গুণাদি সম্পদ্রূপা অনন্ত শক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানে দুইরূপে বিরাজিত—(১) তাঁর মধ্যে অনভিব্যক্ত নিজমূর্তিতে কেবল শক্তিরূপে (২) বাইরে লক্ষ্মীনাম্নী মূর্তি অভিব্যক্ত করে। এই মূর্তিমতী স্বরূপশক্তিই সর্বসদ্গুণের

এবং সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকেন। এই কমলাগণের মূল অংশিনীই শ্রীরাধা।

"তস্যাদ্যা-প্রকৃতি-রাধিকা নিত্য-নির্গুণা যস্যাংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদিকা শক্তয়ঃ" (গোপালতাপনী) শ্রীভগবানের আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা নিত্যা নির্গুণা লক্ষ্মী দুর্গা প্রভৃতি তাঁরই অংশ। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ যেমন তুরীয়তত্ত্ব হলেও সর্বকারণকারণ, শ্রীরাধাও তদ্রূপ পরাশক্তি হয়েও সর্বকারণ-কারণরূপা। সর্বকারণস্বরূপা বলেই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি তাঁকেই 'আদ্যা' শক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আর নিত্য তুরীয়স্বভাবে স্থিতা বলেই শ্রীনারদপঞ্চরাত্র' গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি তাঁকে পরাশক্তিরূপে অভিহিত করেছেন। "লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা। ভক্ত্যা নমন্তি যৎ শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরম্॥" "লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী এবং পরাশক্তি শ্রীরাধা ভক্তির সহিত যাঁকে প্রণাম করেন, পরাৎপর সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি সর্বদা প্রণাম করি।" পঞ্চরাত্রের এই শ্লোকে লক্ষ্মী দুর্গা প্রভৃতি ভগবৎশক্তি হলেও কেবল শ্রীরাধার বিষয়েই 'পরা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। "পরান্তে শ্রেষ্ঠবাচকাঃ" অন্তে 'পরা' শব্দের প্রয়োগ শ্রেষ্ঠতার বাচক হয়, এই নিয়মানুসারে শ্রীরাধাই যে সর্বশক্তিশ্রেষ্ঠা তা অনায়াসেই বুঝা যায়। শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতার বাচক ঐ 'পরা' শব্দটি উক্তগ্রন্থে বহু স্থানেই প্রযুক্ত হয়েছে। "রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।" শ্রীরাধা রসময়ী, রসিকানন্দা, স্বয়ং রাসেশ্বরী ও পরা।" "দেবী

কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥" শ্রীল চৈতন্যচরিতামৃতকার এই শ্লোকের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন—

"দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে-বাহিরে।
যাহাঁ-যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
সর্ব্ব-লক্ষ্মী-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা 'সর্ব্বলক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি—সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
"কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ ।
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ-বিবরণ ॥
জগত-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী ।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥" ( চৈঃ চঃ )

পরাশক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে মহামুনি পরাশর বলেছেন, "যাতীতগোচরাবাচাং মনসঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানীজ্ঞান-পরিচ্ছেখ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥" 'যে মহাশক্তি সর্বথা বাক্যের অগোচর, মনের অবিষয়, কেবল ভাগবত পরমহংসগণের অনুভবাত্মক জ্ঞানেরই বিষয়—সেই পরমেশ্বরী পরা প্রকৃতিকে আমি বন্দনা করি।' মহামুনি পরাশরের বন্দনীয়া ঐ শক্তি কোথাও 'লক্ষ্মী' কোথাও 'দুর্গা' নামে কীর্তিতা হলেও শ্রীবৃন্দাবনে 'শ্রীরাধা' রূপেই তাঁর পূর্ণতম স্থিতি। পরাশক্তির পরাবস্থাই শ্রীরাধা।

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ ।
দুই বস্তু ভেদ নহে শাস্ত্র-পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥" ( চৈঃ চঃ )

একটি দ্বিদলের দুটি দলের ন্যায় একটি তত্ত্বই দুই মূর্তিতে বিরাজমান। মৃগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায়, অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তির ন্যায়, চন্দ্র এবং তার জ্যোৎস্নার ন্যায়, দুগ্ধ এবং

তার ধবলিমার ন্যায় তত্ত্বে শ্রীরাধা সর্বদা কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন থেকেও লীলাক্ষেত্রে তাঁর পার্শ্বে কান্তা-শিরোমণিরূপে বিরাজমান। প্রেমে যিনি কৃষ্ণময়ী, রসে যিনি গৌরাঙ্গী, ঐশ্বর্যে যিনি সর্ব-লক্ষ্মীময়ী, মাধুর্যে যিনি প্রধানা গোপিকা। শ্রীল শুকদেব মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা বর্ণনায় নিখিল গোপিকাগণ অপেক্ষা তাঁর পরম মহত্ত্ব অনুভব করে শতকোটি গোপীগণের মধ্যে তাঁকেই সর্ব শ্রেষ্ঠাসন দান করেছেন।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥"

( ভাঃ ১০।৩০।২৪ )

মহারাসে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলে বিরহোন্মত্তা ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করতে করতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখতে পান, তারপর সেই চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হলে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের বামপার্শ্বে শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখতে পান। তখন তাঁদের সবার অপেক্ষা শ্রীরাধার মহা সৌভাগ্যের অনুভব প্রাপ্ত হয়ে কোন গোপী বলেন,-"হে সখিগণ! এই যাঁর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে সেই শ্রীরাধাই সর্বদুঃখহারী ভক্তের অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ ভগবান্‌কে আরাধনা করে বশীভূত করেছেন। যার ফলে শ্রীগোবিন্দ এই গভীর রজনীতে আমাদের সকলকে বনমধ্যে ত্যাগ করে আমাদের অগম্য নির্জনস্থানে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং ইহার ভাগ্যমহিমার তুলনা হয় না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট রামানন্দরায় শ্রীরাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি রূপে স্থাপন করে যখন নিখিল গোপিকাগণ অপেক্ষা শ্রীরাধার মহত্ব প্রতিপাদনে এই শ্লোকটির দৃষ্টান্ত দেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এর উপর কিছু আপত্তি তুলেন।

"প্রভু কহে —আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।<br>
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥<br>
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।<br>
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥<br>
রাধা-লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাত করে ত্যাগ।<br>
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥"

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বটি প্রেমের অধীন। প্রেমের জাতি এবং পরিমাণ অনুসারে তাঁর বশ্যতার তারতম্য হয়ে থাকে। গোপীগণের সান্নিধ্য থেকে শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপনে চুরী করে নিয়ে গেলেন, তখন মনে হল যেন অন্য গোপীদের অপেক্ষা তাঁর ছিল। যদি কারও অপেক্ষা না রেখে সাক্ষাৎভাবে শ্রীরাধার জন্য গোপীগণকে ত্যাগ করতে পারতেন তবেই অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেম-মহত্ত্ব বুঝা যেত। এটিই প্রভুর আপত্তি। মহারাসে শ্রী-রাধার মান ও অন্যান্য গোপীগণের সৌভাগ্যগর্ব যুগপৎ এই দুটির প্রশমন জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান। সুতরাং সব গোপীর প্রত্যক্ষে শ্রীরাধারাণীকে নিয়ে গেলে শ্রীরাধার মান প্রশমন সম্ভব হলেও

অন্যান্য গোপীর ভাবসিন্ধুতে 'অসূয়া' সঞ্চারিরূপ তরঙ্গ জাগত। নিস্তরঙ্গ মহাভাবসিন্ধু না হলে রাসক্রীড়ার ন্যায় মহারসক্রীড়া সম্পন্ন হওয়া কখনও সম্ভবপর নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ সকলের অলক্ষ্যে রাধারাণীকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। অন্য গোপিকার অপেক্ষার জন্য নয়। কারণ শ্রীজয়দেবের বর্ণিত বসন্তরাসে শ্রীরাধার নিমিত্ত সাক্ষাদ্ভাবেই গোপীগণকে ত্যাগ করেছেন দেখা যায়। তাই পরম সুরসিক রামরায় জয়দেবের রাসের প্রমাণ দিয়ে প্রভুর আপত্তি সযৌক্তিকভাবে খণ্ডন করে রাধাপ্রেমের মহামহত্ত্ব স্থাপন করলেন—

"রায় কহে—তাঁহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা॥

গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ( ৩।১।২ )—

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ॥

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥"

"এই-দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥
সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম বাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"

## শ্রীরাধার গুণাবলী।

শ্রীরাধারাণীর গুণ গণনা করা জীবের কথা দূরে থাক, শ্রীভগবানের পক্ষেও অসম্ভব। শ্রীরাধার গুণাবলী সবই মহাভাবের থেকে উত্থিত। কারণ যে গুণ প্রেমোত্থিত নয় তা কখনই শ্রীভগবানের বশ্যতার হেতু হতে পারে না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-

ঘনতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক গুণবতী শ্রীরাধা। এজন্যই তাঁর গুণাবলী শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ সুখের হেতু। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে॥
আমা' হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস।
রাধার অধর-রস আমা করে বশ॥

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥" (চৈঃ চঃ)

'শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধার গুণ অনন্ত, তবু তাঁর যেসব বিশেষ গুণ শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু অর্থাৎ যাতে শ্রীকৃষ্ণ একান্ত বশীভূত হন, এরূপ পঁচিশটী গুণের কথা শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বর্ণনা করেছেন —

"অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌ নর্ম্মপণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥"

(উঃ নীঃ রাধা প্রঃ)

শ্রীরাধিকা (১) মধুরা অর্থাৎ সর্বাবস্থায় চেষ্টাসমূহের ও অঙ্গসৌষ্ঠবের চারুতাযুক্তা, (২) নববয়া অর্থাৎ নিত্যকিশোর বয়সান্বিতা, (৩) চলাপাঙ্গা—যাঁর অপাঙ্গদৃষ্টি সুচঞ্চল, (৪) উজ্জ্বলস্মিতা – উজ্জ্বল মধুরহাস্যযুক্তা, (৫) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা অর্থাৎ শ্রীচরণতলে ও করতলে যব, চক্রাদি সুন্দর সৌভাগ্যরেখা যুক্তা, (৬) গন্ধোন্মাদিতমাধবা – যাঁর গাত্রগন্ধমাধুর্যে মাধব উন্মত্ত হয়ে উঠেন. (৭) সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা – সঙ্গীতবিদ্যায় যিনি পরম নিপুণা, (৮) রম্যবাক্—যাঁর বাক্য অতি রমণীয়, (৯) নর্মপণ্ডিতা —পরিহাসগর্ভ মধুর রম্যবাক্য প্রয়োগে সুনিপুণা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণাপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা – নানা কলাবিদ্যায় সুনিপুণা, (১৩) পাটবান্বিতা– অতি সুচতুরা, (১৪ লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্যাদা—উত্তম মর্যাদাসম্পন্না, এটি ত্রিবিধ স্বাভাবিকী, শিষ্টাচার পরম্পরা এবং স্বকল্পিতা, (১৬) ধৈর্যশালিনী, (১৭) গাম্ভীর্যশালিনী, (১৮) সুবিলাসা—বিবিধ হাব ভাবাদিতে অলঙ্কৃতা, (১৯) মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী— মহাভাবের চরমবিকাশহেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সাতিশয় তৃষ্ণাশীলা, (২০) গোকুলপ্রেমবসতি—গোকুলবাসী সবাই যাঁকে প্রীতি করেন, (২১) জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা যাঁর যশে নিখিল জগৎপূর্ণ, (২২) গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা গুরুজনের যিনি অতিশয় স্নেহের পাত্রী, (২৩) সখীপ্রণয়িতাবশা—যিনি সখীগণের প্রণয়ের একান্ত অধীন, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-

প্রেয়সীগণের সর্বপ্রধানা, (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা—শ্রীকৃষ্ণ শততই যাঁর অধীন। অধিক আর কি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যাঁর গুণ সংখ্যাতীত। প্রেমরত্নখনি শ্রীরাধার গুণ অন্যান্য ভগবৎকান্তা গণেরও অভিলষণীয়—

"কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর॥
যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার?" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধা সর্বলক্ষ্মীময়ী, সুতরাং অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী হলেও অসীম মাধুর্যসিন্ধুতে ঐসব ঐশ্বর্য নিমগ্ন থাকায় শ্রীরাধা-তত্ত্বে ঐশ্বর্যের বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। তাই মহাজনগণ তাঁর মাধুর্যময় গুণেরই বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ মাধুর্য আস্বাদনের বা অনুভবের বস্তু, ইহার বর্ণনা ভাব, ভাষা ও ছন্দের অতীত। প্রেমের সাধনাব্যতীত শ্রীরাধার মাধুরী অনুভব করা যায় না। ধ্যানে অমল কমল কান্তি শ্রীরাধার বর্ণনা থাকলেও অমল, কমল কান্তি সেই রূপের কোন ধারণাই দিতে পারে না। কমল, চন্দ্র প্রভৃতি সবই প্রাকৃত বস্তু,জলীয়পদার্থের, তৈজসপদার্থের বিকার।

পরন্তু শ্রীরাধার মূর্তি সাক্ষাৎ মহাভাবের উপাদানে গড়া। "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥" (চৈঃ চঃ) মহাজনগণ সেই প্রেমস্বরূপের বর্ণনা করেছেন, ভক্তবৃন্দ তা আস্বাদন করুন—

"মহাভাবচিন্তামণি – রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তিকর্পূর – তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস॥

রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা-সর্ব্বাঙ্গে-পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্যবয়স্থিতি-সখীস্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥" (চৈঃ চঃ)

ভাবুক ভক্তবৃন্দ! প্রেমের মূর্তির এই পরিচয়! মহাভাবকে ভাব দিয়েই বুঝতে হবে—অন্য কোন উপায় নেই। মহাভাব শ্রীকৃষ্ণসুখের চরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সুখে শ্রীরাধার পরিচয় দিয়ে শ্রীরাধার গুণমাধুরীর বর্ণনা করেছেন

শ্রীল গোস্বামিপাদগণ। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের শ্রীবিশাখানন্দদ স্তোত্রে দেখা যায়—

"গোবিন্দানঙ্গ-রাজীবে ভানুশ্রীর্বার্ষভানবী।
কৃষ্ণহৃৎকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতিঃ॥
কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী-সরসী-বরা।
কৃষ্ণচাতকজীবাতু নবাম্ভোদ-পয়ঃস্রুতিঃ॥
× × × × × × × × ×
কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্ছে বিলসৎ স্বর্ণযূথিকা।
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতাদ্ভুতা॥
গ্রীষ্মে গোবিন্দ সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা।
শীতে শ্যাম-শুভাঙ্গেষু পীতপট্ট লসৎপটী॥
মধৌ কৃষ্ণতরূল্লাসে মধুশ্রীর্ম্মধুরাকৃতিঃ।
মঞ্জু-মল্লাররাগশ্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী॥
ঋতৌ শরদি রাসৈক রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্।
বরীতুং হন্ত রাসশ্রীর্বিহরন্তী সখীশ্রিতা॥
হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্।
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীর্মূর্ত্তিধারিণী॥"

শ্রীগোবিন্দের অনঙ্গ-কমল বিকাশে শ্রীরাধা ভানুশ্রী বা সূর্যরশ্মি, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-কুমুদ বিকাশে তিনি সুধাকর কিরণ-মালা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মানসহংসের শ্রেষ্ঠ মানস-সরসী, শ্রীকৃষ্ণ-চাতকের জীবাতু নবজলদের বারিধারা। শ্রীকৃষ্ণরূপ মঞ্জুল তমালে

যিনি স্বর্ণযূথিকার ন্যায় বিলসিতা, গোবিন্দরূপ নবজলধরে অদ্ভুত স্থিরা বিদ্যুৎলতা। গ্রীষ্মঋতুতে যিনি গোবিন্দের সর্বাঙ্গে অতি সুশীতল কর্পূর, চন্দন ও চন্দ্রিকা, শীতকালে শ্যামসুন্দরের শুভাঙ্গে মনোহর পীতকৌষেয়বাস। যিনি বসন্তে শ্রীকৃষ্ণতরুর উল্লাসদায়িনী মধুরাকৃতি বাসন্তীশ্রী, বর্ষায় শ্যামজলদের হর্ষদায়িনী মঞ্জুমল্লাররাগ। শরতে যিনি রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে বরণ করতে সখীশ্রিতা হয়ে সাক্ষাৎ 'রাসশ্রী'রূপে বিহার করেন। হেমন্তকালে মদনসমরের নিমিত্ত ভ্রমণকারী ব্রজরাজনন্দনকে পরাজিত করতে যিনি মূর্তিমতী 'জয়শ্রী'রূপে বিরাজ করেন। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্বস্বই শ্রীরাধা। সেই শ্যামতমালের স্নেহময় অঙ্কে সোহাগে জড়িতা কনকলতা-শ্রীরাধা এবং তাঁর কিশলয়দল স্থানীয়া সখী-মঞ্জরীগণের দোলনলীলা যদি বৃন্দাবনীয় রসসাধকের নয়নগোচর না হয়; তবে ব্রজের সাধনাই যেন বহুলাংশে ব্যর্থ হয়ে যায়।

## শ্রীরাধার আশ্রয়বিহনে ব্রজরসোপাসনা নিষ্ফল।

ব্রজরসোপাসনার লক্ষ্যই হচ্ছে—উপাসকের শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আস্বাদন লাভ। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের বিশাল কল্লোলিত সিন্ধু! ক্ষুদ্রজীবশক্তি প্রেমলাভ করলেও তার সেই অণুপ্রেমদ্বারা মাধুর্যসিন্ধুর বিন্দু মাত্রই আস্বাদন করতে সক্ষম। যদি কোন মহাশক্তি স্বীয় বিভুপ্রেমদ্বারা সেই বিভুমাধুর্যের সম্যক্ আস্বাদনে সমর্থা হন এবং কৃপা করে তিনি স্বীয় আস্বাদ্য প্রেমের সবটাই

আশ্রিতজনকে আস্বাদন করান; তবেই জীবশক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যের আস্বাদন-সৌভাগ্য যথার্থ সার্থক হতে পারে এবং ব্রজরসোপাসনাও সর্বাংশে সফল হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥
এই-প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥"

যে সব সাধক সখী-মঞ্জরীভাবে অপার করুণাবারিধি শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণাশ্রয় করেন তাঁদেরও শ্রীকৃষ্ণমাধুরীর সম্যক্ আস্বাদন লাভ হয়ে থাকে। এবিষয়েও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আলোক পাওয়া যায়—

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥"

লতা সিঞ্চিতা হলে যেমন নিজের সম্যক্ আস্বাদ পল্লব-মঞ্জরীগুলিকে দান করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধারূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে সিঞ্চিতা হলে তাঁর সম্যক্ আস্বাদ সখী-মঞ্জরী-গণকে অর্পণ করে থাকেন। এজন্য শ্রীরাধার আশ্রয় ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনের অকিঞ্চিৎকরতা বর্ণনায় মহাজনের উক্তি—

"রাধাদাস্যমপাস্য যঃ প্রযততে গোবিন্দসঙ্গাশয়া
সোঽয়ং পূর্ণসুধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঙ্ক্ষতি॥
কিঞ্চ শ্যামরতিপ্রবাহলহরীবীজং ন যে তাং বিদু-
স্তে প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্বুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নুয়ুঃ॥"

যিনি শ্রীরাধার দাস্য ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভের নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, তিনি পূর্ণিমাতিথি বিনাই যেন পূর্ণচন্দ্রের কিরণলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরন্তু যাঁরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রবাহের উৎপত্তিস্থান শ্রীরাধাকে না জানেন, অহো! তাঁরা মহামৃতের সিন্ধু প্রাপ্ত হয়েও বিন্দুমাত্রই লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ সিন্ধু পেয়েও বিন্দুমাত্রেরই আস্বাদন প্রাপ্ত হন।

মূলা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তিভূমি। তাঁর আশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের চরমতা ও সার্থকতা। যে সব সাধক শ্রীরাধার আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁরা একা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করলেও যে আস্বাদন লাভ করেন, তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এজন্য শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ তাঁদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করে দূরতঃ তাঁদের সঙ্গত্যাগের সঙ্কল্প করেছেন—

"অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥"

অর্থাৎ "শ্রীনারদাদি মুনিগণ ও নিগমাদি শাস্ত্র যাঁর মহামহিমা সতত কীর্তন করেন, সেই প্রবীণা কৃষ্ণপ্রিয়তমা গান্ধর্বা শ্রীরাধারাণীকে অনাদর করে যে ব্যক্তি একা গোবিন্দের ভজন করে সে কপটী ও দাম্ভিক, তার অপবিত্র সান্নিধ্যে আমি ক্ষণকালও গমন করি না, ইহা আমার ব্রত।" শাস্ত্রেও আছে—"বিনা রাধা-প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে" শ্রীরাধার প্রসাদ ব্যতিত কৃষ্ণপ্রাপ্তি সর্বথা অসম্ভব। সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমন্মহাদেব দুর্গার নিকট বলেছেন—

"গৌরতেজো বিনা যস্তু শ্যামং তেজঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জপেদ্ বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে॥"

"শ্রীরাধাকে ত্যাগ করে যারা শ্যামসুন্দরের উপাসনা করে, অথবা জপ করে, ধ্যান করে তারা পাতকী হয়ে থাকে।" তেজ-ভেদের এই ফল। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচরী। ঋক্‌পরি-শিষ্টে বর্ণিত—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা জনেষ্বাবি-ভ্রাজন্তে" রাধার সহিত মাধব এবং মাধবের সহিত রাধা নিতই অভিন্নভাবে থেকে জনগণ মধ্যে বিরাজ করছেন। শ্রীমৎ জীব-গোস্বামিপাদ তাঁর হৃদয়ে-বিদ্ধ অশেষ দুঃখদায়ক সাতটি শেলের কথা বলেছেন—

"নৃপো ন হরিসেবিতা বয়ীকৃতী ন হর্ধ্যর্পকঃ
কবি র্ন হরিবর্ণকঃ শ্রিতগুরু র্ন হর্য্যাশ্রিতঃ।
গুণী ন হরিতৎপরঃ সরলধী র্ন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ
স ন ব্রজরমানুগঃ স্বহৃদি সপ্তশল্যানি মে॥"

"যিনি রাজা কিন্তু হরিসেবা করেন না, অর্থব্যয়ী কিন্তু ভগবৎকার্যে কিছু অর্পণ করেন না, কবি কিন্তু ভগবদ্ রূপ, গুণ, লীলাদি বর্ণনা করেন না, গুণী কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নন, সরলচিত্ত কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয় করেন না এবং কৃষ্ণ আশ্রয় করলেও ব্রজরমা শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন না -এই সাতটি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ শেল সদৃশ নিদারুণ দুঃখদায়ক।"

শ্রীরাধার ভজন-বিমুখ-জনের প্রতি আক্ষেপ করেছেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—

"জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণগান, না শুনিল মোর কান,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তার ভক্ত সঙ্গ সদা, রসলীলা-প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
না শুনিয়ে তার যেন নাম॥"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীশ্রীরাধামাধবের পাদপদ্মাশ্রয়ী ভক্তজনের সহিত সঙ্গের ফলেই শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় লীলারসজ্ঞান সম্ভবপর হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ তাঁর স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ স্তোত্রে লিখেছেন—

"অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ ॥"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্ম-পরাগের আরাধনা করেনি, যে তদীয় শ্রীচরণ-চিহ্নিত শ্রীবৃন্দাবনকে আশ্রয় করেন নি, তদীয় ভাবে যাঁদের চিত্ত গম্ভীর অর্থাৎ যেসব গম্ভীরচিত্ত ভক্ত শ্রীরাধারাণীর রহোদাস্য লাভের নিমিত্ত লালসান্বিত, তদ্রূপ রসিক রাগমার্গীয় সাধকগণের সঙ্গে যে ব্যক্তি সঙ্গ করেনি সে কখনই শ্যামরসার্ণবে অবগাহনে সমর্থ হতে পারে না।'

## শ্রীরাধাই সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের মাধুরী।

"রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে" ( স্কন্দপুরাণ ) তত্ত্ববস্তুর শক্তি ও শক্তিমান্ এইদুটী দিক্। শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, শক্তি শ্রীরাধা। আনন্দঘন পরব্রহ্মের আনন্দমাত্র বিশেষ্য, শক্তি বিশেষণ, শক্তিমান্ বিশিষ্টবস্তু। শক্তি ও শক্তিমানের বিলাস-বৈভবের নাম লীলা। শক্তি ত্রিবিধ—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। লীলাও ত্রিবিধ—নিত্যলীলা, সংসারলীলা ও সৃষ্টিলীলা। স্বরূপশক্তির সঙ্গে শ্রীভগবানের যে লীলা তার নাম নিত্যলীলা, জীবশক্তির সঙ্গে তাঁর লীলার নাম সংসারলীলা এবং মায়াশক্তির সহিত লীলার নাম সৃষ্টিলীলা। যে লীলা অনাদি অনন্ত, অফুরন্ত বৈচিত্রীময়, নিত্য নবোল্লাসে ভরা, পরম

সুরসাল—তারই নাম নিত্যলীলা। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দ্বিবিধ। মায়াতীত তুরীয় রাজ্যে সচ্চিদানন্দময় নিত্যলীলাধামে অপ্রকটে শ্রীভগবানের লীলাস্রোত অনাদি অনন্তকাল ধরে চির-প্রবহমান। লীলাপুরুষোত্তমের সেই অপ্রকটলীলাসমূহ নিখিল লীলার মূল উৎস। সেই অপ্রকটলীলা লীলাময়ের ইচ্ছায় লোকলোচনের গোচরীভূত হওয়ার জন্য যখন প্রপঞ্চলোকে নেমে আসে, তখন তাকে প্রকটলীলা বলা হয়। প্রকটলীলাতে অপ্রকটলীলা অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে অধিকতর রস-চমৎকারিতা ফুটে উঠে। প্রকট অপ্রকট উভয়লীলাই প্রধানতঃ স্বরূপশক্তির সঙ্গেই হয়ে থাকে। স্বরূপশক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই ত্রিবিধ হলেও হ্লাদিনীর সহিতই লীলাচমৎকারিতা সমধিক। "যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী" যে শক্তির দ্বারা আনন্দময় পরমপুরুষ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও পরমানন্দরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণের হৃদয়ে তুরীয় আনন্দরসের অনুভূতি প্রদান করেন, তাঁকে হ্লাদিনীশক্তি বলে।

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥" (চৈঃ চঃ)

শক্তিরূপে হ্লাদিনী আনন্দঘনতত্ত্বে এবং বৃত্তিরূপে ভক্তি-তত্ত্বে নিত্য বিদ্যমান থেকেও শৃঙ্গাররসরাজ পরম পুরুষকে সেবা করবার নিমিত্ত স্বরূপের বহির্দেশে মূর্তিমতী হয়ে নিত্য অবস্থান করে 'ভগবৎপ্রিয়া' নামে পরিচিত হন। এই সমস্ত ভগবৎ-

প্রিয়া গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি ধামে পরমস্বীয়া, স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে ত্রিবিধা। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ পরমস্বীয়া; অযোধ্যাতে সীতা, দ্বারকাতে রুক্মিণী, সত্যভামাদি মহিষীগণ স্বকীয়া এবং শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকাগণ পরকীয়া কান্তা নামে প্রসিদ্ধ। মধুর-রসে পরকীয়াভাবে রসোল্লাসের আতিশয্য দৃষ্ট হয়—"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

"বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমারতিঃ॥"

( উঃ নীঃ )

"যে রতিতে নায়ক-নায়িকার মিলনে বহু বাধা থাকে, যাতে উভয়ের কামভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকে, যে রতিটি পরস্পরের দুর্ল্লভতাময়ী সেই মন্মথ সম্বন্ধিনী কান্তারতিই পরম শ্রেষ্ঠ।" এজন্য এই পরকীয়া কান্তাগণই সমর্থা নায়িকা নামে খ্যাতা। সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও আবার মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীই সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, তদ্রূপ অখণ্ড মহাভাবের আধারমূর্ত্তি শ্রীরাধা। রসে ভাবের অভিব্যক্তি এবং ভাবেই রসের আস্বাদ ; এই ন্যায়ে অখিল রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং অখণ্ড মহাভাবের মূর্তি শ্রীরাধা-রাণীর পারস্পরিক মিলনেই রসাস্বাদনমাধুরীর সমধিক উচ্ছ্বাস। শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলনমাধুরী আস্বাদনের বৈচিত্রী সম্পাদনের জন্য শতকোটি গোপীর সান্নিধ্য।

"রাধা সহ ক্রীড়ারস আস্বাদ-কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥" (চৈঃ চঃ)

এতেই মহারাসের সূচনা। রাসলীলাতেই অখিল মাধুর্যের চরম পর্যবসান। রাসেশ্বরী শ্রীরাধাই। "তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।" (চৈঃ চঃ) রসঘন-অখণ্ড-আনন্দতত্ত্বে অনন্ত বৈচিত্রীময় নৃত্যগীতাদি শৃঙ্গাররসের যে অফুরন্ত উচ্ছ্বাস—এরই মধ্যে লীলাশক্তির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত। লীলায় প্রবেশ করতে পারলে তা অনুভব হয়, লীলার বাইরে অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ ব্রহ্মনা সহ বিপশ্চিতা" এইসব শ্রুতিবাণীর সার্থকতা ও লীলারাজ্যে এবং রাসলীলাতেই তার চরম পর্যবসান। রাসলীলার মাধুরী অখণ্ডরসঘনতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দকে পর্যন্ত পাগল করে তোলে। রাসলীলা আস্বাদনের নিমিত্ত সেই আত্মারাম, আপ্তকাম, "রসো বৈ সঃ" পুরুষের মনে কত শত কামনা জেগে উঠে! রাসলীলার প্রথম শ্লোকে "রন্তুং মনশ্চক্রে" এই আত্মনেপদ বিভক্তি প্রয়োগের এটিই তাৎপর্য। "রেমে তয়া চাত্মরতঃ" এই পদপ্রয়োগ ভঙ্গীর উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে আপ্তকাম শ্রীভগবানের প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় নিস্তরঙ্গ হৃদয়-সিন্ধুতে মহাঝটিকাবর্তের ন্যায় অফুরন্ত কামনার তরঙ্গ জাগায় মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর প্রেমমাধুরী। মনীষিগণ অনুভব করেন প্রিয় ও প্রিয়াভাবে পরব্রহ্ম ও পরা প্রকৃতির সর্বশক্তিমান ও সর্বশক্তিময়ীর, স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বয়ং

ভগবতীর মিলনবিরহের মহা ব্যাকুলতার মহারসক্রীড়া শ্রীশ্রীরাসলীলা। এই রসের আস্বাদনে মহামুক্তপুরুষ শ্রীপাদ শুকদেবমুনি স্বয়ং তন্ময় হয়েছেন এবং মহারাজ পরীক্ষিতকেও তন্ময় করেছেন। এই রসের পাগল জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস নিজেরাও ভেসেছেন বিশ্বকেও ভাসিয়েছেন। অন্যের কথা কি যে রসের মধুর খেলায় রাসনায়িকাগণের নিকট হার মেনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ঋণীত্ব স্বীকার করে বলেছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥" (ভাঃ ১০।৩২।২২)

আমি ব্রহ্মার আয়ু পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকট থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যদি কেবল তোমাদের প্রেমের প্রতিদান করে যাই, তবু তোমাদের নির্মল প্রেমের ঋণ পরিশোধ হবে না। তোমরা যে ভাবে দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে আমার ভজন করেছ, তার কুত্রাপি তুলনা নেই। তোমাদের সৌশীল্যেই এর প্রতিকার হোক্! মহাভাবের নিকট রসরাজের এই স্বতঃসিদ্ধবশ্যতা। সেই মহাভাবরাজ্যে মাদনাখ্য-মহাভাবের স্থান সর্বোপরি। সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী এই মাদন পরাৎপর ভাব, অর্থাৎ মোদন, মোহনাদি

সকল ভাব অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ। একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা-রাণীতেই হ্লাদিনীসার এই মাদনভাবের স্থিতি।

"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥" (উঃ নীঃ)

তাই রাধারাণীই প্রেমের পরমাদর্শরূপে বিশ্বে কীর্তিত হয়েছেন। সব ব্রজসুন্দরীগণে মহাভাবের বৃত্তি প্রচুররূপে বিদ্যমান থাকলেও শ্রীরাধারাণী তার সারাংশ-উদ্রেকময়ী। পরিমাণেও তাঁর প্রেম পরম মহান্। তাই শ্রীরাধার প্রেমমাধুরী আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের লোভ জাত হয়েছে। তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হয়ে স্বয়ং শ্রীরাধার প্রেমমাধুরী আস্বাদন করেছেন এবং বিশ্ববাসীকেও সেই প্রেম-মাধুর্যার্ণবে নিমগ্ন করে জানিয়েছেন—'শ্রীরাধাই ব্রজের সাক্ষাৎ মাধুরী।' তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ নানাভাবে শ্রীরাধার প্রেমমাধুরীর শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করে বিশ্বসাধকগণকে ধন্য করেছেন।

## শ্রীশ্রীযুগলমাধুরীই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের উপাস্য।

শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগলই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাস্য। শ্রীরাধারাণীর আশ্রয়েই তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। আমরা শ্রীরাধাবিহনে একা শ্রীকৃষ্ণভজনে গৌড়ীয়বৈষ্ণবা-চার্যগণের আক্ষেপবাণী কয়েকটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যে শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ শ্রীরাধাবিহনে শ্রীকৃষ্ণভজনকারীকে

কপটী ও দাম্ভিক বলে তাদের সঙ্গ দূরতঃ ত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, সেই তিনিই আবার শ্রীযুগলোপাসকের প্রতি প্রাণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন—

"অজাণ্ডে রাধেতিস্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
ঽনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥"

"যাঁর 'রাধা' এই মধুময় নাম শ্রবণে এই বিশ্বে নিখিলপ্রাণী প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়, সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমনমিত চিত্তে উপাসনা করেন, আমি তাঁর চরণযুগল প্রক্ষালন করে সহর্ষে সেই পবিত্রজল পান করে নিত্য মস্তকে ধারণ করি—এটিও আমার ব্রত।"

এই দুটি বাক্যের পার্থক্য অনুভব করলে শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণভজনের যে কতখানি প্রয়োজন এবং গুরুত্ব তা ভক্তবৃন্দ অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের শেষে লিখেছেন—"অতঃ সর্ব্বতোঽপি সান্দ্রানন্দ-চমৎকারকরশ্রীকৃষ্ণপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনেঽপি পরমাদ্ভুত-প্রকাশঃ শ্রীরাধয়া যুগলিতস্তু শ্রীকৃষ্ণ ইতি।" তাৎপর্য এই যে, নিখিল-ভগবৎ-প্রকাশ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণেরও দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন এই ধামত্রয়ে ত্রিবিধ প্রকাশ ; তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে অসাধারণ মাধুর্যের বিকাশহেতু বৃন্দাবন-

প্রকাশই শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবনে আবার বাল্য-পৌগণ্ডাদি বয়সে পিতামাতা এবং সখাগণ সঙ্গে বিবিধ লীলা-বিনোদ-হেতু বহু প্রকাশ থাকলেও কৈশোরলীলায় ব্রজাঙ্গনাগণ শিরমণি শ্রীশ্রীরাধারাণীর সঙ্গে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণই পরমাদ্ভুত প্রকাশ। এজন্য শ্রীশ্রীরাধামাধবের উপাসনাই সর্বোপরি।

শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের পরমৈশ্বর্যপর প্রথম শ্লোকের শ্রীশ্রীরাধামাধবপর অর্থ করে জানিয়েছেন, শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগলই শ্রীমদ্ভাগবতেরও চরম প্রতিপাদ্যতত্ত্ব।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"
(ভাঃ ১।১।১)

শ্রীল গোস্বামিপাদ কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার মর্মার্থ— শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-শক্তিস্বরূপা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা হয়েও লীলারসাস্বাদনহেতু নিত্য দেহ-ভেদ স্বীকার করেছেন। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁতে অনুরাগী। এঁদের থেকেই আদি রসের বা শৃঙ্গার উদ্ভব। এঁরা দুজন আদিরসের বিবিধ বিলাসে সুনিপুণ। এঁদের কৃপাব্যতীত কেহই এঁদের লীলাবর্ণনে সমর্থ হয় না। এঁরা কৃপাপরতন্ত্র হয়ে ভগবান্ বেদব্যাসের হৃদয়ে এঁদের লীলাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ

করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ে প্রকাশ পেলেও শ্রীরাধার বিশেষ কৃপাব্যতীত কেউই তাঁর বিষয় বর্ণনা করতে সমর্থ হয় না। কারণ তাঁর বিষয় বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে শেষাদি পর্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হন। শ্রীরাধা বেদব্যাসের প্রতি বিশেষকৃপা প্রকাশ করেছেন বলেই তিনি রাসপ্রসঙ্গে এঁদের লীলামাধুরী বর্ণনায় সক্ষম হয়েছেন। শ্রীরাধা-মাধব এমন অনির্বচনীয় আশ্চর্যস্বরূপ যে, তাঁদের সম্পর্কে তেজ, বারি, মৃত্তিকার বিপর্যয় ঘটে। অর্থাৎ তাঁদের অঙ্গদ্যুতিতে জ্যোতিষ্মান্ বস্তু হীনপ্রভ হয়, তেজোহীন বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়, নদীর জল ঊর্ধ্বগামী হয়, পাষাণ দ্রবীভূত হয়। তাঁরা সঙ্গপ্রভাবে যেমন অচেতন বস্তুর ধর্মবিপর্যয় ঘটান, তেমনি পরস্পরের অর্থাৎ নায়ক-নায়িকারও ধর্ম-বিপর্যয় ঘটান অর্থাৎ নায়কের ধর্ম নায়িকা এবং নায়িকার ধর্ম নায়কে প্রাপ্ত হন। (না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥) শ্রীকৃষ্ণ একা শ্রীরাধিকা দ্বারা নিখিল নায়িকাগত রসাস্বাদন করছেন। তিনি নিজশক্তি-যোগমায়া-প্রভাবে পরকীয়ভাবাদিহেতু লীলার সব প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করে স্বচ্ছন্দ-পরমানন্দে বিহার করেছেন। সেই শ্রীশ্রী-রাধামাধবই রসিকভক্তের ধ্যেয়। শ্রীল বেদব্যাস নিজান্তরঙ্গ শিষ্যা-নুশিষ্য শ্রীশুকদেবাদির সহিত এতাদৃশ শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ধ্যান করেছেন এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবই যে তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের চরম উপাস্যতত্ত্ব তা প্রতিপাদন করেছেন। অভীষ্টের মাধুর্য আস্বাদনের সহিত সেবারসাস্বাদনই ভক্তি-সাধনার চরম ফল। শ্রীশ্রীরাধা-

মাধব-মাধুরীর তুলনা কুত্রাপি নেই। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"গৌরশ্যামরুচোজ্জ্বলাভিরমলৈরক্ষ্ণোর্বিলাসোৎসবৈ-
র্নৃত্যন্তীভিরশেষমাদনকলা-বৈদগ্ধ্য-দিগ্ধাত্মভিঃ।
অন্যোন্য-প্রিয়তা-সুধাপরিমলস্তোমোন্মদাভিঃ সদা
রাধামাধব-মাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং মমাক্রম্যতাম্॥"

"যা গৌর-শ্যাম-কান্তিদ্বারা উজ্জ্বল, নয়নযুগলের অমল-উৎসব-বিলাসে নৃত্যশীল, অশেষ-মাদন-কলা-বৈদগ্ধীদ্বারা লিপ্তস্বরূপ এবং পরস্পরের প্রিয়তাসুধা-পরিমল-দ্বারা পরমামোদিত—সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুরীসমূহদ্বারা আমার চিত্ত সর্বতোভাবে আক্রান্ত হোক্।" তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধামাধবের মাধুরী গৌর ও শ্যামরুচিতে উজ্জ্বল, অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গের উজ্জ্বল গলিত স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণের ঘনশ্যাম দ্যুতির সান্নিধ্যে গৌর হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নবঘন কান্তি শ্রীরাধার কান্তির সান্নিধ্যে মরকত-মণির কান্তির ন্যায় অনতিশ্যামল হয়েছে। প্রিয়াসঙ্গহেতু শ্রীকৃষ্ণের বামনয়ন এবং প্রিয়সঙ্গহেতু শ্রীরাধার দক্ষিণ নয়নের বিচিত্র ভঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে উভয়ের অনির্বচনীয় রূপমাধুরী যেন

নৃত্য করছে। উভয়ের অপরূপ তনু মাদনাখ্য-মহাভাবের অশেষ বিলাস-নৈপুণ্যে পরিবৃত অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর মাদনাখ্য মহাভাব যা রতির থেকে আরম্ভ করে মহাভাব পর্যন্ত নিখিল ভাবোদ্রেক হেতু পরমানন্দনিধান, যার থেকে নিত্য অনন্তলীলা অভিব্যক্ত হয়, সেই মাদনের কলা—মাদনের অনুভাবরূপ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত অদ্ভুত লীলাসমূহদ্বারা সেই তনুযুগল মণ্ডিত। তাৎপর্য এইযে, একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই মাদনভাবের স্থিতি। মাদনভাব সর্ব-ভাবোদ্গমোল্লাসী বলে তাতে নিখিল ভক্তগত পরিকরগত ও প্রেয়সীগত ভাবের সমাবেশ আছে। সুতরাং রসিকশেখরের অনন্ত ভক্তগত অনন্ত লীলাগত রসাস্বাদন মাদনভাবের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মাদনাখ্য মহাভাবান্বিতা শ্রীরাধা এবং মাধবের মাধুরী যাঁর হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন, তাঁর সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়: এজন্য মাদনকলা-বৈদগ্ধী-দিগ্ধ শ্রীশ্রীরাধামাধব-মাধুরীর স্ফূর্তি কামনা করা হয়েছে। আবার সেই মাধুরী পরস্পর প্রিয়তারূপ সুধা বা লেপন জন্য যে পরিমল বা জনমনোহর গন্ধসমূহ তদ্দ্বারা আমোদিত। বিলাসী নায়ক-নায়িকা অঙ্গে কুঙ্কুমাদি লেপন করেন, তাঁদের অঙ্গ-সঙ্গ জন্য বিমর্দনে সেই গন্ধ বিকীর্ণ হয়, তা অন্য সখীগণকেও আমোদিত করে। তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গ পরস্পরের প্রীতির দ্বারা অনুলিপ্ত অর্থাৎ অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুমাদি যেমন নায়ক-নায়িকার রতি উদ্দীপ্ত করে, তদ্রূপ শ্রীরাধামাধবের অঙ্গে পরিব্যক্ত পরস্পরের প্রীতিচিহ্ন ( উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভি-

চারিভাব ) সমূহ তাঁদের রতি উদ্দীপ্ত করে এবং সখীগণের চিত্তকেও প্রীতিরস বাসিত করে। সুতরাং পরস্পরের প্রিয়তা-সুধা-পরিমলদ্বারা আমোদিত সেই মাধুরী তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করে, তাঁদের হৃদয়ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সুরভীতে উন্মাদিত থাকে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ বলেছেন, সেই মাধুরীসমূহদ্বারা আমার চিত্ত আক্রান্ত হোক্। কারণ এতেই সাধকের সাধ্যবস্তু নিকুঞ্জসেবা প্রাপ্তি এবং রসের পূর্ণ পর্যাপ্তি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অনর্পিতচরী মহাকরুণার অবদান মঞ্জরীভাবসাধনা অবলম্বনে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুর্যাস্বাদনের সহিত তাঁদের রহস্যময় নিকুঞ্জ-সেবা প্রাপ্তিই সাধ্যশিরোমণি বা সাধ্যের পরাকাষ্ঠা। সেই শ্রীশ্রীযুগলমাধুরীই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের উপাস্য। মহাজনগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি এদিকেই আকর্ষণ করেছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় গেয়েছেন—

"রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন-বেদীর উপর বসাব দুজন ॥

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥"

(প্রার্থনা)
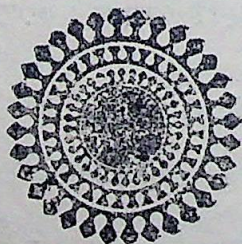
# ভক্তিতত্ত্ববিজ্ঞান

## ভক্তি কাকে বলে ?

ভক্তি কাকে বলে ? শ্রীসনকাদি ঋষিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেছেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন অমুস্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব হি নৈষ্কর্ম্ম্যম্।" 'এই শ্রীভগবানের ভজনকেই ভক্তি বলে। ঐহিক ও পারত্রিকের সর্ববিধ কামনা রহিত হয়ে মন আদি সর্বেন্দ্রিয় শ্রীভগবানে বিনিয়োগ করাই অর্থাৎ নিরন্তর তাঁর স্মৃতিময় পরমাবেশই ভজন, এই ভজনই নৈষ্কর্ম্য নামে অভিহিত হয়।' এই শ্রুতিবাক্যে ভজন ও নৈষ্কর্মের সমানাধিকরণ্য দ্বারা এই তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে যে, ভজনে প্রবৃত্ত হলেই ভক্তের নিখিল কর্মবাসনা ধ্বংস হয়ে যায় এবং গুণবৃত্তিরহিত মন শ্রীভগবানের সেবারসাস্বাদনে বিভোর থাকে।

তাপনীশ্রুতি ভক্তির স্বরূপ এবং তাতে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন—"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ 'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন স্বরূপ

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরসস্বরূপা ভক্তিযোগে প্রকাশিত হয়ে থাকেন; এখানে একসঙ্গে ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির কার্য এবং সেই ভক্তিতে যিনি বশীভূত হন, সেই শ্রীভগবানের স্বরূপও জানা গেল। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তি পরা ভবেৎ॥"

'শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়া তাকেই ভক্তি বলা হয়, এই সাধনভক্তির দ্বারা পরাভক্তি প্রেম লাভ হয়ে থাকে।' এখানে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ক্রিয়া বলতে তাঁর সুখের নিমিত্ত শ্রবণ, কীর্তনাদি কার্য বা সেবাই জানতে হবে। 'ভজ্' ধাতু ক্তিন্ প্রত্যয়ে ভক্তিপদটি নিষ্পন্ন। 'ভজ্' ধাতু সেবার্থেই প্রয়োগ দেখা যায়। "ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।" (গরুড়পুরাণ) ভগবৎসেবা কামনাব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিকের ভোগবাসনা অন্তরে নিয়ে ভজন করলেও প্রেম লাভ হয় না।

"ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা মনে যদি রয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবানের চিৎশক্তি হ্লাদিনী এবং সম্বিতের সারবৃত্তিই ভক্তি। শ্রীভগবানকে সুখী করাই হ্লাদিনীর কার্য। সুতরাং কৃষ্ণেতর কামনা অন্তরে থাকলে সেই অন্তরে ভক্তির আবির্ভাব ঘটে না। এজন্য শ্রীভগবান্ ও ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ জেনেই সাধককে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজন করতে হয়। শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষি

তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ 'ভক্তি বলতে শ্রীভগবানে পরম অনুরাগই বুঝায়।' এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ স্বপ্নেশ্বরাচার্য লিখেছেন, "অনুস্তু ন লক্ষণান্তর্গতঃ কিন্তু ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্" অর্থাৎ 'অনু' এই শব্দটি লক্ষণান্তর্গত নয়, কিন্তু ঈশ্বর ও ভক্তির স্বরূপ এবং মহিমাজ্ঞানের পশ্চাৎ তাঁর প্রতি যে আসক্তি তার নাম ভক্তি।

উল্লিখিত শ্রুতি-স্মৃতির উক্তিগুলি বিচার করে শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি শ্লোকে ভক্তির অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত শুদ্ধভক্তির পূর্ণলক্ষণটি প্রকাশ করেছেন। কি বৈধীমার্গ, কি রাগমার্গ, কি সাধনভক্তি, কি সাধ্যভক্তি, ভাব, প্রেমাদি সর্বত্রই এই লক্ষণের ব্যাপ্তি আছে। শ্লোকটি এইরূপ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

( ভঃ রঃ সিঃ—১।১।১১ )

"অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনু-কূল্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমাভক্তি বলা হয়।" শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ যেভাবে শ্লোক-টিকে ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তদনুরূপ এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী আনুকূল্যময়

অনুশীলনই ভক্তি, এটি ভক্তির স্বরূপলক্ষণ বা মুখ্য বিশেষণ। মূলশ্লোকের 'অনুশীলন' পদটি 'শীল্' ধাতুর থেকে উৎপন্ন। 'শীল্' ধাতুর অর্থ 'শীলন' এবং এই শীলনও দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তিমুলক শীলন বা চেষ্টা কায়িক বাচিক ও মানসিক। দেহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যাদি, বাক্যের দ্বারা তাঁর নাম, গুণ, লীলাদি কীর্তন এবং মন দ্বারা তদীয় রূপ, গুণ, লীলাদি চিন্তন ও অন্তরে সর্বদা প্রীতিসম্পাদন। নিবৃত্তিমূলক শীলন বলতে সেবা, নামাপরাধাদি বর্জনাত্মক চেষ্টা। 'কৃষ্ণানু-শীলন' পদে কৃষ্ণনিমিত্ত এবং কৃষ্ণসম্বন্ধী অনুশীলনই বুঝা যাচ্ছে। এখানে কৃষ্ণনিমিত্ত বলতে কৃষ্ণসেবার যে কিছু ব্যাপার এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধী অর্থে গুরুপাদাশ্রয়াদি হতে আরম্ভ করে স্থায়িভাব ও ব্যভি-চারিভাব পর্যন্ত সবই কৃষ্ণানুশীলন। এইপ্রকার কায় বাক্য ও মানসচেষ্টা যদি শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয়, তা 'ভক্তি' বলে অভিহিত হবে।

এই ভক্তি সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দ্বিবিধ। ভক্তির উপাধি দুটি একটি অন্যাভিলাষ অপরটি অন্যমিশ্রণ পূর্বোক্ত অনুশীলন যদি অন্যাভিলাষ ও অন্যমিশ্রণ রহিত হয়, তবে তাকেই বলা হবে শুদ্ধভক্তি। এখানে অন্যাভিলাষ বল্‌তে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির অভিলাষ এবং অন্যমিশ্রণ বলতে জ্ঞান-কর্মাদির আবরণ। এখানে জ্ঞান অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান এবং 'কর্ম' অর্থে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত দান-যজ্ঞাদি কর্ম। ভগবান্ এবং ভক্তিবিষয়ক জ্ঞান

এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চন, বন্দনাদি কর্ম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন বলেই জানতে হবে। ঐ অনুশীলন যদি ভুক্তি, মুক্তি-বাসনারহিত হয়ে কেবল শ্রবণ কীর্তনাদি আবেশময়ী হয়, তবেই তাকে শুদ্ধভক্তি বলা হবে। এই শুদ্ধভক্তি উত্তমা, নির্গুণা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ও স্বরূপসিদ্ধা ইত্যাদি নামেও অভিহিতা হয়ে থাকে।

এস্থলে অনুশীলনের ভক্তিমাত্র সিদ্ধির নিমিত্ত 'আনুকূল্য' এই বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে। কেননা আনুকূল্য ব্যতিরেকে কৃষ্ণানুশীলন করলেও ভক্তি হয় না। এই অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। প্রতিকূলভাবেও অনুশীলন হতে পারে, কিন্তু তাকে ভক্তি বলা হয় না। যেমন কংস, শিশুপাল, জরা-সন্ধাদিরও কৃষ্ণানুশীলন ছিল, কিন্তু তা প্রতিকূল হওয়ার জন্য ভক্তি পদবাচ্য হয় নি।

এখানে অনুকূল বলতে যদি শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি-কেই গ্রহণ করা যায় তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ আপতিত হবে। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধরসাস্বাদন ব্যাপারটি শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হলেও অসুরগণের প্রাতিকূল্যভাব থাকায় তা ভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয় নি। পক্ষান্তরে ক্ষুধাতুর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করে দুগ্ধরক্ষার্থে মাতা যশোদার গমন ব্যাপারটি শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হলেও মায়ের প্রাতিকূল্যভাব না থাকায় তাতে ভক্তিরসেরই পোষণ হয়েছে। সুতরাং আনুকূল্য বলতে প্রাতিকূল্য শূন্যতাই জানতে হবে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীনারদপঞ্চরাত্র থেকে

তাঁর কথিত এই উত্তমাভক্তি লক্ষণের প্রমাণ চয়ন করেছেন—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

'সর্বপ্রকার উপাধি পরিশূন্য, ভগবৎপরায়ণতায় নির্মল ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেই 'ভক্তি' বলা হয়।' এখানে 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং' অর্থে অন্যাভিলাষিতাশূন্য, 'তৎপরত্বেন' বলতে আনুকূল্যাত্মক, 'নির্ম্মলং' অর্থে জ্ঞানকর্মাদি অনাবৃত এবং 'সেবনং' বলতে অনুশীলন জানতে হবে।

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম ।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ।
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয় ।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এইলক্ষণ কয় ॥" ( চৈঃ চঃ )

পঞ্চরাত্রের বাণী আমরা উল্লেখ করেছি, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রী-কপিলদেবও বলেছেন—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা-মৎসেবনং জনাঃ ॥"

( ভাঃ ৩।২৯।১১—১৩ )

শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতির প্রতি বল্লেন, "মা! আমার গুণশ্রবণমাত্রেই সকলের অন্তরে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রের প্রতি গঙ্গাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্না যে মনোগতি, যা ফলাভিসন্ধান রহিতা এবং জ্ঞান-কর্মাদি ব্যবধান শূন্যা তাকেই নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ বলা হয়। আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি ( আমার সমান ঐশ্বর্য ), সারূপ্য ( আমার সমান রূপ ), সামীপ্য ( আমার নিকটে অবস্থান ) এবং সাযুজ্য ( আমার সঙ্গে একত্ব) এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করলেও গ্রহণ করেন না।" এই নির্গুণা বা শুদ্ধভক্তির ফলেই প্রেম জাত হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরূপশিক্ষায় কিরূপে এই শুদ্ধভক্তির ফলে প্রেম হয়, তা দৃষ্টান্তের সহিত সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা—ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন ।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল ।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা ।
ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যত — অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীব-হিংসন ।
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায় ।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাঢ়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন ।
তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেম ফল পাকি পড়ে - মালী আস্বাদয় ।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥
এই ত পরম ফল পরম-পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥" (চৈঃ চঃ)

## ভক্তির স্বরূপ।

দার্শনিক দৃষ্টিতে ভক্তির স্বরূপ বিচার করলে দেখা যাবে, ভক্তিতে অনুভূতি ও রস ছাড়া আর কিছুই নেই। ভক্তিতে আনন্দ আছে বলেই সাধারণ জনগণের মধ্যে ভক্তি বিষয়ে নানারূপ সংশয়ের উদয় হয়। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে (৬৫) লিখেছেন "অথ শ্রুতৌ চ—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী" তি শ্রূয়তে। তস্মাদেবং বিবিচ্যতে। যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি সা কিং লক্ষণা স্যাদিতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃতসত্ত্বময়-মায়িকানন্দরূপা, ভগবতো মায়ান-ভিভাব্যত্ব শ্রুতেঃ, স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্ব্বিশেষবাদিনামিব ভগবৎ-স্বরূপানন্দরূপা, অতিশয়ানুপপত্তেঃ। অতো নিতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা, অত্যন্ত-ক্ষুদ্রত্বাত্তস্য। ততো "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেন হ্লাদিন্যাখ্য-তদীয়-স্বরূপশক্ত্যানন্দ-রূপৈবেত্যবশিষ্যতে যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষীভবতি। যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি। অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ম্। শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী-বৃত্তির্নিত্যং ভক্ত-বৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনু-

ভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।"

শ্রুতি বলেন, 'ভক্তি ভক্তকে ভগবানের নিকট নিয়ে যান, শ্রীভগবানকে দর্শন করান, শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সাধন।' এক্ষণে বিচার্য এইযে, যে ভক্তি নিজানন্দদ্বারা আনন্দময় শ্রীভগবানকেও এই প্রকার উন্মাদিত করেন, সেই ভক্তি কি লক্ষণ বিশিষ্টা বা ভক্তির কি স্বরূপ? নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণের মতে সত্ত্বগুণময় আনন্দের থেকে আর কোন আনন্দ নেই। শ্রীজীব বলেন, ভক্তি এইরূপ প্রাকৃত সত্ত্বগুণময় আনন্দের মত নন, কারণ শ্রীভগবান্ কখনই মায়িক-গুণের অধীন হন না, একথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। আবার তিনি স্বতঃ তৃপ্ত, আত্মারাম ও আপ্তকাম প্রাকৃত গুণময় আনন্দ লাভের তাঁর প্রয়োজনই নেই।

নির্বিশেষবাদিগণের ব্রহ্মানন্দের ন্যায় ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দও নন, কারণ ব্রহ্মানুভবজনিত 'আনন্দ অপেক্ষা ভক্তিতে আনন্দের আধিক্য দৃষ্ট হয়। স্বরূপানন্দ অপেক্ষাও ভক্তিতে ভগবান্ অধিক আনন্দ প্রাপ্ত হন।

ভক্তি যে জীবের স্বরূপানন্দরূপা নন, তা'ত বলাই বাহুল্য। কারণ জীব ক্ষুদ্র বা অণু, তার স্বরূপানন্দও অণু; তদ্দ্বারা শ্রীভগবানকে উন্মাদিত করা সর্বথাই অসম্ভব। কোটি-কামধেনুপতির কখনই অজাগলস্তনে আসক্তি দেখা যায় না।

সুতরাং "হে ভগবন্; আপনার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী,

সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধশক্তি সর্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থান করছেন; মনপ্রসাদকারিণী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং তাপ ও প্রসাদ উভয়মিশ্রা রাজসী—এই ত্রিবিধশক্তি প্রাকৃত-গুণাতীত আপনাতে নেই।" এই বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুবোক্তি অনুসারে যে ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ অভূতপূর্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হন, সেই ভক্তি 'হ্লাদিনী' নাম্নী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্ত্যানন্দ-রূপাই হন, এটিই সিদ্ধান্তিত হল। এই ভক্তি সেই সেই আনন্দ অন্যকেও অনুভব করায়ে থাকেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, যে হ্লাদিনীশক্তি সর্বদা শ্রীভগবানে বিরাজ করেন, তদ্দ্বারা তাঁর আনন্দাতিশয্য কিরূপে সম্ভব হতে পারে? এর উত্তরে বলছেন, শ্রুতার্থের অন্যথার অনুপপত্তি অর্থাপত্তি-প্রমাণ সিদ্ধ বলে* সেই হ্লাদিনীরই কোন সর্বানন্দা-তিশায়িনীবৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত হয়ে 'ভগবৎপ্রীতি' নাম ধারণ পূর্বক বিরাজ করেন। অতএব সেই প্রীতি অনুভব করে শ্রীভগবানও শ্রীমদ্ভক্তগণে অতিশয় প্রীত হন। অতএব চতুর্থপক্ষই

---

* যার দ্বারা যে কার্য হয়ে থাকে, তার অভাবেও সেই কার্য-নিষ্পত্তি দেখে তার অন্যহেতু অনুমানই অর্থাপত্তি প্রমাণ। যেমন দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করে না অথচ সে স্থূল—এতে তার রাত্রিভোজন কল্পিত হচ্ছে। রাত্রিভোজন কল্পনা-অর্থাপত্তি প্রমাণ। এস্থলে যে স্থূলত্বের কথা শুনা গেল, তা 'শ্রুতার্থ' দিবা

স্বীকার্য হচ্ছে। শ্রীভগবানের 'হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তির সার-সমবেত' ভক্তিই ভগবদ্বশীকারের হেতুভূতা বলে জানতে হবে। এই ভক্তিই ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে শ্রীভগবানকে আনন্দাতিশয় প্রদান করে থাকেন। এস্থলে 'সার-সমবেত' বলতে "তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়ক তদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ" অর্থাৎ সতত ভগবন্নিত্যপরিকরগণের মধ্যে অবস্থানকারিণী ভগবৎবিষয়ে

---

ভোজনাভাবে তার অন্যথা হওয়া সঙ্গত ; কিন্তু তা ঘটে নাই, এই অন্যথা বা না ঘটা অন্যথার অনুপপত্তি। অন্যথা না হওয়ায় অর্থাপত্তি-প্রমাণ—রাত্রিভোজন কল্পনা স্বীকৃত হল।

তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীদ্বারায় তাঁর আনন্দাতিশয্যের অসম্ভাবনা থাকলেও আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন হওয়ায় তাতে অর্থাপত্তি প্রমাণের কার্য দেখা যাচ্ছে। হ্লাদিনী-শক্তিব্যতীত কেউই তাঁকে আনন্দ দিতে পারে না, অথচ হ্লাদিনী দ্বারায় যে আনন্দপ্রাপ্তি অসম্ভব, তা তিনি পাচ্ছেন। সুতরাং এই আনন্দপ্রাপ্তির অন্য কারণ স্বীকার করতে হচ্ছে। সে কারণ আর কিছুই নয়, দেবদত্তের রাত্রিভোজনের ন্যায় সেই হ্লাদিনী-শক্তিই অন্যরূপে তাঁকে প্রচুর আনন্দদান করেন অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা এটি নিষ্পন্ন হচ্ছে। সেই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী যখন ভক্ত-সহযোগে অভিব্যক্তি-বিশেষ লাভ করেন, তখন তা যে ভগবানের শক্তি, তাঁকে পর্যন্ত অধিকতর আনন্দদানে মুগ্ধ করে থাকেন।

অনুকূল অভিলাষ বিশেষই 'ভক্তি'। এই ভক্তি মন্দাকিনীপ্রবাহের ন্যায় নিত্যপরিকরগণের থেকে ভক্তপরম্পরায় ( গুরুপরম্পরাক্রমে ) প্রপঞ্চে অবতরণ করে থাকেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, ভক্তি যদি চিন্ময়ী, হ্লাদিনী ও সম্বিতের সারবৃত্তিই হন, তবে জড়-প্রতিযোগী স্বয়ং ভগবদনুভবময়ী এবং পরমানন্দস্বরূপা হয়ে কিরূপে এই মায়িক বিশ্বে জীবের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেন ; এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, ভক্তি প্রথমতঃ অহৈতুকী মহৎকৃপা বাহনা হয়েই জীবের অজ্ঞাতসারে তার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। পরে তার হৃদয়ভূমি কর্ষণ করে ভগবদ্বিষয়ে অনুকূল-অভিলাষময় ভক্তিকল্পলতার বীজবপনের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করেন। স্নেহময়ী জননী যেমন ধূলি-ধূসরিত সন্তানকে কোলে নিয়ে নিজ অঞ্চলদ্বারা শিশুর দেহের ধূলো কাদা পরিষ্কার করে তাকে স্তন্যদান করেন ; কল্যাণময়ী ভক্তিদেবীও তদ্রূপ প্রথমেই বহির্মুখ জীবের ভগবদ্বিষয়ে সংশয়, কামনা-বাসনাদি মল দূরীভূত করে পরে ভজনবিষয়ে অনুকূল-অভিলাষময় ভক্তিকল্পলতার বীজরূপে স্বয়ংই ক্রিয়াশীলা হয়ে থাকেন। পরে তার কল্যাণোপযোগী দৃঢ়বিশ্বাস ও ভজনীয়তত্ত্বের অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও মায়িক বিষয়ে অরুচি জাগিয়ে থাকেন। এইরূপে চিত্তের সম্প্রসারণ হলে সেই ভক্ত মনে করেন যে, আমার বিষয়াসক্তি নষ্ট হোক্ বা বর্দ্ধিত হোক্, ভজনে শত শত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হোক্, আমি কিছুতেই

ভক্তিপথ ত্যাগ করব না।' এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত ভজন করতে করতে ক্রমশঃ অপরাধাদি অনর্থের অপগমে রতি ও প্রেমলাভে ধন্য হয়ে থাকেন।

## ভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব।

প্রেমই জীবের পরম অভীষ্ট সম্পদ্। ভক্তিই সেই অভীষ্ট বস্তুর প্রাপক সাধন বিশেষ। এজন্য সাধনভক্তিকেই জীবের অভিধেয়তত্ত্ব বলা হয়। ভক্তিব্যতীত কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি কোন সাধনাতেই ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় না। এবিষয়ে একমাত্র ভক্তিরই উপজীব্যতা। "জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ। কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস॥" ( চৈঃ চঃ ) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

'হে উদ্ধব! মদ্‌বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমায় যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, সাঙ্খ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং ত্যাগ বা সন্ন্যাসও সেরূপ পারে না।' "কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখ নিরীক্ষক—কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥" (চৈঃ চঃ) ভক্তিই প্রধান ও একমাত্র অভিধেয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিই জীবের একমাত্র সাধন। সকল জীবের সকল প্রকার

ভক্তিই সমর্থা। শাস্ত্র ও মহাজনগণ এজন্যই ভক্তিকে পরমধর্ম, পরম যোগ ও পরম শ্রেয়ঃ বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীব্রহ্মা ধীরস্থিরচিত্তে সমগ্র বেদকে তিনবার বিচার করে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভগবদ্ভক্তিই সমগ্র বেদের তাৎপর্য। কেবল তাই নয়. ভক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ। ভক্তি-সাধনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, ইহা সার্বজনীন পন্থা। যে কোন ব্যক্তি, যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায় হরিভজন করতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে দেখা যায়—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥"

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রতি বল্লেন, 'হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি আমার প্রেমরূপ রহস্যতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক, সে যে সাধনায় অন্বয় ও ব্যতিরেক আছে এবং সার্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব আছে, শ্রীগুরুচরণ-নিকটে সেই ভক্তিসাধনার কথাই জিজ্ঞাসা করবেন।' 'শ্রীভগবান্ এইশ্লোকে সাধনভক্তিই যে জীবের অভিধেয়তত্ত্ব তা প্রতিপাদন করেছেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনায় তত্তৎ সাধনাধিকারীর জন্য অন্বয় অর্থাৎ বিধি আছে বটে কিন্তু ব্যতিরেক অর্থাৎ ঐ সাধন না করলে যে জীবের প্রত্যবায় হবে তা কোথাও বর্ণন নাই। বরং স্থানে স্থানে তত্তৎ সাধনার নিন্দাবাক্য শুনা যায়। ভক্তিসাধনার বিধিবাক্য যেমন নিখিল শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্যতিরেকও দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈ র্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

(ভঃ।১১।৫।২-৩)

শ্রীচমস যোগীন্দ্র মহারাজ নিমির প্রতি বল্লেন, 'হে রাজন্! শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হতে যথাক্রমে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজঃ সত্ত্বগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমো গুণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্র—এই চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। তদ্রূপ তাঁর জঘন থেকে গার্হস্থ্য, হৃদয় হতে ব্রহ্মচর্য, বক্ষঃস্থল হতে বাণপ্রস্থ এবং মস্তক হতে সন্ন্যাস এই চারটি আশ্রমেরও উৎপত্তি হয়েছে। এই চারবর্ণ ও চার আশ্রমের মধ্যে যারা নিজ জনক-পুরুষ শ্রীহরির ভজন করে না কিন্তু অবজ্ঞাই করে থাকে, তারা নিজ নিজ স্থান থেকে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হয়ে থাকে!" শ্রীগীতা-তেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলেছেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

'হে অর্জুন! দুষ্কৃতি, মূঢ়, মায়ায় বিলুপ্তবুদ্ধি আসুরভাবাপন্ন নরাধমগণ আমার শরণাপন্ন হয় না।' এইরূপ ভক্তিহীনজনের বহু দুর্গতির কথা জানা যায়। অথচ কোন শাস্ত্রে কুত্রাপি ভক্তির নিন্দাবাক্য শোনা যায় না।

ভক্তিসাধনার সার্বত্রিকতায় বলা হয়েছে সর্বশাস্ত্রে, সর্বকর্তায়, সর্বদেশে, সর্বকরণে, সর্বদ্রব্যে, সর্বক্রিয়ায়, সর্বকার্যে, সর্বফলে ভক্তিসাধনার ব্যাপ্তি দেখা যায়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণো সদা ॥"

"সর্বশাস্ত্র আলোচনা করে এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করে এই সুনিষ্পন্ন হল যে, সর্বদা শ্রীনারায়ণই ধ্যেয়।" সব কর্তাই যে হরিভজনের অধিকারী সে বিষয়ে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের প্রতি বলেছেন—

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুত-ক্রম-পরায়ণশীলশিক্ষা-
তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥"

( ভাঃ ২।৭।৪৬ )

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর প্রভৃতি পাপপরায়ণ জীবগণও যদি অদ্ভুত পরাক্রম শ্রীহরি যাঁদের একমাত্র আশ্রয়, সেই ভগবদ্ভক্তগণের স্বভাব অনুশীলন করতে পারেন, তা হলে তাঁরাও শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানতে ও তাঁর মায়া অতিক্রম করতে সমর্থ হন। এমন কি তির্যক্ জাতিও ভক্তসঙ্গে যদি তাঁদের আচার ও স্বভাবের অনুসরণ করতে পারে, তারাও ভগবত্তত্ত্ব জানতে ও মায়া উত্তীর্ণ

হতে পারে। তা হলে যে সব মনুষ্য শ্রীগুরুমুখ থেকে শ্রীভগবানের নাম জপ প্রভৃতি শ্রবণ করে তার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি করেন, তাঁরা যে ভগবত্তত্ত্ব জানবেন ও মায়া উত্তীর্ণ হবেন, এতে সংশয়ের অবকাশ কোথায় ?"

ভক্তি এরূপ এক সার্বজনীন পন্থা যে, কি দুরাচার কি সদাচার, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, কি বিরক্ত কি অনুরক্ত, কি মুমুক্ষু কি মুক্ত, কি ভক্তি অসিদ্ধ কি ভক্তিসিদ্ধ, কি প্রাপ্ত পার্ষদ দেহ কি নিত্যপার্ষদ—ভক্তি সকলেরই কল্যাণকারিণী ও পরমানন্দদায়িনী। ভক্তির এই সার্বজনীন পথে চল্‌তে কারও কোন বাধা নেই। সুতরাং ভক্তিপথ নিঃশঙ্কচিত্তে সকলেরই অবলম্বনীয়। দুরাচারী জনও যে ভক্তির আশ্রয়ে পরমাশান্তি লাভ করে থাকেন, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতে তা স্বয়ং বলেছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

(গীতা- ৯।৩০-৩১)

"হে অর্জুন! সুদুরাচারব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তবে তুমি তাকে সাধু বলেই মনে করবে। কারণ সে ব্যক্তি ভক্তির প্রভাবে অতি দ্রুত ধর্মাত্মা হয়ে শাশ্বতী শান্তি লাভ করবে। হে কৌন্তেয়! এ বিষয়ে বিবদমান সভাতে গিয়ে

তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করতে পার যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।" যদি দুরাচারী ব্যক্তিও ভক্তির প্রভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারে, তবে সদাচারী ব্যক্তি যে পরমকল্যাণ লাভ করবেন, তাতে আর সংশয় কি আছে!

শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলেছেন—"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ" (ভাঃ ১১।১১।৩৩) 'হে উদ্ধব! যারা দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্ন,সর্বাত্মা, সচ্চিদানন্দাদিরূপে আমায় জেনেই হোক্ অথবা না জেনেই হোক্ অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তাদিগে আমি ভক্ততম বলেই মনে করি।' এইপ্রমাণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ব্যক্তি-তেই ভক্তিরবৃত্তি দেখান হয়েছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও যে ভক্তির অধি-কারী তা শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে—"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈ-র্নাভিভূয়তে॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৮) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বল্লেন, 'হে উদ্ধব! আমার ভক্ত ভক্তিপ্রারম্ভে বিষয় কর্তৃক বাধ্যমান্ হয়েও সমর্থা ভক্তির প্রভাবে প্রায়শঃ বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না।' অতএব বিষয়-বিরক্তজন যে ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হবেন না, তাত বলাই বাহুল্য। মুমুক্ষু ও মুক্তপুরুষে যে ভক্তির বৃত্তি আছে, তাও শ্রীভাগবতের বাণী থেকে জানা যায়, "মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥" শ্রীসূতমুনি বল্লেন, 'হে শৌনক! যাঁরা

অবিদ্যাবন্ধন থেকে মুক্তি ইচ্ছা করেন, সেই মুক্তিকামী মানবগণ ঘোরমূর্তি ভৈরবাদিকে পরিত্যাগ করে শান্তমূর্তি শ্রীনারায়ণের কলাসমূহের উপাসনা করে থাকেন।' মুক্তগণের হরিভজনের কথা শ্রীসূতমুনিই বলেছেন, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতো গুণো হরিঃ ॥" (ভাঃ ১।৭।১০) 'হে শৌনক! অহঙ্কাররূপ চিৎ-জড়ের গ্রন্থি থেকে নির্মুক্ত আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন।'

ভক্তিতে অসিদ্ধ অর্থাৎ অজাতরতি এবং ভক্তিসিদ্ধ অর্থাৎ জাতরতি উভয়বিধ সাধকে ভক্তির বৃত্তি আছে যথা, "কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥" (ভাঃ ৬।১।১৫) শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বল্লেন, 'হে রাজন্! বাসুদেব পরায়ণ কোন কোন মহানুভবগণ কেবলাভক্তির প্রভাবে ভাস্কর যেমন কুজ্ঝটিকা বিনাশ করে তদ্রূপ নিখিল পাপরাশি নাশ করে থাকেন।' এই প্রমাণে অজাতরতি ভক্তে ভক্তির বৃত্তি দেখান হল। তদ্রূপ জাতরতি ভক্তেও ভক্তির বৃত্তি দেখান হয়েছে যথা—"ত্রিভুবনবিভবহেতবে-হপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ। ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দাল্লবনিমেষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥" (ভাঃ ১১।২।৫৩) শ্রীহরি যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে বল্লেন, 'হে রাজন্! ত্রিভুবনের বৈভব প্রাপ্তির সম্ভাবনাতেও শ্রীহরিপরায়ণ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও

অন্বেষণীয় ভগবৎ-পাদপদ্ম থেকে যাঁর মন লবনিমেষার্ধকালের জন্যও বিচলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' প্রাপ্ত-পার্ষদদেহ ভক্তগণে ভক্তির বৃত্তি দৃষ্ট হয়—"মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কাল-বিপ্লুতম্ ॥" (ভাঃ ৯।৪৬।৭) শ্রীমন্নারায়ণ ঋষিপ্রবর দুর্বাসাকে বল্লেন, 'হে মুনে! আমার নিষ্কাম ভক্তগণ আমার ভক্তির প্রভাবে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য নামক মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হলেও গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাঁরা সতত আমার সেবানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। তাঁরা যখন পরমানন্দস্বরূপ মুক্তিরই আকাঙ্খা করেন না, তখন কাল-বিনষ্ট পদার্থের প্রতি যে তাঁদের আকাঙ্খা জন্মে না তা বলাই বহুল্য।' নিত্যপার্ষদগণে ভক্তির বৃত্তি যথা "বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলা-মৃতাপ্সু প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্। অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ॥" (ভাঃ ৩।১৫।২২) শ্রীব্রহ্মা দেবগণের প্রতি বল্লেন, 'হে দেবগণ! যে বৈকুণ্ঠের সরোবর সকলের জল অতি নির্মল ও অমৃততুল্য স্বাদু এবং তটসকল প্রবালমণিময়; লক্ষ্মীদেবী সেই তটের নিকটবর্তি নিজবনে উপবেশন করে দাসীগণের সহিত তুলসী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করছেন এবং তৎকালে সরোবর-জলে প্রতিবিম্বিত নিজ সুকুঞ্চিত সুন্দর কুন্তলাবলী ও উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত শ্রীমুখ অবলোকন করে মনে করছেন, 'শ্রীনারায়ণ আমার মুখ চুম্বন করছেন।"

এই বাক্যে নিত্যসিদ্ধা লক্ষ্মীদেবীরও ভক্তির সংবাদ পাওয়া যায়।

সর্বকরণে অর্থাৎ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে ভক্তির বৃত্তি যথা—"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরেঽবাঙ্‌মনসা গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥" অর্থাৎ আনন্দের সহিত মানসোপচারে শ্রীহরির অর্চনা করে মহাভাগ্যবান্ মানবগণ অবাঙ্মনসগোচর সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করেছেন' ইত্যাদি প্রমাণে অন্তঃকরণ দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনার সংবাদ পাওয়া যায়। বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা ত প্রসিদ্ধই আছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবাকেই ভক্তি বলা হয়েছে। সর্বদ্রব্যদ্বারাও ভক্তের ভজন হয়ে থাকে। শ্রীগীতাতে বলেছেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" 'হে অর্জুন! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমায় পত্র, পুষ্প, ফল, জল, প্রদান করে থাকে, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপূর্বক সমর্পিত উপহার ভোজন করে থাকি।' সর্বক্রিয়াদ্বারাও ভক্তি নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, দেবর্ষিনারদ শ্রীবসুদেবের প্রতি বলেছেন—"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুণাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি।" (ভাঃ ১১।২।১২) 'হে বসুদেব! ভাগবতধর্ম শ্রবণ করলে, পাঠ করলে, ধ্যান করলে, আদর করলে, এমনকি ভাগবতধর্মানুষ্ঠান অনুমোদন করলেও বিশ্বদ্রোহীজনকেও ইহা সদ্যই পবিত্র করে থাকে।' সর্বক্রিয়ায় ভক্তির বৃত্তি যথা—"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (গীতা—৯।২৭) শ্রীভগবান্ বল্লেন, 'হে অর্জুন! তুমি যা কিছু কর্ম কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর, যা কিছু তপস্যা কর তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও।'

এমন কি, ভক্তির আভাসে এবং ভক্তির আভাস অথচ অপরাধ এমন ক্রিয়াতেও ফলপ্রাপ্তি অজামিল, মুষিকাদিতে দেখা যায়। অজামিল মৃত্যুকালে যমদূতের দর্শনে ভীত হয়ে নিজপুত্র নারায়ণকে প্লুতস্বরে আহ্বান করে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন, একথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে। একটি পৌরাণিকী আখ্যান—একটি মুষিক শ্রীভগবন্মন্দিরে বাস করত। প্রতিদিন শ্রীভগবানের আরাত্রিকের ঘৃতযুক্ত তুলার বাতি মুখে করে নিয়ে যেত। একদিন তুলার বাতি মুখে করে নিয়ে যাবার কালে জ্বলিত প্রদীপে সেই বাতির অগ্রভাগটি স্পর্শ হওয়ায় তা জ্বলে উঠল। তখন মুখে আগুনের তাপ লাগায় সে তা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু বাতির তুলো তার দাঁতে জড়িয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিতে পারল না। সে শ্রীমূর্তির সম্মুখে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাতে শ্রীমূর্তির আরাত্রিকের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হল। পরজন্মে সে কোন রাজমহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করে বহু প্রদীপবর্তিকার উৎসব করে ভগবৎপ্রসন্নতার ফলে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল। এস্থলে মুষিকের শ্রীভগবানের আরাত্রিকটি ভক্তির আভাস, আবার দীপবর্তি হরণরূপ অপরাধও আছে। তথাপি শ্রীভগবান তার অপরাধের দিকে না তাকিয়ে

দীপ প্রদানরূপ ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে তাকে নিজধাম প্রাপ্ত করায়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় ভক্তিদেবী সর্বপ্রকার ফলদানেই সমর্থা সুতরাং সর্বফলে ভক্তির অনুবৃত্তি আছে যথা—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" (ভাঃ ২।৩।১০) 'যিনি অকাম অর্থাৎ ভগবৎ সেবা ব্যতীত যাঁর অন্যকিছু কামনা নাই, যিনি সর্বকাম অর্থাৎ নিখিল ভোগ্যবস্তুই পেতে ইচ্ছা করেন, আর যিনি মোক্ষকাম অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য যাঁর অভিলাষ—এঁরা উদারবুদ্ধি সম্পন্ন হলে সকলেরই শ্রীহরির ভজন করা কর্তব্য। ভক্তি সকল যুগেরই পরম উপাসনা—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" 'সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায়, দ্বাপরে তাঁর অর্চনদ্বারা যে ফললাভ হত; কলিযুগে কেবল হরিকীর্তন দ্বারাই সে সমস্ত ফললাভ হয়ে থাকে।' এতদ্দ্বারা সবযুগেই ভক্তির অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। সকল অবস্থাতেও ভক্তির অনুবৃত্তি হয়ে থাকে যথা—মাতৃগর্ভে প্রহ্লাদ, বাল্যে ধ্রুব, যৌবনে অম্বরীষ, ভরতাদি, বার্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্র, মৃত্যুকালে অজামিল ভজন করে পরম কল্যাণ লাভ করেছেন; শ্রীমদ্ভাগবত দৃষ্টে তা জানা যায়। স্বর্গে চিত্রকেতু শ্রীহরির ভজন করেছেন, নরকেও নামভজন করে ভগবৎপ্রাপ্তির কথা নৃসিংহপুরাণে বর্ণিত আছে। এইপ্রকার সার্ব-

ত্রিকতা এবং সদাতনত্ব আছে বলেই অতি ব্যাপক ভক্তিসাধনই জীবের অভিধেয়তত্ত্ব।

## ভক্তির অধিকারী।

এই ভক্তিমার্গে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকারিতা নির্ণীত হয়েছে। এই সার্বভৌম ভক্তিসাধনায় দেশ, কাল, পাত্রাদির অপেক্ষা না থাকলেও শুদ্ধভক্তির অধিকার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বলেছেন—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" (ভাঃ ১১।২০।৮) 'যদৃচ্ছাক্রমে যে ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জাত হয়, তাকেই ভক্তিযোগের অধিকারী বলে জানবে।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃতনিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবৎভক্তসঙ্গ-তৎকৃপা-জাতমঙ্গলোদয়েন।" অর্থাৎ ভক্তির অধিকার নিরূপণে শ্রীভগবান্ কর্মাদির ন্যায় বর্ণাশ্রমাদির অধিকার নিয়মকে অতিক্রম করে ভক্তিযোগে একমাত্র যে শ্রদ্ধাই হেতু, তাই এইশ্লোকে বলেছেন। 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের অর্থ—কোন পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ এবং তাঁর কৃপাজাতমঙ্গলোদয়ের ফলে। ভক্তসঙ্গ এবং ভক্তকৃপাই শ্রদ্ধা জাত হওয়ার একমাত্র হেতু। শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি বলেছেন, "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ॥" (ভাঃ ১।২।১৬) 'হে বিপ্রগণ! পবিত্রতীর্থের নিষেবণ করলে প্রায়শঃ মহদ্‌গণের সেবার

প্রবৃত্তি জাত হয়, সেই সেবা থেকে শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণেচ্ছুজনের শ্রীভগবানের কথায় রুচির উদয় হয়ে থাকে।' এইশ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, "কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্রভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শন-স্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বতএব সম্পদ্যতে; তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি; তদীয়স্বাভাবিকপরস্পরভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তৎশৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে; তচ্ছ্রবণেন তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি।" অর্থাৎ 'কার্যান্তরের উদ্দেশ্যেও যাঁরা শ্রীবৃন্দাবনাদি পবিত্রতীর্থে ভ্রমণ করেন, তীর্থসেবনোদ্দেশ্যে তথায় সমাগত অথবা সেই তীর্থেই বসবাসকারী মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপ সেবা তাঁদের স্বতঃই সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেই মহাপুরুষগণের দর্শন স্পর্শাদি প্রভাবে তাঁদের আচরণে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মে থাকে। সেই মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ পরস্পর ভগবৎ কথাতে 'এঁরা কি বলছেন শ্রবণ করি' এরূপ ইচ্ছাও জাত হয়। সেই মহাপুরুষগণের শ্রীমুখ থেকে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করলে তাতে রুচির আবির্ভাব হয়ে থাকে।' এইপ্রকার মহৎসঙ্গ ও মহৎকৃপার ফলেই শ্রদ্ধা জাত হয়। ভগবদ্ভজনে এই শ্রদ্ধা মাত্রেরই অধিকারিত্ব হেতুতা নিরূপিত হয়েছে।

## শ্রদ্ধা কাকে বলে?

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥" ( চৈঃচঃ )

ভক্তিশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি, শাস্ত্রার্থে নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি, যত্নের সহিত তদর্থ অনুভবের চেষ্টা এবং সমাধানাত্মক যুক্তি। এইভাবে শাস্ত্রার্থ অবধারণ করলে ভগবদ্ভজনব্যতীত জীবন ব্যর্থ মনে হবে। বর্ণাশ্রমাদি নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং অননুষ্ঠানে নরকপ্রাপ্তি প্রভৃতি দোষ অবগত হয়েও যিনি বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল ধর্মাদি আমার ভজন-পথের বিঘ্নস্বরূপ ; একমাত্র কৃষ্ণভক্তি করলেই সব কৃত হয়ে থাকে, এইরূপ নিশ্চয় পূর্বক সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে শ্রীহরি-ভজনে প্রবৃত্তিই শ্রদ্ধার কার্য।

শ্রদ্ধা—শ্রৎ+ধা+অঙ্, শ্রৎ—হৃদয়, ধা—ধারণ করা বা স্থাপন করা। অতএব শ্রদ্ধার অর্থ সর্বান্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস—শাস্ত্রবিশ্বাস—শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শ্রুতি বলেন—"যদা বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।" (ছাঃ ৭।১৯।১) অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই পুরুষ সেই বিষয় মনন করে এবং শ্রদ্ধাবানই তা হৃদয়ে ধারণ করতে পারে, অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি কখনই পারে না। অতএব হে নারদ! প্রথমে শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধা কি তাই বিশেষভাবে জানার চেষ্টা কর। শ্রীনারদ বল্লেন, আমি সেই শ্রদ্ধার বিষয়ই বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি। এই শ্রদ্ধার অস্তিত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তা কথিত হচ্ছে—"শ্রদ্ধাত্বন্যোপাধিবর্জ্জ্যং

ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।" (আম্নায়সূত্র) অর্থাৎ 'অন্য উপায় বর্জনাত্মক ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা।' অতএব শ্রদ্ধালুব্যক্তির ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে থাকে। সুতরাং কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও ব্যবহারে অকার্পণ্যও (যথালাভে সন্তোষ) শ্রদ্ধার লক্ষণ জানতে হবে।

আবার শ্রদ্ধা জাত হলে ভগবৎশরণাগতিরও উদয় হয়ে থাকে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলেন, "শ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈকার্থং লভ্যতে, তচ্চ যুক্তম্। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তেরেব লিঙ্গমিতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ—১৭৩ অনুঃ) অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও শরণাগতি উভয়ের একার্থতা লাভ হচ্ছে। তা যুক্তিযুক্তই, কারণ শ্রদ্ধার অর্থ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস এবং শাস্ত্রও শ্রীভগবানের চরণে অশরণাগতের ভয় এবং শরণাগতের অভয় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং শ্রদ্ধা জাত হলে শরণাগতি হবে তার চিহ্ন। তারপরই শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা জাত হলে ভজনে সিদ্ধি হোক্ বা না হোক্ স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সুর (যারা রাসায়ণিক প্রক্রিয়াযোগে স্বর্ণসিদ্ধি বিষয়ে লুব্ধ) ন্যায় সতত ভজনানুবৃত্তি প্রকাশ পাবে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির আশা তাদের অন্তরে থাকবে না। বুদ্ধি পূর্বক মহদবজ্ঞাদি অপরাধ প্রকাশ

পাবে না। বিষয়ত্যাগে অসমর্থ হলেও বিষয়ে আসক্তি থাকবে না। জাতশ্রদ্ধব্যক্তির কখনই দুরাচারিত্ব প্রকাশ পাবে না।

জীবের ভক্তিমার্গে যাতে আদর যত্ন হয়, এটিই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। কারণ "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।" (চৈঃ চঃ) যত্নাগ্রহের অভাব হলে সাধনভক্তি প্রেমোৎপাদন করতে পারে না। অযোগ্য সন্তানকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করে তাকে সম্পত্তি দিতেই অধিকতর আনন্দ হয় এটি স্বাভাবিক। শ্রীহরি স্ববিষয়ক শ্রদ্ধা দেখেই ভক্তি দান করেন এটিই ভগবৎ স্নেহের প্রতিফলন। শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে ভক্তির অধিকারেরও তারতম্য হয়। শ্রদ্ধাবান্ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তিন প্রকার।

উত্তম অধিকারী—যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে সুনিপুণ; উপাস্যতত্ত্ববিচারে, সাধনতত্ত্ব বিচারে, পুরুষার্থ বিচারের দ্বারা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য, ভক্তিই সাধন ও প্রেমই পুরুষার্থ ইহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হয়ে গাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছেন —তিনিই উত্তম অধিকারী। "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥" (চৈঃ চঃ) মধ্যম অধিকারী—যিনি শাস্ত্রবিচারে বা যুক্তিতে তাদৃশ অভিজ্ঞ নন। বিচারকালে বলবতী বাধা উপস্থিত হলে সিদ্ধান্ত করতে তথা দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করতে সক্ষম হন না; কিন্তু নিজে দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত বলে উপাস্য ও উপাসনা বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ

থাকে। "শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥" (চৈঃ চঃ) কনিষ্ঠ অধিকারী—যাঁর শাস্ত্র-জ্ঞান অতি সামান্য এবং বিশ্বাসও অতি কোমল, শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা উহা খণ্ডন করা যায়। "যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥" (ঐ)

## ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় নয়প্রকার ভজনাঙ্গের কথা বলেছেন—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে ভজনের বহু অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ভক্তি-অঙ্গগুলি যাতে সকলের পক্ষে সহজ ও সুখবোধ্য হতে পারে, এজন্য তা চতুঃষষ্টি অঙ্গে বিবৃত করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম বিংশতি অঙ্গ ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। দশটি গ্রহনা-ত্মক ও দশটি বর্জনাত্মক।

(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়—সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ব্যতীত ভজনারম্ভই হয় না। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ব্যতীত যদি কারও ভক্তিপথে কিঞ্চিৎ অগ্রগতি দেখা যায় তবে অনুমান করতে হবে যে, তিনি পূর্বজন্মে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করে ভজনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রগতি লাভ করেছিলেন

অতএব শ্রদ্ধালুব্যক্তি সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করে ভজন-শিক্ষা করবেন। শ্রীগুরুদেব কৃপা-

পূর্বক সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সদাচারাদি শিক্ষাদ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করে ভগবদ্বস্তু দেখায়ে তাকে ধন্য করে থাকেন। পক্ষান্তরে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়বিহীন ব্যক্তির দুর্দশার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবে (১০৮৭।৩৩) দৃষ্ট হয়—

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥"

এই শ্লোকের সারমর্ম এইরূপ যে, যারা গুরুচরণাশ্রয় পরিত্যাগ করে অতি চঞ্চল মনরূপ অশ্বকে ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু দ্বারা সংযমিত করতে চেষ্টা করে তারা সেই সেই উপায়সমূহদ্বারাই খেদ প্রাপ্ত হয়। তারা শত শত প্রকারে বিপদ্‌গ্রস্থ হয়ে এই সংসারেই বাস করে। সমুদ্রে নাবিকহীন বণিকের যেমন বিপদ্ হয়, তারা সেইরূপ বিপদ্‌গ্রস্থ হয়ে থাকে জানতে হবে। শ্রীগুরুচরণপ্রদর্শিত ভগবদ্ভজনদ্বারা ভগবদ্ধর্মজ্ঞান লাভ হলে গুরুকৃপাপ্রভাবে বিপদ্ দ্বারা অভিভূত না হয়ে মন শীঘ্রই নিশ্চল হয়ে থাকে—ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কৃপাতিশয় প্রকাশ করেন, তা সাক্ষাদ্‌রূপেও করেন না। যে ভগবান্ এ জগতে ব্যষ্টিগত ভক্তাবতাররূপে শ্রীগুরুস্বরূপে বিরাজমান, তিনিই প্রপঞ্চাতীত নিত্যধামে সমষ্টিরূপে শ্রীভগবানের বামদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপে শ্রী-

গুরুরূপ হয়ে বিরাজমান আছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও কৃপাতিশয় বিস্তার করে নিজেকে জাগিয়ে দিচ্ছেন। শ্রুতিও এই কথা বলেন, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ( ছান্দোগ্য ) অর্থাৎ 'যে পুরুষ আচার্যের চরণাশ্রয় করেন, তিনিই ভগবানকে জানতে পারেন।'

(২) শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ—শ্রীগুরুর নিকট থেকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে ভাগবতধর্ম শিক্ষা করতে হবে। যাতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং পাতকরাশির ক্ষয় হয়, তারই নাম 'দীক্ষা'। 'দিব্যজ্ঞান' বলতে দীক্ষামন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞান এবং শ্রীভগবানের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধবিশেষ জ্ঞান।

দীক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রে যে সব মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই প্রধান। শ্রীকৃষ্ণেরও আবার শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা এই ত্রিবিধ লীলার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপলীলায় যে অসীম মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে, সেই ব্রজলীলার মন্ত্রসমূহই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যেও আবার পরমমাধুর্যময় মধুররসের লীলাবলীর সংঘটক দশাক্ষর এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ বা মন্ত্ররাজ। বিধানানুসারে পারদ-সংযোগের দ্বারা কাংস্য যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিধিমতে দীক্ষাগ্রহণ দ্বারা জড়দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ হয়।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি )

দীক্ষাগ্রহণান্তর শ্রীগুরু-সন্নিধানে শ্রীভাগবতধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন—

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

( ভাঃ ১১।৩।২২ )

'গুরুরেবাত্মা জীবনং দৈবতং নিজেষ্টদৈবততয়াভিমতশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্। অমায়য়া নির্দম্ভয়া অনুবৃত্ত্যা তদনুগত্যা শিক্ষেৎ।' ( টীকা—শ্রীজীবপাদ ) অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে নিজ জীবনস্বরূপ এবং নিজ ইষ্টদেবতা বুদ্ধি পোষণ করে দম্ভরহিত হয়ে শ্রীগুরুর আনুগত্য সহকারে ভাগবতধর্ম শিক্ষা করবে। এই ভাগবতধর্ম শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীগুরুর সন্নিধানে গমন পূর্বক সাধকের প্রতি আত্মপ্রদ হরি যাতে সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তির সহিত শ্রীগুরুসেবা করবে।

(৩) শ্রীগুর সেবা—শ্রীগুরুদেবকে নিজের হিতকারী পরম বান্ধব ও পরমারাধ্য শ্রীহরিস্বরূপ জ্ঞানে আদর, যত্ন ও বিশ্বাস সহকারে তাঁর সেবা। শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হতে পারে না। শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি জন্মিলে সাধকের সবই নিষ্ফল হয়ে থাকে।

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥"
(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

অর্থাৎ 'জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাদ্ ভগবৎস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি 'ইনি মনুষ্য' এরূপ অসদ্বুদ্ধি পোষণ করে, হস্তীস্নানের ন্যায় তার সবই নিষ্ফল হয়ে থাকে।' শ্রীগুরুর প্রসাদদ্বারা শ্রীহরির পরমপ্রসাদ সুসিদ্ধ হয় বলে পরমপ্রযত্নে শ্রীগুরুর সেবা করা প্রয়োজন।

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥"

অর্থাৎ 'যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু এবং যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। শ্রীগুরু যাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, স্বয়ং হরিও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন।' 'তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ' এজন্য সর্ববিধপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে সেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবকেই প্রসন্ন করতে হবে।*

(৪) সাধুমার্গানুগমন - সাধুগণ যে পথে গমন করে শ্রীহরিভক্তি লাভ করেছেন, সেই পথে তাঁদের পদাঙ্কানুসরণে গমনের নামই সাধুমার্গানুগমন। এর প্রমাণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধৃত স্কন্দপুরাণ বচন—

---

* এই তিনটি অঙ্গসম্বন্ধে 'শ্রীগুরুতত্ত্ববিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।

"স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতঃ ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥"

"পরিশ্রমব্যতিরেকে পূর্বতন মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করে শ্রীহরিভক্তি লাভ করেছেন, সর্বসন্তাপবর্জিত মঙ্গলের নিদান সেই পন্থারই অনুসরণ করা কর্তব্য।" শ্রীবেদব্যাসের বাণী—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ ধর্মের তত্ত্ব অতি নিগূঢ় বলে মহাজনগণ যে পথে গমন করে কল্যাণ লাভ করেছেন, সেই পথই অনুসরণীয়। মহাজনগণের আচরণ শাস্ত্রবিধির দৃঢ়-ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য তারপরই শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীব্রহ্মযামলের উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতয়ৈব কল্পতে ॥"

'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিধিকে উপেক্ষা করে যদি কেউ ঐকান্তিকী ভক্তির অনুষ্ঠান করে তবে তাতে উৎপাতেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে।' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, "শ্রুত্যাদিবিধিং বিনেতি নাস্তিকতয়া তং ন মত্বেত্যর্থঃ। নত্বজ্ঞানেন, আলস্যেন বা ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ শ্রুতি আদির বিধি বিনা ঐকান্তিকী ভক্তি করলেও তা কল্যাণপ্রদ হয় না; কেননা নাস্তিকতাবশতঃ শাস্ত্রবিধি গ্রহণ করা হয় নাই। অজ্ঞান কিম্বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রবিধির পরিত্যাগ এস্থলে অভিপ্রেত নয়। এখানে যে ঐকান্তিকী হরিভক্তির

কথা বলা হয়েছে, বস্তুতঃ তা ঐকান্তিকী নয়, কারণ তাতে অশাস্ত্রীয়তা দোষ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং অবিচারেই ইহা ঐকান্তিকী বলে প্রতীত হয়।

"ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)

শাস্ত্রবিধির আদর এবং নিষিদ্ধ বিধির পরিহার কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্তই হয়ে থাকে, সুতরাং শ্রদ্ধালুব্যক্তির স্বতঃই শাস্ত্রবিধি পালনে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ বিধিতে অপ্রবৃত্তি হয়ে থাকে। যেহেতু শাস্ত্রবিশ্বাসই শ্রদ্ধার জীবন।

(৫) সদ্ধর্মপৃচ্ছা—সাধুগণের আচরিত ধর্ম জানার জন্য প্রশ্ন। সাধুগণ কি প্রকারে সাধন-ভজন করেছেন এবং তার ফলে পরম কল্যাণময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করেছেন, এসকল তত্ত্ব ও ভজনরীতি জানার জন্য আগ্রহ এবং বিজ্ঞজনের নিকট সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা।

ভজনতত্ত্ব জানার ইচ্ছা প্রবল হলে সে বিষয়ে অভিনিবেশ জাত হয়। এই অভিনিবেশবশতঃ স্বল্পরুচির উদয়ে মন নির্মল হয় বলে স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বের স্ফুরণ হয়। কিন্তু কেবল যুক্তিবলে ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। এখানে রুচি বলতে ভক্তিতত্ত্ব প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে প্রাচীন সংস্কারবশতঃ উত্তমতা জ্ঞান এবং উপদেষ্টা সাধুগুরুর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস—এতেই ভক্তিতত্ত্ব বোধগম্য হয়, শুষ্ক যুক্তি তর্কে উহার উপলব্ধি হয় না। শ্রীভক্তিরসামৃত-

সিন্ধুতে এই সদ্ধর্মপৃচ্ছার প্রমাণে নারদপুরাণের বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে—

"সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ॥"

অর্থাৎ 'সদ্ধর্ম জানার জন্য যাঁদের মতি অতিশয় আগ্রহশীল, অচিরকাল মধ্যেই তাঁদের সর্বার্থ সিদ্ধ হয়ে থাকে।'

(৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত জড়ীয় সুখভোগাদি ত্যাগ। এজগতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিষয় স্বীয় পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করার জন্য মায়াবদ্ধ মানবের মন সর্বদা লালায়িত। এই ভোগেচ্ছাই তার সংসার-দুঃখের এবং অধঃপতনের মৌলিক হেতু। ভজন-সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়ীয় রূপ-রসাদি বিষয় ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ রসাদিতে আকৃষ্ট করা। বিষয়ভোগে আসক্তি থাকলে স্বভাবতঃই ভজনে আসক্তি কমে যায় অথচ আসক্তির সহিত ভজন না করলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হল তাঁর প্রসন্নতা। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত ভোগ এবং ভোগবাসনা ত্যাগ করতেই হবে। শ্রীপদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়—

"হরিমুদ্দিশ্য ভোগ্যানি কালে ত্যক্তবতস্তব।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদ্‌লোলা সা প্রতীক্ষতে॥"

'শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্যে কালে কালে তুমি যে ভোগাদি

পরিত্যাগ করেছ, তোমায় বরণ করবার জন্য বিষ্ণুলোকস্থিত অচঞ্চল সম্পদ্ প্রতীক্ষা করছে।'

জড়ীয় বিষয়ের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ মানুষের মনে আছে তা সহজে নিবৃত্ত হয় না: কিন্তু আহার-শুদ্ধি হলে চিত্তশুদ্ধি হয়. চিত্তশুদ্ধ হলে ভগবৎস্মৃতি হয়; ভগবৎস্মৃতি হলে আনুষঙ্গিকভাবেই সব বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয়ে যায়। বেদেও একথা বর্ণিত আছে—"আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিলাভে সর্ব্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" আমরা যা আহার করি তদ্দ্বারা দেহ, মন গঠিত হয় এবং সঞ্জীবিত থাকে। শুদ্ধ আহারে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ হয় এবং ভজনে অভিনিবিষ্ট হতে পারে। অতএব শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আহারের বিচার অত্যাবশ্যক।

( ৭ ) শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানে বাস। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র অথবা গঙ্গার সমীপে বাস করলে অনায়াসে ভক্তিলাভ হয়। ঐ সব তীর্থে যেমন ভজনের উদ্দীপক লীলাস্থান সব বিরাজিত তেমনি ভজনের অনুকূল পরিবেশও বিরাজিত। দুর্ল্লভদর্শন সাধু মহাত্মাগণও ঐ সব তীর্থে বাস করেন যাঁদের দর্শনে ভক্তি সুলভ হয়। শ্রীধামবাসে শরণাগতিরও সিদ্ধি হয়—"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥" "হে ভগবন্! যিনি 'আমি তোমার' বাক্যেতে এরূপ বলেন, মনে মনেও

সেইরূপ বিশ্বাস করেন এবং দেহের দ্বারা তোমার লীলাস্থল আশ্রয় করে আনন্দের সহিত অবস্থান করেন, তিনিই শরণাগত।"

(৮) যাবদর্থানুবর্তিতা - যার দ্বারা নিজের ভজন নির্বাহ হয়, তাই স্বীকার্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নারদীয়ের শ্লোক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥"

অর্থাৎ 'যার দ্বারা স্বনির্বাহ হয়, অর্থবিৎ ব্যক্তি তাই স্বীকার করবেন, অধিক অথবা কম স্বীকার করলে পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হতে হয়।' "স্বনির্ব্বাহঃ" শব্দের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"স্বভক্তিনির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ যেরূপ ব্যবহার করলে স্বীয় ভক্তিনির্বাহ হতে পারে সাধকব্যক্তি সেরূপ ব্যবহারই করবেন। গৃহীভক্তগণ সংসারে থেকে সদ্বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সংসারযাত্রা নির্বাহ করে ভজন করবেন। যে পর্যন্ত নিরপেক্ষ হওয়ার অধিকার লাভ না হয়, সে পর্যন্ত যাবদর্থানুবর্তি হয়েই ভজন করতে হবে। অধিক বিষয়সংগ্রহের লালসা হলে ভজন-লালসা কমে যাবে। আবার কম বিষয় স্বীকার করলেও অভাববশতঃ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবে। সুতরাং যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করলে সংসার নির্বাহ হয়, সেই পরিমাণ বিষয়ই স্বীকার করবেন। তাতেই স্বভক্তি-নির্বাহ হবে।

(৯) হরিবাসর সম্মান—শ্রীএকাদশী ব্রত পালন। একাদশী

তিথির অন্ত্য ও দ্বাদশীর প্রথমপাদকে হরিবাসর বলে। এখানে হরিবাসর উপলক্ষণে শাস্ত্রবিহিত অন্যান্য বৈষ্ণবব্রতও জানতে হবে। যেমন—জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দশী শিবচতুর্দশী, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব তিথি মাঘী ত্রয়োদশী, শ্রীঅদ্বৈত জয়ন্তী প্রভৃতিতে উপবাস করবেন। এ সমস্ত ব্রতের সর্বথা বিদ্ধা ত্যাগ করে শুদ্ধা ব্রত পালন করবেন। বৈষ্ণব-ব্রতের পালনে শ্রীহরির সন্তোষ বিধান হয়, অন্যথায় ঘোরতর প্রত্যবায় জন্মে থাকে। অনেকে উপবাস করেন, কিন্তু সে উপবাস কেবল আহার ত্যাগ মাত্র! বাস্তবিকপক্ষে উপবাস বলতে—

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যো বাসস্তদ্ গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয় নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্ ॥"

অর্থাৎ 'কেবল লঙ্ঘন বা মহাপ্রসাদ ত্যাগ করলেই উপবাস হয় না। সমস্ত ব্যবহারিক কার্য থেকে উপাবৃত থেকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ, কীর্তনাদি দ্বারা যে কাল অতিবাহিত করা হয়, তাই যথার্থ উপবাস।'

(১০) ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরব– ধাত্রী অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতির গৌরব রক্ষণ। এ বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্কন্দপুরাণের বাণী উদ্ধৃত হয়েছে—

"অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিসুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতাঃ ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্ ॥"

"অশ্বত্থস্য তদ্বিভূতিরূপত্বাৎ পূজ্যত্বম্। ভূমিসুরাঃ ব্রাহ্মণাঃ। গো-ব্রাহ্মণয়োর্হিতাবতারত্বাদ্ভগবতো ভাগবতৈরেতাবপি পূজ্যাবিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষামেষাং তুলসী-বৈষ্ণব-সাহিত্যোক্তিবিচিকিৎসা নিরসনায়।" (টীকা—শ্রীজীবপাদ) টীকার তাৎপর্য—অশ্বত্থবৃক্ষ শ্রীভগবানের বিভূতিরূপে পূজ্য। 'ভূসুর' অর্থে ব্রাহ্মণ। শ্রী-ভগবান্ গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য অবতীর্ণ হন বলে গো-ব্রাহ্মণ ভাগবতগণেরও পূজ্য। তুলসী ও বৈষ্ণব সর্বোত্তম বলে সকলেরই পূজ্য। বিশেষতঃ ভক্তিপথে বৈষ্ণব ও তুলসীর সেবা প্রেম-প্রাপ্তির অব্যভিচারী সাধন, বৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ ভজনাঙ্গ। অশ্বত্থ, ধাত্রী, গো ও ব্রাহ্মণ এঁদের সেবা যে তুলসী ও বৈষ্ণবসেবার সঙ্গে উক্ত হয়েছে, তার কারণ এঁদের সেব্যত্ব বিষয়ে সবার সংশয় নির-সনের জন্যই।

এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা" (ভঃ রঃ সিঃ) এই দশটি অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ভস্বরূপ। এই দশটি অঙ্গ অবলম্বন না করলে ভজনারম্ভ হয় না। অন্বয় বা বিধিরূপে এই দশটি অঙ্গের কথা বলে ব্যতিরেক বা নিষেধরূপে আর দশটি অঙ্গের কথা বলেছেন।

(১১) **ভগবদ্‌বিমুখজনের সঙ্গত্যাগ**—যারা ভগবদ্ভজন করে না তারা ভগবদ্বিমুখ এবং যারা ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানে দ্বেষ করে তারা ভগবদ্‌বিদ্বেষী। এই উভয়বিধ ভগবদ্‌বহির্মুখজনের সঙ্গ ত্যাগ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে কাত্যায়নসংহিতার

প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে—

"বরং হুতবহজ্জ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥"

বরং অগ্নিজ্বালাময় পিঞ্জরের মধ্যে বাস করাও ভাল, তবু কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপত্তি ভাল নয়।

তাৎপর্য এই যে, ভগবদ্‌বিমুখ জনের সংসর্গে সাধকের জ্ঞান-বিরাগভজনাদি নষ্ট হয়, সুতরাং তাদের সঙ্গ সর্বথা বর্জনীয়। বহির্মুখ ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে বহির্মুখতারূপ দোষই বর্ধিত হয় এবং অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত করে সংক্রামক ব্যাধি যেমন সমীপাগত ব্যক্তিতেও সংক্রমিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্মুখজনের অসদ্‌বৃত্তি ও সমীপাগত সাধকে সংক্রমিত হয়ে থাকে, ভগবদ্বিমুখ করে দেয়। এখানে সঙ্গ বলতে আসক্তিই বুঝতে হবে। দৈবাৎ বহির্মুখজনের সন্নিকর্ষকে সঙ্গ বলা যায় না। তথাপি বহির্মুখজনের দর্শনে তাকে সমীপাগত দংশনোদ্যত বিষধরের ন্যায় জ্ঞান করে শঙ্কিত ও কম্পমান্ হয়ে সাধকের দূরে পলায়ন করাই কর্তব্য। বহির্মুখজনের সঙ্গত্যাগ সাধকের সদাচাররূপেও গণ্য।

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণবহির্মুখের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীতে যাদের আসক্তি তারাও অসৎ, তাদের সঙ্গও দূরতঃ বর্জনীয়। শ্রীভগবানের ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, মাধুর্যের কথা বলে ভগবানে যেরূপ

আসক্তি জন্মায়ে দেন, তা ভগবান্ নিজেও পারেন না। তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তি কামিনী-বার্তায় যেমন স্ত্রীতে আসক্তি জন্মাতে পারে, সেরূপ স্ত্রী নিজেও পারে না। সুতরাং এদের সঙ্গত্যাগ যে একান্ত কর্তব্য তা বলাই বাহুল্য ।

(১২) শিষ্যানুবন্ধিত্ব ত্যাগ—শিষ্যকরণের আসক্তি ত্যাগ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী উদ্ধৃত আছে—

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥"

( ৭।১৩।৮ )

শ্রীনারদ বলেছেন, 'বহু শিষ্য করবে না। বহু গ্রন্থ অভ্যাস করবে না। শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করবে না। কুত্রাপি মঠাদি ব্যাপার আরম্ভ করবে না।' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—........."এতচ্চানধিকারিশিষ্যা-দপেক্ষয়া। শ্রীনারদাদৌ তচ্ছ্রবণাৎ, তত্তৎ-সম্প্রদায়নাশপ্র-সঙ্গাচ্চ; অন্যথা জ্ঞানশাঠ্যাপত্তেঃ। অতএব নানুবধ্নীয়াদিতি স্বস্বসম্প্রদায়বৃদ্ধ্যর্থমনধিকারিণোঽপি ন সংগৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। বহূনিতি ভগবদ্বহির্মুখানন্যাংস্ত্বিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ বহুশিষ্য করবে না, ইহা অনধিকারী শিষ্যসংগ্রহ করবে না এই অপেক্ষায় বলা হয়েছে। শ্রীনারদাদি আচার্যগণ বহু শিষ্য করেছেন; কারণ আদৌ শিষ্য না করলে সম্প্রদায় লোপ ও জ্ঞানশাঠ্য দোষ হতে পারে। অতএব স্ব স্ব সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য অনধিকারী ব্যক্তিকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করাই

নিষিদ্ধ হল। 'বহু' বলতে ভগবদ্‌বহির্মুখ অনধিকারী বহু শিষ্য করণই নিষিদ্ধ হয়েছে বলে জানতে হবে। শ্রীধরস্বামিপাদ লিখেছেন—"নানুবধ্নীত প্রলোভনাদিনা বলান্নাপাদয়েৎ" অর্থাৎ 'প্রলোভনাদির দ্বারা অথবা বলপূর্বক কাকেও শিষ্য করবে না।' অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা, অথবা দলবৃদ্ধির আকাঙ্খায় বহুশিষ্য করলে অনধিকারী ব্যক্তিকেও শিষ্য করতে হয়, তাতে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। "অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ" 'অশ্রদ্ধালু ও যে নামশ্রবণে বিমুখ তাদের নামোপদেশ একটি নামাপরাধ।' সুতরাং জাতশ্রদ্ধব্যক্তিই শিষ্য হবার যোগ্য।

(১৩) মহারম্ভাদির উদ্যম ত্যাগ—ভগবদ্‌বিমুখতাকারক আড়ম্বরপূর্ণ মঠাদি ব্যাপার আরম্ভের উদ্যম ত্যাগ। মঠাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকলে ভজনে উৎসাহ ও অবকাশ থাকে না। উল্লিখিত ভাগবতের শ্লোকে বলা হয়েছে—'নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ' 'মঠাদি ব্যাপার কখনও আরম্ভ করবে না।' এতে যে ভজনের কত ক্ষতি, তা মঠাশ্রয়ীদের পরস্পরে মনোমালিন্য, বাদবিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে! প্রিয় ভক্তের লক্ষণপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলেছেন—"সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" (১২ ১৬) এইশ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখেছেন "সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলঃ যস্য সঃ" অর্থাৎ 'যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট সর্ববিষয়ে উদ্যম ত্যাগী সেই ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।'

(১৪) বহু গ্রন্থাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন—বহুবিষয়ক বহু গ্রন্থের অভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন করা উচিৎ। এইবাক্যে ভক্তি-বিরোধী গ্রন্থের অনুশীলনই বর্জন বুঝতে হবে। "গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্ ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" অর্থাৎ বহুগ্রন্থ অভ্যাস করবে না এবং শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করবে না।

বেদরূপ কল্পতরুর সুপরিপক্ক ফল সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। কলিযুগে মায়ান্ধকারে নিপতিত মানবগণের জন্য স্বপ্রকাশ সূর্যের ন্যায় সমুদিত রয়েছেন। প্রেমের মাঝে শ্রীভগবানের সন্ধান দেওয়ার এমন শাস্ত্র বিশ্বে আর দ্বিতীয় নেই। এমন পদে পদে স্বাদু ও আর কোন গ্রন্থ জগতে নেই। শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করে শ্রীল গোস্বামিপাদগণ যে সব সিদ্ধান্তগ্রন্থ ও রসগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলিও ভাগবতপদবাচ্য। এই সব গ্রন্থের রসাস্বাদনই ভজনতত্ত্ব জানার এবং ভজন-রসাস্বাদনের নিমিত্ত যথেষ্ট। কেউ কেউ ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, ইহা অপরাধজনক বলে ত্যাজ্য।

(১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য—অর্থাৎ ব্যবহারবিষয়ে কৃপণতা ত্যাগ। এর দৃষ্টান্তে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পদ্মপুরাণের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে –

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥"

অর্থাৎ স্মরণাদি পরায়ণ সাধক গ্রাসাচ্ছাদনের অলাভে অথবা

বিনাশে ব্যাকুলচিত্ত না হয়ে মনে মনে শ্রীহরিস্মরণ করবেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখেছেন, "স্মরণাদিপরাণামেবেয়ং রীতিঃ। সেবাদিপরৈস্তু যথালাভমেব সেবা কার্য্যা। ন তু যাচ্ঞাত্যতিশয়েন (নাতি) কার্পণ্যং কার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ শ্রীহরি-স্মরণ পরায়ণ সাধকের এই রীতি। সেবাপরায়ণ সাধকগণ যথালাভে সন্তুষ্ট থেকে সেবাকার্য নির্বাহ করবেন, কিন্তু অতিশয়-রূপে যাচ্ঞাদি করে স্বদৈন্য জ্ঞাপন করবেন না। তাঁদের ব্যবহার বিষয়ে কার্পণ্য ত্যাগ করা উচিৎ।

(১৬) শোকাদ্যবশবর্তিতা শোক, দুঃখ প্রভৃতির বশীভূত না হওয়া। যার চিত্ত শোক অমর্ষাদির দ্বারা আক্রান্ত, তার চিত্তে মুকুন্দের স্ফূর্তির সম্ভাবনা কিরূপে হতে পারে?

"শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ॥"
(রসামৃতসিন্ধুধৃত পদ্মপুরাণবচন)

পুত্রাদি স্বজন-বিয়োগে শোক দুঃখাদি জাত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সাধক ব্যক্তি শ্রীহরিস্মরণের দ্বারা দেহ-দৈহিকাদির নশ্বরতা জ্ঞানে শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ করবেন। শোকাদির বশীভূত হবেন না।

(১৭) অন্য দেবের অবজ্ঞা ত্যাগ—সর্বদেবেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরিই সর্বদা আরাধ্য, কিন্তু ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিৎ নয়।

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"
( ভঃ রঃ সিঃ ধৃত পাদ্মবচন )

ভক্তের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য হলেও তাঁর ভক্ত এবং তাঁর বিভূতিস্বরূপ অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়, তাঁরাও ভক্তের সম্মানীয়। কেউই অবজ্ঞার পাত্র নন। "অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে।" আবার কোনও ব্যক্তি অন্য দেব-দেবীর আরাধনা করে জেনে তাদের প্রতি অবজ্ঞাও দোষাবহ। কারণ তারা কামনা বাসনার বশীভূত হয়ে সমশীল দেবতার আরাধনা করে কাম্যফল চায়। সেই দেবতার প্রতি নিষ্ঠাই তাদের স্বভাব এবং অধিকার। সেই সেই দেবতার নিষ্কপট কৃপা হলে তারাও ক্রমশঃ নিষ্কাম হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে ধন্য হতে পারবে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে কামাখ্যাদেবীর উপাসক জনশর্মাই তার দৃষ্টান্ত।

(১৮) ভূতানুদ্বেগদায়িতা—"কায়মনে প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে" (চৈঃ চঃ)। প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া ভক্তের একান্ত কর্তব্য। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মহাভারতের বচন উদ্ধৃত হয়েছে—

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥"

'করুণ পিতা যেমন পুত্রের প্রতি ব্যবহার করেন, তদ্রূপ

যিনি প্রাণীমাত্রের প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহার করেন কাহাকেও উদ্বেগ দেন না, সেই বিশুদ্ধচেতা ভক্তের প্রতি হৃষীকেশ সত্বরই প্রসন্ন হন।' এতাদৃশ ভক্ত যে শ্রীভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন, শ্রী-গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে অর্জুনের প্রতি তা বলেছেন—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥"

অর্থাৎ 'যাঁর আচরণে কেউ উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি নিজেও লোক থেকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত—তিনি আমার প্রিয়।'

(১৯) সেবা-নামাপরাধ-বর্জন—যাতে কোনরূপ সেবা-পরাধ ও নামাপরাধের উদ্গম হতে না পারে, সেইরূপভাবে সেবা করা এবং নামকীর্তন করা। অপরাধ কাকে বলে? শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (৩০০ অনুঃ) লিখেছেন, "শ্রদ্ধাভক্তি-শব্দাভ্যামত্রাদর এব বিধিয়তে। অপরাধাস্তু সর্ব্বেঽনাদরাত্মকা এব, প্রভুত্বাবমানতশ্চ। তস্মাদপরাধনিদানমত্রানাদর এব পরি-ত্যাজ্য ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ 'শ্রদ্ধা ভক্তিদ্বারা আদরই বিহিত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রকার অপরাধই অনাদরমূলক। প্রভুত্বের অবমানন জন্যই অপরাধ হয়ে থাকে। অতএব অপরাধের মূলকারণ অনা-দরই পরিত্যাজ্য বুঝতে হবে।' ভক্তির প্রতি অপরাধই সেবা-পরাধ ও নামাপরাধ। নামোপলক্ষণে শ্রবণ-কীর্তনাদি অঙ্গযুক্ত ভক্তিদেবীই লক্ষিতা হচ্ছেন। অতএব ভক্তিদেবীকে যত্ন ও

সম্মানের সহিত সর্বশিরোমণি করে রাখতে হবে। তাঁর প্রতি সর্বাপেক্ষা গৌরব ও সম্মান রাখতে হবে। যাঁরা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই সব ভক্তদের প্রতি সতত আদর সম্মান রাখতে হবে, তাঁদের মহিমা কীর্তনে প্রীত হতে হবে—নচেৎ তাঁর প্রতি অপরাধ হবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সেবা ও নামাপরাধ ত্যাগ বিষয়ে পুরাণের বাণী উল্লেখ করা হয়েছে—

"মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে! ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥" (বরাহপুরাণ)

সেবাপরাধ ত্যাগ বিষয়ে শ্রীবরাহদেব ধরণীর প্রতি বল্লেন, 'হে বসুন্ধরে! মৎসেবায় যে সব অপরাধ মৎকর্তৃক কথিত হচ্ছে, বৈষ্ণব প্রযত্ন সহকারে সেই সব অপরাধ বর্জন করবে।' সেবাপরাধ যথা—(১) যানে আরোহণ করে অথবা পাদুকা সহিত ভগবন্মন্দিরে গমন। (২) শ্রীকৃষ্ণের উৎসবাদি দর্শন না করা। (৩) শ্রীমূর্তির সমক্ষে প্রণত না হওয়া। (৪) উচ্ছিষ্ট অথবা অশৌচ অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি। (৫) একহস্তে প্রণাম। (৬) শ্রীভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ, তদগ্রে অন্য দেবতার প্রদক্ষিণ। (৭) শ্রীভগবানের সম্মুখে পাদপ্রসারণ। (৮) পর্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ বাহুদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন করে উপবেশন। (৯) শ্রীমূর্তির সম্মুখে শয়ন। (১০) তাঁর সমক্ষে ভোজন। (১১) মিথ্যা ভাষণ। (১২) উচ্চভাষণ। (১৩) পরস্পর গল্প। (১৪) শোকাদি হেতু রোদন। (১৫) বিবাদ। (১৬-১৭) নিগ্রহ ও অনুগ্রহ। (১৮) কাহারও প্রতি

নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ। (১৯) কম্বলাবরণ পূর্বক প্রণামাদি। (২০) পরনিন্দা। (২১ পরস্তুতি। (২২) অশ্লীলভাষণ। (২৩) অধোবায়ু ত্যাগ। (২৪) সামর্থ্যসত্ত্বেও গৌণোপচারে সেবা। (২৫) অনিবেদিত অন্নাদি ভোজন। (২৬) যে কালে যে পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হয় তা শ্রীভগবানকে অর্পণ না করা। (২৭) যে দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দেওয়া হয়েছে তার অবশিষ্ট শ্রীভগবানকে প্রদান (২৮) শ্রীমূর্তিকে পশ্চাতে রেখে উপবেশন। (২৯) শ্রীগুরুর স্তুতি না করা। (৩০) নিজমুখে নিজের প্রশংসা। (৩১) অন্য দেবতার নিন্দা। (৩২) শ্রীমূর্তির সম্মুখে অপরকে প্রণাম করা, শ্রীমূর্তির বামে বা সম্মুখভাগে কিম্বা মন্দিরগর্ভে প্রণাম করা। এই দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ।

এ বিষয়ে আরও কতকগুলি অপরাধ আছে যথা রাজান্ন ভোজন। অন্ধকারগৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শন। করবাদ্য না করে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন। কুকুরাদি অস্পৃশ্যপশুকে স্পর্শ করে নৈবেদ্য সংগ্রহ। অর্চনকালে মৌনভঙ্গ। অর্চনকালে শৌচ, প্রস্রাবের জন্য গমন। গন্ধ, মাল্য না দিয়ে ধূপ দান। হস্তমুখ প্রক্ষালন না করে, স্ত্রীসঙ্গের পর স্নানাদি না করে মন্দিরে প্রবেশ। মৃত, প্রদীপ ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করে, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, মলিন, অপরের ব্যবহৃত ও অধৌত বস্ত্র পরিধান করে, মৃত দর্শন করে, ক্রোধ করে শ্মশান থেকে প্রত্যাগমন করে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না করে, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে তৈলমর্দন করে শ্রীহরির বিগ্রহ স্পর্শ কিম্বা সেবা করলে অপরাধ হয়।

অন্যত্র আরও অপরাধ ত্যাগ উপদিষ্ট হয়েছে যেমন ভক্তি শাস্ত্রের বিধির অনাদর করে ভগবৎপূজা। ভক্তিশাস্ত্রের অনাদর ও অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। শ্রীমূর্তির সম্মুখে তাম্বূলচর্বণ। এরণ্ড পত্রে রক্ষিত পুষ্পে ভগবৎপূজা। আসুর কালে পূজন। পীঠ কিম্বা ভূমিতে বসে পূজা। শ্রীমূর্তির স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা স্পর্শন। শুষ্ক ও পর্য্যুসিত পুষ্পদ্বারা পূজা। পূজা করতে বসে নিষ্ঠীবন ত্যাগ ( থুথু ফেলা )। পূজাবিষয়ে গর্ব অর্থাৎ আমার ন্যায় পূজা আর কেউ করে না, এমত গর্ব করা। তীর্যগ্‌ভাবে তিলক রচনা। পদধৌত না করে মন্দিরে প্রবেশ। অবৈষ্ণব-পাচিত অন্নাদি নিবেদন ও নিজে ভোজন করা। অবৈষ্ণবের দৃষ্টিগোচরে শ্রীমূর্তির শৃঙ্গারাদি।

এক্ষণে বুঝা গেল, যে প্রকার আচরন দ্বারা শ্রীভগবৎবিগ্রহের মর্যাদার হানি হয়, আদর, যত্ন, শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব প্রকাশ পায়, তাহাই সেবাপরাধ। যত্নপূর্বক এই সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্তব্য. দৈবাৎ অথবা অনবধানে যদি এইসকল অপরাধের মধ্যে কোনটি হয়, তা সাধক যে নিত্য হরিনাম করেন এবং স্তব, স্তোত্রাদি পাঠ করেন তদ্দ্বারা ক্ষয় হয়। কিন্তু এইভাবে সেবাপরাধ দূর হয় জেনে বুদ্ধিপূর্বক করলে তা নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি রূপ' নামাপরাধে পর্যবসিত হয় : এবং ঐ নামাপরাধ নাশের যে উপায় বলা হয়েছে তাহা ভিন্ন যায় না।

নামাপরাধ দশবিধ যথা [১] সাধুনিন্দা, [২] শ্রীবিষ্ণু ও

শ্রীশিবের নামাদির স্বাতন্ত্র্য মনন, [৩] গুর্ববজ্ঞা, [৪] শ্রুতি ও তদনুগতশাস্ত্রের নিন্দা, [৫] শ্রীহরিনামের মহিমায় অর্থবাদ মনন, [৬] প্রকারান্তরে শ্রীহরিনামের অর্থ কল্পনা, [৭] নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি, [৮] অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত শ্রীহরিনামের সাম্য মনন, (৯] শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ, ১০) নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেও নামে অপ্রীতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নামাপরাধ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশুল ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি স সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥”

সকলপ্রকার অপরাধকারীও শ্রীহরির আশ্রয়ে নিরাপরাধ হয়, শ্রীহরির চরণে যে দ্বিপদপাপিষ্ঠ অপরাধ করে সে নামাশ্রয় করলে নাম-বলে কদাচিৎ ত্রাণ পেতেও পারে ; কিন্তু সর্বসুহৃৎ শ্রীনামের প্রতি অপরাধে অধঃপাতই অনিবার্য।*

(২০) শ্রীকৃষ্ণনিন্দা ও কৃষ্ণভক্তনিন্দা সহ্য না করা – শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা ও ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করে তা সহ্য করলে তার যে কৃষ্ণভক্তি আছে তা প্রমাণিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৭৪।৪০) শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—

---

* নামাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিচার নামতত্ত্ববিজ্ঞান প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

"শ্রীভগবানের নিন্দা অথবা তাঁর ভক্তের নিন্দা শুনে যে ব্যক্তি ঐস্থান ত্যাগ না করে, সমস্ত সুকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে সে অধঃপতিত হয়।" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ উল্লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন—"ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ; যথোক্তং দেব্যা (ভাঃ ৪।৪।১৭)—

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
চ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভঃ—২৬৫ অনুঃ)

অর্থাৎ অসমর্থব্যক্তির পক্ষেই নিন্দাস্থান থেকে প্রস্থানের ব্যবস্থা; কিন্তু সামর্থ্য থাকলে নিন্দকের কটুভাষিণী জিহ্বাকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। তাতে অসমর্থ হলে নিন্দাশ্রবণকারী নিজের প্রাণ বিসর্জন করবেন। শ্রীদুর্গাদেবী দক্ষযজ্ঞে পিতার মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণে অধীর হয়ে বলেছেন, "স্বেচ্ছাচারী মানবগণ যেস্থানে ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে, সেখানে যদি প্রতিকারের সামর্থ্য না থাকে, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে সেস্থান থেকে প্রস্থান করবে।

যদি শক্তি থাকে তবে নিন্দকের কটূভাষিণী জিহ্বাকে ছেদন করবে, পরে স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করবে।”

বৈষ্ণবগণ তৃণাদপি সুনীচ, অমানি, মানদ ; কায়মনোবাক্যে কাউকে উদ্বেগ দানের ইচ্ছা করেন না, এজন্য তাঁদের পক্ষে কর্ণে হস্ত দিয়ে শ্রীহরিস্মরণ পূর্বক নিন্দাস্থান ত্যাগ করাই কর্তব্য।

এই ভক্তিমার্গে প্রবেশের পক্ষে উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ দ্বারস্বরূপ। এরমধ্যে প্রথম দশটি অঙ্গ সাধনভক্তির প্রারম্ভ-স্বরূপ অন্বয়ভাবে যাজন করতে হবে এবং পরের দশটি অঙ্গ ব্যতি-রেকভাবে যাজন অর্থাৎ বর্জন করতে হবে। এর পরের অঙ্গগুলি অধিকাংশই ক্রিয়াপ্রধান।

(২১) মালাতিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে পদ্মপুরাণের বাণী উদ্ধৃত হয়েছে—

“যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা,<br>
যে বাহুমূল-পরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।<br>
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা-<br>
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥”

“যাঁদের কণ্ঠে তুলসী, পদ্মবীজ-মালা শোভিত, বাহুমূলে শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্নযুক্ত শ্রীহরির চরণচিহ্ন অঙ্কিত, যাঁদের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র বিরাজিত, তাদৃশ বৈষ্ণবগণ ভুবনকে আশু পবিত্র করেন।” শাস্ত্র আরও বলেন—

"যজ্ঞোপবীতবদ্ ধার্য্যা কণ্ঠে তুলসীমালিকা।
ক্ষণমাত্র-পরিত্যাগাৎ বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ॥
অশৌচে চাপ্যনাচারে কালেঽকালে চ সর্ব্বদা।
তুলসীমালিকাং ধত্তে স যাতি পরমং পদম্॥"

"যজ্ঞোপবীতের ন্যায় সতত কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করা কর্তব্য। ক্ষণকাল উহার পরিত্যাগে নরমাত্র বিষ্ণুদ্রোহী হয়ে থাকেন। জনন, মরণাদি অশৌচে এবং অনাচারে অর্থাৎ মৈথুনাদি ব্যাপারেও, সময়ে ও অসময়ে সর্বদা যিনি তুলসীমালা ধারণ করেন তিনি পরমপদ লাভ করেন।" এই সব বাক্যে মালা-তিলক ধারণের মাহাত্ম্য এবং নিত্যত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। যাঁরা বলেন, 'ভক্তি অন্তরের বস্তু, মালাতিলকাদি বাহ্যচিহ্ন ধারণের প্রয়োজন কি?' তাঁরা উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যগুলি দেখলে বুঝতে পারবেন এই বাহ্যচিহ্নের ধারণে সাধক কি পরিমাণে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন এবং ইহার ত্যাগে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। বৈষ্ণবের মালাতিলকাদি চিহ্নগুলি তাঁদের স্বরূপজ্ঞানের দ্যোতক এবং শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণের অনুকূল বলে ভজনের পুষ্টিকারক।

(২২) নামাক্ষরধৃতি—নিজ অঙ্গে শ্রীকুণ্ডের রজ, গোপীচন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামাদি লিখন।

"কৃষ্ণনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনো ভূত্বা তস্যলোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত - পাদ্মবচন)

অর্থাৎ 'যাঁরা চন্দনাদিদ্বারা কৃষ্ণনামাক্ষর গাত্রে অঙ্কন করেন, তাঁরা লোকপাবন হয়ে শ্রীহরির পরমধাম প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।' শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁর নামও সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কারণ নাম নামী অভিন্নতত্ত্ব। সুতরাং অঙ্গে নামের স্পর্শে পরম কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। 'ত্বক্' একটি ইন্দ্রিয়, ত্বগেন্দ্রিয়ের দ্বারা এতে নামানুশীলন কার্যটিও সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(২৩) নির্মাল্যধারণ—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ থেকে উত্তারিত মালা, চন্দন, তুলসী প্রভৃতিকে নির্মাল্য বলা হয়। এই নির্মাল্য যাঁর অঙ্গে স্পর্শ হয়, তাঁর সর্বপ্রকার অনর্থ বিনাশ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি লাভ হয়ে থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত শ্রী-ভাগবতের উদ্ধব-বাক্য—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥" (১১.৬.৪৬)

'হে ভগবন্! আপনার উপভুক্ত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করে আপনার দাস আমরা অনায়াসেই আপনার মায়াকে জয় করতে সমর্থ হব।' এরদ্বারা নির্মাল্যধারণে কৃষ্ণেতর বাসনার নাশ এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে।

(২৪) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য—এবিষয়ে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুধৃত শাস্ত্রবচন—

"যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহুশ্চ ভক্তিতঃ।
স নির্দহতি পাপানি মন্বন্তরশতেষ্বপি ॥"

( দ্বারকামাহাত্ম্য )

'যিনি শ্রীবিগ্রহের অগ্রে আনন্দিত মনে বহু ভাবভক্তি সহকারে নৃত্য করেন, তিনি শতশত মন্বন্তরে জাত যাবতীয় পাপ নিঃশেষে দগ্ধ করেন।' এই নৃত্য-গীতাদি ব্যাপার সুখকর ও অনায়াসসাধ্য, অথচ এরদ্বারা অর্চিত হলে শ্রীভগবান্ পরম প্রসন্ন হয়ে থাকেন।

(২৫) দণ্ডবন্নতি বা নমস্কার—শ্রীভগবান্ এবং বৈষ্ণবগণকে ভূমিতে পতিত হয়ে প্রণাম করা।

"একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ ধৃত নারদীয়বাক্য )

"শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণাম করলে যে ফল হয়, দশটি পূর্ণ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল তার তুল্য নয়। কারন দশাশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামকারীর পুনরায় জন্ম হয় না।" "স্বাপকর্ষবোধানুকূল-ব্যাপারবিশেষো নমস্কারঃ" ( শ্রীল বিশ্বনাথ) নিজের অপকর্ষবোধক অনুকূল ব্যাপারবিশেষকেই নমস্কার বা প্রণাম বলা হয়। নমস্কার চারপ্রকার -(১) অভিবাদন (জয় প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক চরণস্পর্শ করা), (২) সাষ্টাঙ্গ ( পাদ, শির, কর, জানু, বক্ষ, চক্ষু, বাক্য ও মন দ্বারা ভূপতিত হয়ে চরণ

স্পর্শ করা ) (৩) পঞ্চাঙ্গ ( কর, শির, জানু, বাক্য ও মনদ্বারা শ্রীচরণস্পর্শ ) (৪) জোড়হাত দ্বারা স্বীয় শিরস্পর্শ। পদ্মপুরাণে নমস্কারের ব্যাখ্যা এরূপ - অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতি ॥" অর্থাৎ 'ম' কারের অর্থ অহঙ্কার এবং 'ন' কার তার নিষেধক। এই নমস্কারই অহঙ্কার খণ্ডনের সদুপায়।

শ্রীগুরুর শ্রীচরণদ্বয় ধারণ পূর্বক ঐচরণেই মস্তক রেখে প্রার্থনাদির সহিত পঞ্চাঙ্গ অথবা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয়।

(২৬) অভ্যুত্থান—শ্রীমূর্তির দর্শনে সম্যক্‌রূপে গাত্রোত্থান। শ্রীগুরুবর্গের আগমন দর্শনে গাত্রোত্থান করা কর্তব্য নচেৎ অকল্যাণ হয়। গাত্রোত্থানে সর্বপ্রকার অশুভ বিনাশ হয়ে থাকে।

(২৭) অনুব্রজ্যা—শ্রীমূর্তি অথবা গুরুবর্গ কোথাও গমন করছেন দেখলে তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা। ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে—

"রথেন সহ গচ্ছন্তি পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ।
বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥" (ভঃরঃসিঃ ধৃত)

অর্থাৎ 'চণ্ডালাদিও শ্রীভগবানের রথাদি যানের পার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও অগ্রদেশে গমন করলে বিষ্ণুসম পূজ্য হয়ে থাকেন।'

(২৮) শ্রীভগবত্তীর্থ ও আলয়ে গমন—শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য তাঁর লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম ও ভগবন্মন্দিরে গমন। ধামে গমন করলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাঁদের সঙ্গলাভে মানব কৃতার্থ হয়ে

থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনধামের যে অচিন্ত্যশক্তি আছে তা পরে বলা হবে।

(২৯) পরিক্রমা—শ্রীবিষ্ণুমূর্তি ও শ্রীতুলসীর প্রদক্ষিণ। শ্রীবিষ্ণুমূর্তিকে দক্ষিণে রেখে চারবার পরিক্রমা করা কর্তব্য। তাতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্ব পরিক্রমার ফল হয়। এই পরিক্রমা শীঘ্র ফলপ্রদ বলে গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষাও এর ফলাধিক্য জানতে হবে। শ্রীব্রজধামে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা মহা-মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং সদ্য ফলপ্রদ। পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে এবং পুরুষোত্তমমাসে লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধালু নরনারী শ্রীগোবর্ধন পরিক্রমা করে থাকেন।

(৩০) অর্চন—ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি পূর্বকৃত্য নির্বাহপূর্বক মন্ত্রাদিদ্বারা উপচার সমর্পণরূপ শ্রীবিষ্ণুপূজাকেই 'অর্চন' বলা হয়। দীক্ষিত ভক্তমাত্রের শ্রীবিষ্ণুর অর্চন একান্ত কর্তব্য, নচেৎ ঘোরতর প্রত্যবায় হয়ে থাকে। অর্চাবিগ্রহে প্রতিমাবুদ্ধি না করে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধিতেই অর্চনার বিধি। যে সব মানব দীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীহরির অর্চনা করে থাকেন, তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর শাশ্বত আনন্দময় পরম ধামে গমন করে থাকেন।

শাস্ত্রীয় রীতিনীতি শিক্ষা করেই অর্চনা করতে হয়। শাস্ত্রীয় বিধি না জেনে আদর যত্ন পূর্বক পূজা করলেও বিধানোক্ত পূজা অপেক্ষা শতভাগের একভাগ ফলই হয়ে থাকে। এস্থলে আদর যত্ন হেতুই শতভাগের একভাগ ফল, অনাদরে কিছুই ফল হয় না।

মানস-পূজায় বা যোগপীঠ সেবায় সাধক সপরিকর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত থেকে স্বীয় সিদ্ধদেহ চিন্তন পূর্বক শ্রী-গুরূপদিষ্ট বিধিমতে মানসসেবা করবেন। তারপর বাহ্যোপচারে যথাবিধি বাহ্যসেবা করবেন। এই মানসসেবাই বাহ্যসেবার প্রাণ। যাঁরা সম্পত্তিমান্ গৃহিভক্ত তাঁদের পক্ষে রাজোপচারে সেবা করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় স্মরণাদিনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চনবৎ সংক্ষিপ্তো-পচারে সেবা করলে তাঁদের বিত্তশাঠ্য দোষ হয়ে থাকে। অন্যের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজানির্বাহ ব্যবহারনিষ্ঠত্ব এবং আলস্যের প্রতিপাদক। তা অশ্রদ্ধাময় হেতু নিকৃষ্ট।

(৩১) পরিচর্যা—শ্রীভগবানের সেবাযোগ্য উপকরণাদির শোধন এবং চামরাদি সহকারে উপাসনা। রাজার ন্যায় সেবাই এখানে পরিচর্যা শব্দের বাচ্য। "মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধ-রিমন্দিরে। স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ ॥" ভঃ রঃসিঃ ধৃত—নারদীয় বচন। অর্থাৎ 'যিনি শ্রীহরিমন্দিরে মুহূর্ত বা মুহূর্তের অর্ধকালও অবস্থান করেন, তিনিই যদি পরমপদ লাভ করেন; তবে সেবাকার্যে রত হলে যে কি ফললাভ হয় তা বলাই যায় না।' অর্চন ও পরিচর্যার বিবিধ অঙ্গ আছে। বিস্তারিত জানতে হলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি দ্রষ্টব্য বিবিধ অঙ্গের মধ্যে যে কোন একটি সেবাকার্যে রত হলে জীবন সার্থক হয়। ভক্ত কাল ও দেশের উপযোগী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিচর্যা করবেন।

(৩২) গীত—শ্রীহরির নাম, রূপ ও লীলাদি বিষয়ক গান। এবিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত শাস্ত্রবচন—

"ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽনিশং পরম্।
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকং ভবেৎ॥"

'ভগবৎকথাভিন্ন অন্য গান করবে না—এরূপ নিষেধ থাকায় সেই ব্রাহ্মণ কেবল শ্রীবাসুদেব নাম নিরন্তর গান করে শ্রীবাসুদেবের সালোক্য প্রাপ্তি করলেন। সুতরাং তাঁর সেই গান রুদ্রগান অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ হয়েছিল।'

(৩৩) সঙ্কীর্তন—শ্রীভগবানের নাম, গুণ ও লীলাদির উচ্চভাষণই সংকীর্তন। বহু ভক্ত মিলিত হয়ে ভগবন্নামের উচ্চকীর্তনকেও সঙ্কীর্তন বলা হয়। কলিযুগে নামকীর্তনই যুগধর্ম। এজন্য অন্যান্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করলেও তা নামকীর্তনের সহযোগেই করতে হবে। "নববিধ ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" (চৈঃ চঃ) অন্যান্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে যে ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকে, নামকীর্তনের দ্বারা তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কারণ নাম স্বয়ংই নামী, শ্রীহরির অক্ষররূপ অবতার অতএব স্বতঃই পূর্ণ। তাই অন্যান্য ভজনাঙ্গের অপূর্ণতা দূর করেন। এজন্য একমাত্র নামসঙ্কীর্তন দ্বারাই সাধক অনায়াসে ভগবৎপ্রেমলাভে ধন্য হয়ে থাকেন, আনুষঙ্গিকভাবে সংসার নাশ হয়ে যায়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

 হয়—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধ-ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥"

একমাত্র অপরাধ ব্যতীত নামসঙ্কীর্ত্তনের অমোঘ শক্তিকে ব্যাহত করার কারোই ক্ষমতা নেই। এজন্য যাতে নিরপরাধে নামকীর্তনের মুখ্য ফল প্রেমলাভ করে সাধক ধন্য হন, সেজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" *

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই এইশ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।

---

* মৎপ্রণীত শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ গ্রন্থে এইশ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥” (চৈঃচঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রভুর শ্রীমুখোক্ত শ্লোকটি উল্লেখ করে স্বয়ং মন্তব্য করেছেন—

“ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এইশ্লোক ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরন।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরন ॥” ( চৈঃ চঃ )

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার এইশ্লোক আচরণ করলে নামকীর্ত্তনকারীর প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র ও প্রবল বাধা বৈষ্ণবাপরাধাদি আসতে পারবে না, তাতে সাধক অনায়াসে প্রেমলাভে ধন্য হবেন।* শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীভগবানের লীলাকীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, লীলাকীর্ত্তন যথা—

“সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ! বিরিঞ্চগীতাঃ।

---

* শ্রীনামতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রবন্ধে সঙ্কীর্ত্তন মহিমা দ্রষ্টব্য।

অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো

দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥" ( ভাঃ ৭।৯।১৮)

শ্রীপ্রহ্লাদ বল্লেন, "হে নৃসিংহ ! আপনার অনুগৃহীত দাস আমি, আপনি প্রিয়সুহৃৎ ও পরম দেবতা: আপনার ব্রহ্মা কর্তৃক কীর্তিত লীলাকথা সতত কীর্তন করে আপনার পাদপদ্মনিবাসী ভাগবত-পরমহংসগণের সঙ্গবলে আমি রাগাদি গুণমুক্ত হয়ে অনায়াসে দুর্লঙ্ঘ্য দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হব ।"

গুণকীর্তন যথা ( ভাঃ ১।৫।২২ )—

"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা

স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ ।

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো

যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥"

'ভগবান্ শ্রীহরির গুণানুবর্ণনই পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সুচারু যজ্ঞ, সুষ্ঠু উচ্চারিত বেদমন্ত্র, জ্ঞান ও দানের অব্যভিচারী ফল বলে মহাজনেরা নিরূপণ করেছেন ।'

(৩৪) জপ—মন্ত্রের অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলা হয়। ইহা স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। এই জপ বাচিক, উপাংশু ও মানস ভেদে ত্রিবিধ : এগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। বাচিকজপ কীর্তনের অন্তর্গত। উপাংশুজপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয় এবং কেবল নিজেরই শ্রুতিগোচর হয়। মানসজপে জিহ্বা স্পন্দিত হয় না। মন্ত্রের অর্থচিন্তার সহিত মন্ত্রের পুনঃপুনঃ আবৃত্তিই মানস

জপ। এই মানসজপ স্মরণের অন্তর্গত। জপের বিধি এবং মন্ত্রার্থ দীক্ষাগুরুর নিকট থেকে জ্ঞাতব্য।

(৩৫) বিজ্ঞপ্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষভাবে হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন ও প্রার্থনা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত হয়েছে—

"হরিমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিৎ কৃতং বিজ্ঞাপনং গিরা।
মোক্ষদ্বারার্গলান্মোক্ষস্তেনৈব বিহিতস্তব॥"

শ্রীহরির উদ্দেশ্যে তুমি বাক্যদ্বারা যা কিছু বিজ্ঞাপন করেছ তাতেই তোমার মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী প্রভৃতি বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে যথা সংপ্রার্থনাত্মিকা —"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি॥" (পদ্মপুরাণ) "হে প্রভো! যুবতীগণের মন যেমন যুবকের প্রতি এবং যুবকের মন যেমন যুবতীগণের প্রতি আসক্ত হয় তোমাতে আমার মন যেন তদ্রূপ অভিরমিত হয়।" দৈন্যবোধিকা যথা—"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন। পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥" (ঐ) "হে পুরুষোত্তম! আমার ন্যায় পাপী এবং অপরাধী বিশ্বে আর কেউ নেই। পাপ পরিহারের অর্থাৎ 'হে প্রভো! আমার দোষ ক্ষমা কর' এই কথা বলতেও আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে।" লালসাময়ী যথা— "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ

পুণ্ডরীকাক্ষ ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥" 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমার এমন দিন কবে হবে, যে দিন যমুনা-তীরে তোমার নামকীর্ত্তন করতে করতে সজল নয়নে তাণ্ডব নৃত্য রচনা করব।' জাতরতি সাধকের পক্ষেই এই লালসাময়ী প্রার্থনা সম্ভব বলে জানতে হবে। লালসাময়ী প্রার্থনা রাগানুগাভক্তের উপযুক্ত ভজন।

(৩৬) স্তবপাঠ—শ্রীভগবানের সম্মুখে স্তুতি করা। গীতা, ভাগবত, গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থে লিখিত স্তব এবং প্রাচীন ও আধুনিক মহাজনকৃত স্তোত্রাদির পাঠ ও পুনঃপুনঃ আবৃত্তি। রাগানুগীয় ভক্ত গৌড়ীয়বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদকৃত স্তবমালা ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত স্তবা-বলীর আবৃত্তি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার আবৃত্তি অন্তরঙ্গ ভজন।

(৩৭) নৈবেদ্যাস্বাদ—ভগবন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদন। এজগতে যে যে দ্রব্য পবিত্র ও প্রীতিকর, পুরুষের আহারের উপ-যোগী অধিক গুণশালী সেই সেই দ্রব্য ভক্তির সহিত মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করলে তাকে মহাপ্রসাদ বলা হয়। ভক্তের পক্ষে এই মহাপ্রসাদই সর্বথা স্বীকার্য। তাঁদের শ্রীভগবানে অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ সর্বথা নিষিদ্ধ। কারণ মহাপ্রসাদ চিন্ময়, উহার সেবনে গুণময় বিষয়তরঙ্গের নিবৃত্তি হয় এবং শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

বাস্তবিকপক্ষে অন্ন জল, ঔষধাদি যে সব দ্রব্য আহারের

জন্য কল্পিত হয়, তার মধ্যে কোনবস্তুই ইষ্টদেবে অর্পণ না করে গ্রহণ করা বৈষ্ণবের কর্তব্য নয়। অনিবেদিত বস্তু ভোজনে বৈষ্ণবের প্রত্যবায় ঘটে থাকে।

মহাপ্রসাদাদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুতে আগ্রহের নামই যুক্ত-বৈরাগ্য। প্রাকৃত বুদ্ধিতে মহাপ্রসাদাদি ত্যাগই ফল্গুবৈরাগ্য। যুক্তবৈরাগ্যই ভক্তির উপযোগী। ফল্গুবৈরাগ্য অনুপযোগী বলে ভক্তের পক্ষে উহা ত্যাজ্য। মহাপ্রসাদের ত্যাগ দু'প্রকারে হয়ে থাকে। এক অভিমানবশতঃ প্রার্থনা না করা। অপরটি প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা—এটি কিন্তু অপরাধেই পর্যবসিত হয়।

(৩৮) পাদ্যাস্বাদ—শ্রীহরির চরণামৃত পান করা। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে পদ্মপুরাণের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

"ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চনম্।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রযান্তি পরমাং গতিম্॥"

'যাঁরা দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবার্চনাদি কিছুই করেন নাই, তাঁরাও যদি শ্রীহরির পাদোদক পান করেন তাহলে পরমা-গতি লাভ করে থাকেন।'

(৩৯) ধূপ-সৌরভ-গ্রহণ -ধূপ ও মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ। শ্রীহরির প্রসাদীধূপের সৌরভ গ্রহণের মহিমা শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে—

"আঘ্রাণং যদ্ধরেদ'ত্ত-ধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্ভবব্যালদষ্টানাং নস্যং কর্ম্মবিষাপহম্॥" (ভঃরঃসিঃ ধৃত তন্ত্রবচন)

'শ্রীহরিতে নিবেদিত ধূপোচ্ছিষ্টের আঘ্রাণই সংসাররূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষনাশন নস্যকর্ম।' তদ্রূপ শ্রীহরির নির্মাল্যের ( পুষ্পমালা ও তুলসীর ) সৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হলে সর্বানর্থ বিনষ্ট হয় ও শ্রীহরিতে ভক্তির সঞ্চার হয়। বৈকুণ্ঠে আগত শ্রী-সনকাদি ঋষিগণের শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণে অর্পিত তুলসীর গন্ধে ব্রহ্মানন্দ পরাভূত হয়ে পরাভক্তির সঞ্চার হয়েছিল—শ্রীভাগবতে ( ৩।১৫ অধ্যায়ে ) ইহা বর্ণিত রয়েছে।

(৪০) শ্রীমূর্তিস্পর্শ—অর্চনার জন্য শ্রীমূর্তির স্পর্শ। পূর্বে বলা হয়েছে দীক্ষিতব্যক্তিমাত্রকেই অর্চনা করতে হবে। অর্চন-কারী পবিত্রভাবে এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তি স্পর্শ করবেন। "স্পৃষ্ট্বা বিষ্ণোরধিষ্ঠানং পবিত্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ" ( ভঃ রঃ সিঃ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ) এইশ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখেছেন—"অথ শ্রীমদর্চ্চামাত্রস্য স্পর্শাধিকারিণাং স্পর্শমাহাত্ম্যমাহ—স্পৃষ্টেতি।" অর্চাবিগ্রহমাত্রেরই স্পর্শাধিকারীর স্পর্শমাহাত্ম্য বলা হচ্ছে। দীক্ষিতভক্তমাত্রই অর্চনের অধিকারী। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যোঃ ভগবতঃ পরৈঃ॥"

অর্থাৎ 'শালগ্রাম-শিলাত্মক শ্রীভগবান্ ভগবৎপরায়ণ দ্বিজ, স্ত্রীলোক ও শূদ্র সকলেরই অর্চনীয়।' 'ভগবৎপরায়ণ' এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিহীন তাঁরা শ্রীশালগ্রাম

অর্চনে অনধিকারী। সুতরাং যেখানে স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম স্পর্শবিষয়ে নিষেধবিধি আছে তা' অবৈষ্ণবপরই জানতে হবে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে যাঁরা সদাচারনিষ্ঠ ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হয়েছেন তাদৃশ স্ত্রী-শূদ্রাদির জন্য উহা নয়।

(৪১) শ্রীমূর্তিদর্শন—যাঁদের পক্ষে শ্রীমূর্তি স্পর্শের সুযোগ না থাকে, তাঁরা শ্রীমূর্তির দর্শন করবেন। শ্রীমূর্তির দর্শনেও তাদৃশ ফল লাভ হয়ে থাকে।

"বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্॥"

( ভঃ রঃ সিঃ ধৃত বরাহপুরাণ-বচন )

'হে বসুন্ধরে! যাঁরা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করেন, তাঁরা যমপুর না গিয়ে পুণ্যবান্ লোকের গতিই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।' এখানে 'পুণ্যবান্ লোকের গতি' বলতে যে ভগবৎধামে গতি, তা নিশ্চিত, কারণ শ্রীগোবিন্দদর্শনের প্রেমব্যতীত অন্য কোন পুণ্য ফল নয়। এইশ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামি-পাদ লিখেছেন 'অথ সর্ব্বান্ প্রতি দর্শনমাহাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বাসাম-র্চ্চানাং বদন ভক্ত্যাবেশবিশেষাত্নপর্য্যুপরি পরিস্ফূর্ত্ত্যা শ্রীমদর্চ্চা-বিশেষায়মানস্য সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দর্শনে মাহাত্ম্য-বিশেষমাহ—বৃন্দাবন ইতি। যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিমিতি' ( ভাঃ ১।২।৬ ) "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ইতি

ন্যায়েন সুবিচারবতাং সর্ব্বসৎকর্ম্মানামেকান্তগতিং ভক্ত্যাখ্যপরমপুরুষার্থসিদ্ধিমাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।"

অনন্তর অর্চাবিগ্রহমাত্রেরই দর্শনমাহাত্ম্য সকলের প্রতি উপদেশ করে ভক্তির আবেশবশতঃ বিশেষভাবে পরিস্ফূর্তিহেতু শ্রীগ্রন্থকার শ্রীমদর্চা-বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে মাহাত্ম্য-বিশেষ বলছেন এইশ্লোকে। 'পুণ্যলোকের গতি প্রাপ্ত হন' এর তাৎপর্য এইযে, 'পুরুষের সেই পরমধর্ম যাতে শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি হয়' এই অনুসারে সমস্ত সৎকর্মের একান্তগতি ভক্তিনামক পরমপুরুষার্থসিদ্ধি প্রাপ্ত হন বলেই জানতে হবে।

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা তাঁর নিত্যপার্ষদগণই করে থাকেন। বিশ্বের সাধকগণের পক্ষে তা সম্ভবপর নয় বলে করুণাময় শ্রীহরি বিগ্রহরূপে মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করে সাধকগণের সেবা গ্রহণ এবং তাঁদের দর্শন দান করে ধন্য করে থাকেন বলে জানতে হবে।

(৪২) আরাত্রিক দর্শন—আরাত্রিক-কালে শ্রীমূর্তির দর্শন। আরাত্রিক বা আরতি বড়ই প্রীতির অনুষ্ঠান। আরাত্রিক কালে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমুখ দর্শনে মহাপাতকাদি নাশ ও মহাফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

(৪৩) শ্রবণ—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং সপরিকর তাঁর লীলাকথা কর্ণস্পর্শ হলেই তাকে শ্রবণ বলা হয়। এই

শ্রবণাঙ্গভক্তিই ভজনরুচির আদ্য ও শ্রেষ্ঠ। শ্রবণব্যতীত ভক্তি এবং ভজনাঙ্গের পরিচয় ও মহিমাদি কিছুই জানা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কথারূপে শ্রবণকারীর হৃদয়ে প্রবেশ করে কামনা-বাসনা নাশ করে সেই হৃদয়ে ভক্তির প্রকাশ করেন। আবার মহদ্‌গণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণেরই বিশেষ মহিমা। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং তস্য তাদৃশ প্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ। ........ তত্রাপি সবাসনমহানুভাবমুখাৎ সর্ব্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ) অর্থাৎ শ্রবণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই পরমশ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দসমূহের অচিন্ত্য প্রভাব বিদ্যমান। শ্রীভাগবতের প্রারম্ভেই মহামুনি বেদব্যাস বলেছেন, শ্রীভাগবতকথা শ্রবণ দূরে থাক্ শ্রবণের ইচ্ছা হলেই শ্রীভগবান্ শ্রবণেচ্ছাকারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন। (ভাঃ ১।১।২) তেমনি ভাগবত বেদরূপ কল্পতরুর সুপরিপক্ক ফল—সুতরাং প্রতি পদে পদে স্বাদ্য। এখানে ভাগবত বলতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীল গোস্বামিপাদগণ যে সব রসগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচনা করেছেন, সেগুলিও ভাগবত বলেই জানতে হবে।

শ্রীভাগবতীকথা আবার যদি সবাসন মহানুভবের মুখে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, অর্থাৎ ব্রজরসের উপাসকগণ যদি নিজ রসাশ্রয়ী কোন মহতের নিকট থেকে শ্রবণ করেন; তাহলে তা

তাঁদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলেই জানতে হবে। আবার যিনি শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করবেন তিনি যেরূপে শ্রবণ করলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি জন্মিবার পক্ষে অনুকূল হয়, সেইপ্রকার একান্ত চিত্ত হয়েই শ্রবণ করবেন, পরে শ্রুতবিষয়ের মনন করবেন। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করতে করতে অবিলম্বে শ্রীহরি স্বয়ংই এসে শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকেন। "প্রযত্নং বিনা ভগবান্ স্বয়মেব হৃদি বিশতি।" (শ্রীধর স্বামী)

(৪৪) তৎকৃপাবলোকন—শ্রীভগবানের কৃপার দিকে চেয়ে থাকা। শ্রীভগবানের কৃপার যোগ হলেই সাধকের সাধন-প্রয়াস সফলিত হয়। ইক্ষুদণ্ড স্বভাবতঃ রসপূর্ণ হলেও যেমন পেষণ ব্যতীত সেই রস নিষ্কাসিত হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ স্বতঃই কৃপারসপূর্ণ হলেও সাধকের ভজন-পরিশ্রম বা উৎকণ্ঠাময় ভজন-ব্যতীত সেই কৃপারস নিঃসৃত হয় না। তাই উৎকণ্ঠিত-সাধক ভজন করতে করতে তার সাফল্যের নিমিত্ত সতত শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দিকে তাকিয়ে থাকেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" (১০।১৪।৮)

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপ্রসঙ্গে বল্লেন, "হে প্রভো! 'করে

তোমার দয়া হবে' এই কৃপার প্রতীক্ষায় যিনি আত্মকৃত বিপাক (সুখ দুঃখাদি) ভোগ করতে করতে কায়-মনো-বাক্যে তোমাকে প্রণামপূর্বক ভজনে রত থাকেন সুপুত্র যেমন পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, তেমনি তিনি তোমাকে প্রাপ্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন।" এইশ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ যা লিখেছেন তার তাৎপর্য এইযে, সর্বসাধন ত্যাগ করে যিনি কেবল ভক্তিরই যাজন করছেন, তিনিই তোমায় লাভ করতে পারেন; এই প্রকরণার্থ জেনে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, কিরূপে ভক্তি যাজন করেন? তদুত্তরে বলছেন—যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করতে করতে কায়-মনো-বাক্যে তোমার ভজনে রত থাকেন। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল সুখ এবং অপরাধাদির ফল দুঃখ ভোগ করতে করতে শেষে ঐ সুখ-দুঃখকে ভগবৎকৃপার ফলস্বরূপে জানেন। পিতা যেমন পুত্রকে সময়ে সময়ে দুগ্ধ ও নিম্বরস কৃপাপূর্বক পান করান, কখনও আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন, আবার কখনও বা চপেটাঘাত করেন। এইপ্রকারে পুত্রের হিতাহিত যেমন পিতাই জানেন, সেইরূপ আমার হিতাহিত আমার প্রভুই জানেন, আমি জানি না। আমি তাঁর ভক্ত, আমার প্রতি কাল-কর্মাদির কোনই অধিকার নাই, আমার প্রভুই কৃপা করে আমায় সুখ-দুঃখাদির ভোগ করায়ে থাকেন। এই বিশ্বাসে যিনি কায়-মনো-বাক্যে শ্রীভগবানকে প্রণাম করতে করতে জীবনধারণ করেন, তিনি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল সংসারমুক্তি এবং মুখ্য ফল

শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সেবালাভের অধিকারী। পিতৃসম্পদ্ প্রাপ্তি-বিষয়ে যেমন পুত্রের বেঁচে থাকাই কারণ, তেমনি ভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তের ভক্তিমার্গে অবস্থানই হেতু। অতএব সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের নিরুপাধি কৃপার প্রতি দৃষ্টি রেখে ভক্তকে সদৈন্য ভক্তিজীবন যাপন করতে হবে।

(৪৫) স্মরণ—যে কোনরূপে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির সহিত মনঃসংযোগকেই স্মরণ বলা হয়। শ্রীহরিস্মৃতিই ভক্তিসাধনার প্রাণস্বরূপ। স্মৃতিহীন যন্ত্রবৎ ভজন নিষ্প্রাণ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-বচন—

"স্মৃতেঃ সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষন্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥"

'যে শ্রীহরির স্মৃতিমাত্রে জীব সকল কল্যাণভাজন হয় সেই অজ ও নিত্য শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি।' শ্রীপাদ জীব-গোস্বামিচরণ ভক্তিসন্দর্ভে লিখেছেন—"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মান-মপি যচ্ছতি। কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ॥" (ভাঃ ১০।৮০।২১) "স্মরতঃ স্মরতে। সাক্ষাৎপ্রাদুর্ভূয় আত্মানং স্মর্ত্তৃর্বশীকরোতি ইত্যর্থঃ।" 'জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজচরণকমল-স্মরণকারী ভক্তের নিকটে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয়ে আত্মদান করে থাকেন। অর্থাৎ স্বয়ংই স্মরণকারী ভক্তের বশীভূত হয়ে থাকেন। তখন ভক্তের অনতিবাঞ্ছিত অর্থ, কামাদির কথা আর কি বলতে হবে।' স্মরণ পঞ্চবিধ যথা—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও

সমাধি। যথাকথঞ্চিৎভাবে শ্রীহরির নাম-রূপাদি চিন্তনের নাম 'স্মরণ'। অন্য বিষয় থেকে মনকে আকর্ষণ করে সামান্যাকারে নাম রূপাদিতে মনোনিবেশ 'ধারণা'। বিশেষভাবে রূপাদি চিন্তনের নাম 'ধ্যান'। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি'। ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণের নাম 'সমাধি'।

শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের সঙ্গে স্মরণও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে এদের মধ্যে কখন যে কোন্‌টি কোন্ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পরিণত হয় তার কোন সীমারেখা নেই। এক অবস্থায় যে নাম শ্রবণ অথবা কীর্তনের বিষয়ীভূত হলেন, সেই নামই আবার স্মরণের উদ্দীপনের হেতু হয়ে থাকেন। অতএব কীর্তন ও স্মরণকে পরস্পর পরিপোষক বললে উভয়ের কার্য-কারণ হিসাবে অভেদ সিদ্ধ হয়।*

(৪৬) ধ্যান—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তন। অতএব এই ধ্যান চার প্রকার। রূপধ্যান—শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যানকে সর্বদুঃখ-নিবর্তক বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে যে ধ্বজ বজ্র, অঙ্কুশাদি ঊনবিংশতি চিহ্ন বিদ্যমান, তার প্রত্যেকটিরই ধ্যানকারীর ভক্তির বাধক বিশেষ বিশেষ অনর্থনাশ এবং ভক্তি বা প্রেমদান বিষয়ে প্রবল শক্তি বিদ্যমান। আবার শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যময় রূপের ধ্যানে ধ্যানকারীর চিত্ত-

---

* রাগানুগাভজনবিজ্ঞানে স্মরণের সবিশেষ বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

ভৃঙ্গ সেই রূপমাধুর্যে এমনি আকৃষ্ট হয় যে, কৃষ্ণেতর বস্তুর চিন্তনে মন আপনি অরুচি প্রাপ্ত হয়।

গুণধ্যান—যাঁরা ভক্তিভরে সদাকাল শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য কারুণ্যাদি গুণের ধ্যান করেন, তাঁরা ভজনের নিখিল অনর্থরাজি বিনষ্ট করে হরিলোকে গমন করেন। প্রগাঢ় মনঃসংযোগই ধ্যান, এই ধ্যানই সাধনের প্রাণবস্তু। এই ধ্যান বা প্রগাঢ় মনঃস যোগের ফল অতীব বিস্ময়জনক। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়—

"যত্র যত্র দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥"
(ভাঃ ১১।৯।২২-২৩)

শ্রীঅবধূতগীতায় ধ্যানের অচিন্ত্যপ্রভাব বিষয়ে বর্ণিত আছে—দেহী জীব স্নেহ, দ্বেষ কিম্বা ভয় হেতু মনকে যে কোন বিষয়ে নিশ্চলভাবে ধারণ করে সেই ধ্যেয় বস্তুরই সমানরূপতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত—কোন কীট যখন পেশস্কৃত (কুমরে পোকা) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার গর্ত্তের মধ্যে নিরুদ্ধ হয়, সেই দুর্বলকীট ভয়হেতু নিরন্তর ঐ পেশস্কৃতের ধ্যানের ফলে দেহত্যাগ বিনাই পেশস্কৃতের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ধাতৃদেহের ধ্যেয়স্বরূপের তুল্যাকার প্রাপ্তি ধ্যানেরই অচিন্ত্যপ্রভাব বলে বুঝতে হবে। সুতরাং সচ্চিদানন্দমূর্তি শ্রীভগবদ্রূপধ্যানের ফলে সাধক যে

সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হবেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

লীলাধ্যান—সর্বমাধুর্যের সার অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের লীলা যিনি ধ্যান করেন, তিনি মাধুর্যরসে নিমগ্ন হন।*

সেবাধ্যান—শ্রীহরির মনোময়ী প্রতিমার মানসোপচারে সেবা।

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং সদা।
পরে বাঙ্মনসাঽগম্যং তং সাক্ষাৎপ্রতিপেদিরে॥"
(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত—পুরাণ-বাক্য)

'মানসোপচারে নিরন্তর শ্রীহরির সেবা করে কোন কোন ভক্ত বাক্য-মনের অগোচর সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে দর্শন করেছেন।' শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই শ্লোকের টীকায় ব্রহ্মবৈবর্তের একটি উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠানপুরে এক সরলবুদ্ধি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর ভগবৎ সেবায় লালসা থাকলেও দরিদ্রতা বশতঃ পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহে তিনি অসমর্থ ছিলেন। একদা তিনি বৈষ্ণবসভায় ভাগবতধর্ম শ্রবণের জন্য গমন করলেন এবং তথায় শুনলেন যে, কেউ যদি বাহ্যে সেবার উপচার সংগ্রহে অসমর্থ হন, তিনি মনে মনে উপচার

---

* লীলাধ্যান বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রাগানুগাভজন-বিজ্ঞানে দ্রষ্টব্য।

কল্পনা করে মনোময়ী প্রতিমার অর্চনা করলেও অর্চনার ফল পাবেন। একথা শুনে বিপ্রের মনে আনন্দ হল। তিনি সঙ্কল্প করলেন নিত্য মানসোপচারে মনোময়ী প্রতিমার পূজো করবেন। ব্রাহ্মণ একদিন গোদাবরী নদীতে স্নান করে নির্জনস্থানে উপবেশন পূর্বক মনে মনে শ্রীহরির মন্দিরাদি নির্মাণ করে তাতে মনোময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন ও মনে মনে মহারাজোপচারে সেবা করে পরম আনন্দলাভ করলেন, এইভাবে বিপ্রের নিত্য মানসসেবা চলতে লাগল। একদিন মনে মনে সঘৃত পরমান্ন পাক করে স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করে শীতলকরবার জন্য তালবৃন্তের পাখারদ্বারা বীজন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে উহা শীতল হয়েছে কিনা জানবার জন্য মনে মনে তাতে নিজের অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করালেন। অঙ্গুলীতে তাপ লাগল। মনে হল যেন অঙ্গুলী দগ্ধ হল। তাতে পরমান্ন ঠাকুরের ভোগের অযোগ্য হল ভেবে তিনি দুঃখিত হলেন। সমাধি ভঙ্গ হল। দেখলেন বাইরে আঙ্গুল দগ্ধ হয়ে পীড়া অনুভব হচ্ছে। এই ব্যাপার দেখে শ্রীহরি ঈষৎহাস্য করে বিমান প্রেরণ করে তাঁকে নিজ নিকটে আনয়ন করলেন।

(৪৭) দাস্য—'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এরূপ অভিমানে সেবা করার নামই দাস্য। "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ( চৈঃ চঃ )॥" কেবল কৃষ্ণদাস অভিমানেই ভজনসিদ্ধি। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভ-

বতীতি।” (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০৪ অনুঃ) ‘পরিচর্যাদি ভজনপ্রয়াস দূরে থাক, কেবল দাসাভিমানেই সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়ে থাকে।’ তিনি ইতিহাসসমুচ্চয় থেকে প্রমাণ চয়ন করে স্বমতের সমর্থন দেখিয়েছেন -

“জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥”

অর্থাৎ ‘সহস্র সহস্র’ জন্মের সৌভাগ্য ফলে ‘আমি বাসুদেবের দাস’ এই অভিমান যাঁর উদয় হয়, তিনি সকললোককে উদ্ধার করতে পারেন।’ অন্যান্য ভজনাঙ্গগুলিও এই দাস্যসম্বন্ধেই শ্রেষ্ঠতর হয়ে থাকে। “তদেতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতি” (ভক্তিসন্দর্ভ) এই দাস্য কি, শ্রীজীবপাদ সেও নিরূপণ করেছেন—“নমঃ-স্তুতি-সর্ব্বকর্ম্মার্পণ-পরিচর্য্যা-চরণস্মৃতি-কথাশ্রবণাত্মকং দাস্যম্” অর্থাৎ নমস্কার, স্তুতি, সর্বকর্ম সমর্পণ, পরিচর্যা,চরণস্মৃতি ও কথাশ্রবণাত্মক দাস্যই এখানে অভিপ্রেত। শ্রীহরির দাসগণের সর্ববিধ সাধন, সাধ্য প্রভৃতি সুসিদ্ধ হয়ে থাকে, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

“যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥”

(ভাঃ ৯।৫।১৬)

অর্থাৎ ‘সম্যক্ ভজনের কথা দূরে থাক, যাঁর নাম শ্রবণমাত্রই পুরুষ বিশুদ্ধ হয়ে থাকে, সেই তীর্থপদ শ্রীভগবানের দাস-

গণের কোন্ বস্তুই বা অপ্রাপ্য থাকে ?' শ্রীযুগলউপাসক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজেকে শ্রীরাধার দাসী অভিমানে ভজন করে থাকেন ( রাগানুগাভজনবিজ্ঞানে ইহা বিস্তারিতভাবে বলা হবে ) ।

(৪৮) সখ্য—বন্ধুর ন্যায় প্রীতিমূলক বিশ্বাসময় ভাবকেই 'সখ্য' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস এবং মিত্রতা স্থাপনপূর্বক তাঁর হিতের এবং সুখের জন্য বন্ধুবৎ চেষ্টার থেকেই সখ্যভাবের প্রকাশ হয়। এই সখ্য প্রীতিমূলক মিত্রভাবময় বলে শ্রীভগবানকে মনুষ্যবৎ দর্শন করার জন্য এবং মিত্রবুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করার জন্য কোন কোন মহাত্মা তাঁর মন্দিরে শয়ন করে থাকেন।

অতএব এই সখ্য কেবল সাধ্য বিশেষই নয়, এর সাহায্যে প্রেমলাভ হয় বলে এ সাধনরূপেও গৃহীত হয়েছে। সর্বসুহৃদ্ শ্রীভগবান্ নিত্যই ভক্তের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন এবং ভক্তও নিজ-স্বভাবানুসারে নিত্যই শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। এই পারস্পরিক হিতশংসনময় প্রীতিমূলকভাব অবিচ্ছেদ্যরূপে বিদ্যমান থাকে। অতএব সখ্যময় সাধনদ্বারা এই স্বাভাবিক প্রীতির বিশেষভাবে উন্মেষ হয়ে থাকে বলে ইহা সাধ্য হয়েও সাধন।

(৪৯) আত্মনিবেদন—দেহের থেকে আত্মা পর্যন্ত সমস্ত পদার্থের সমস্তভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনের কার্য হচ্ছে নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধ্য-সাধনাদি তাঁতেই সমর্পণ এবং তাঁর জন্যই নিখিল চেষ্টা।

এই আত্মসমর্পণ গো-বিক্রয়সদৃশ। গো-স্বামী যতদিন নিজেকে গরুর অধিকারী বলে মনে করে ততদিন তার ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণা.দির চিন্তা তাকে করতে হয়। সে গরু বিক্রয় করলে আর তার সেজন্য কোন চিন্তা থাকে না, সে চিন্তা ক্রেতাই করে থাকে। তদ্রূপ যত.দিন মনুষ্য মায়িক অভিমানবশতঃ দেহ-দৈহিকাদিকে 'আমি' 'আমার'বলে মনে করে, ততদিন তার ভরণ-পোষণ ও রক্ষার জন্য তাকে চিন্তা করতে হয়: ভক্তিপথাশ্রয় করে দেহাদি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করলে ভক্তের আর নিজের জন্য কোন চিন্তা থাকে না। তখন তাঁর চিত্ত স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণচরণে আসক্ত হয় এবং তিনি নিশ্চিন্তে শ্রীহরির ভজন করে ধন্য হতে পারেন। "শরণ লঞা কৃষ্ণে করে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম॥" ( চৈঃ চঃ )

(৫০) নিজপ্রিয়োপহরণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রিয়দ্রব্য অর্পণ করা। শ্রীভগবানে নিবেদনের উপযোগী এবং শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে যে দ্রব্য লোকসমাজে উৎকৃষ্ট বলে প্রসিদ্ধ এবং যে বস্তু নিজেরও প্রিয়তম, সেই সেই বস্তু শ্রীভগবানে নিবেদন করলে তার ফল অনন্ত হয়ে থাকে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ধৃত শ্রীভাগবতবচন —

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"
( ভাঃ ১১।১১।৪১ )

এখানে 'নিজের প্রিয়তম' বলতে যে দ্রব্য শাস্ত্রবিহিত এবং নিবেদনের যোগ্য, সেই দ্রব্যই বুঝতে হবে। ভক্তের নিজ প্রিয় দ্রব্য কখনই নিবেদনের অযোগ্য হতে পারে না কারণ ভক্ত কখনই অপবিত্র দ্রব্য স্পৃহা করেন না। টীকাকার বলেন, 'যচ্চাতি-প্রিয়মাত্মনঃ" পদে যে 'চ' কার আছে, উহার অর্থ "শ্রীভগবানেরও প্রিয়"। সে সকল দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করলে তার ফল অনন্ত হয়ে থাকে।

(৫১) শ্রীকৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা—ভক্তের অখিলচেষ্টা শ্রী-কৃষ্ণের প্রীতির জন্যই হবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত পঞ্চরাত্রবচন—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

'হে মুনে! যাঁরা ভক্তিলাভে ইচ্ছুক, তাঁরা লৌকিক ও বৈদিক যে সব কর্ম করবেন, শ্রীহরির সেবানুকূলেই করবেন।' শুদ্ধভক্তিতে ভক্ত কোন কর্ম করে পরে তা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন না তাঁর সমুদয়কর্ম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত অর্পিত হয়েই কৃত হয় বলে জানতে হবে।

(৫২) শরণাপত্তি—ভক্তিসাধনার মূলস্তম্ভই শরণাগতি। যাঁর যে পরিমাণে শরণাগতি, তাঁর সেই পরিমাণে সাধন-ভজনে অগ্রগতি। কায়মনোবাক্যে শরণাগত হয়ে ভক্ত ভজন-সাধনে আনন্দ লাভ করেন।

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥"

যিনি মুখে বলেন, 'হে ভগবন্! আমি তোমারই এবং মনেও তদ্রূপ জানেন এবং দেহে তাঁর লীলাস্থান আশ্রয় করে শরণাগত আনন্দানুভব করে থাকেন।' এই শরণাগতি ছয় প্রকার -

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥"

ভগবদ্ভজনের অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প, প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ, 'শ্রীভগবান্ আমায় রক্ষা করবেন' এরূপ বিশ্বাস, শ্রীভগবানকেই পালকরূপে বরণ করা, আত্মসমর্পণ এবং কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্যের সহিত প্রার্থনা—এই ছয়প্রকার শরণাগতি। এরমধ্যে 'গোপ্তৃত্বে বরণং' অর্থাৎ শ্রীভগবানকেই পতি বা পালকরূপে বরণ এইটি অঙ্গী, অপর পাঁচটি অঙ্গ। এই শরণাগতি ভিন্ন তদীয়ত্ব সিদ্ধ হয় না বলে এর অপূর্বত্ব জানতে হবে। "অস্যাশ্চাপূর্ব্বত্বং ত্বাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ"(ভঃসঃ ২৩৭ অনুঃ) এই শরণাগতির দ্বারাই অন্যান্য ভজনাঙ্গও সিদ্ধ হয়ে থাকে।

(৫৩) তদীয় সেবন—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের সেবা। এখানে 'তদীয়' বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন বলতে তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত এই চার বস্তুকে বুঝায়। "তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥" ( চৈঃ চঃ )

(৫৪) শাস্ত্রসেবা—ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সেবা।

"বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রানি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্কান্দবচন )

'যাঁরা গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অর্চনা করেন, তাঁরা সর্বপাপ বিমুক্ত হয়ে দেববন্দিত হন। যাঁর গৃহে লিখিত বৈষ্ণবশাস্ত্র বিরাজ করেন, তাঁর গৃহে শ্রীনারায়ণ দেব স্বয়ং বসতি করেন।' বেদ-কল্পতরুর সুপরিপক্বফল সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতই মূল বৈষ্ণব-শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের রসমাধুর্যে যাঁরা তৃপ্ত হয়েছেন, অন্যশাস্ত্রে তাঁদের রতি হয় না। শ্রীল গোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোপালচম্পূ, শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ইত্যাদিও ভাগবত। এই সব গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ ও পূজাদির দ্বারাও শ্রীমদ্ভাগবতেরই সেবা হয়ে থাকে।

(৫৫) শ্রীমথুরা সেবা—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময়ী লীলাধাম মথুরা-মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ; মথুরায় গমন, দর্শন, স্পর্শ,

ধামের আশ্রয় গ্রহণ, সম্মার্জনী ও জলাদি দ্বারা সংস্কার করলে অভীষ্ট লাভ হয়ে থাকে। ভঃ রঃ সিঃ ধৃত শাস্ত্রবচন—

"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥"

(আদিবারাহ)

"মথুরা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি অন্যতীর্থে রতি করে অর্থাৎ অন্যত্র বাস করতে ইচ্ছুক হয়, সেই মূঢ়ব্যক্তি শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে সংসারে ভ্রমণ করে।" আবার—

"ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্ দুর্ল্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

'ত্রৈলোক্যমধ্যবর্তি যাবতীয় তীর্থের সেবা করলেও যে পরানন্দময়ী বা প্রেমলক্ষণা সিদ্ধি দুর্লভাই থাকে, মথুরা স্পর্শমাত্রেই তা সুলভ হয়।'

(৫৬) শ্রীবৈষ্ণবসেবা—প্রসঙ্গরূপা এবং পরিচর্যারূপা সেবার দ্বারা বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধান। শ্রীহরিকথা, শ্রীহরিনাম শ্রবণাদি করায়ে বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধানকে প্রসঙ্গরূপা সেবা বলা হয় এবং মহাপ্রসাদাদি, পাদসম্বাহনাদি দ্বারা বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধানকে পরিচর্যারূপা সেবা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি তাঁর নিজসেবা অপেক্ষাও ভক্তের এই দ্বিবিধ সেবাকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" (ভাঃ ১১।১৯।২১) "অভ্যধিকা

মৎসন্তোষবিশেষং জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোঽপীত্যর্থঃ” (টীকা—শ্রীল বিশ্বনাথ) ভক্তের সেবায় আমার সেবা অপেক্ষাও আমার অধিক সন্তোষ হয় জেনে আমার ভক্তের সেবা করবে। শ্রীমন্মহাদেব দেবীর প্রতি বলেছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

(পদ্মপুরাণ)

"সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও তদীয় বৈষ্ণবগণের আরাধনা সমধিক শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সেবায় শ্রীভগবান্ অতি সহজেই প্রসন্ন হয়ে থাকেন।" তিনি শ্রীমুখে বলেছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥"

(আদিপুরাণ)

'হে পার্থ ! যাঁরা আমার ভক্ত, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আমার ভক্ত নন, কিন্তু যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত—তাঁরাই আমার প্রকৃত ভক্ত।' কারণ ভক্তের সেবার ফলে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মে অতিতীব্র প্রেমোৎসব জাত হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৭।১৯) বলেন—

"যৎ সেবয়া ভগবতঃ কুটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥"

"হে মুনে! আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের পরিচর্যার দ্বারা ত্রিকালসত্য ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের চরণযুগলে তীব্র প্রেমোৎসব জাত হয়ে থাকে।*

(৫৭) বৈভবানুসারে মহোৎসব—সাধুগণ যাঁর ফল প্রশংসা করেন, এরূপ নামসঙ্কীর্তনবহুল বৈষ্ণবভোজনাদি আনন্দজনক ব্যাপারবিশেষকে মহোৎসব বলা হয়। স্বীয় বৈভব বা অবস্থা অনুসারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মহোৎসব বিধেয়, নতুবা সম্পত্তিমান্ গৃহীভক্তের বিত্তশাঠ্য দোষ হয়। মহোৎসবে শ্রীনাম-প্রচারের সহিত সাধু-বৈষ্ণবের সেবাও সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

(৫৮) কার্তিকাদি ব্রত - শ্রীনিয়মসেবা ব্রত। অপরমাস অপেক্ষা কার্তিকমাসে নিয়মপূর্বক বিশেষ আদর যত্নের সহিত পাঠ কীর্তন শ্রবণ ও শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের সেবাদি করতে হয়। কারণ এসময় অল্প ভজন করলেও শ্রীরাধাদামোদর তা বহু বলে মনন করে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীব্রজধাম আশ্রয় করে এই নিয়মসেবা ব্রতের অনুষ্ঠান করলে সহসা সুদুর্লভা হরিভক্তি লাভ হয়ে থাকে।

"ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিস্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরে॥

---

* বৈষ্ণবলক্ষণ ও বৈষ্ণবসেবাদির বিষয় ভক্ততত্ত্ববিজ্ঞানে দ্রষ্টব্য।

সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরসেবনাৎ॥”

( ভঃ রঃ সিঃ ধৃত পদ্মপুরাণবাক্যম্ )

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—“তথাবিধা চ সা নাযোগ্যে সহসা দাতুং যোগ্যেতি যাবদযোগ্যতা তাবদ্ভগবতা ন দীয়ত এব। যোগ্যতা চ সর্ব্বান্যস্বহিতনিরপেক্ষত্বমেব। তস্মাদ্ যোগ্যতায়ামেব সত্যাং দাতব্যত্বেঽপি যদি মথুরাকার্ত্তিকয়োঃ সঙ্গমে পূজনং ঘটতে তদা যোগ্যতা বিরহিতেনাপি বস্তুপ্রভাবাৎ সহসৈব প্রাপ্যত এবেতি ভাবঃ।”

শ্লোক ও টীকার তাৎপর্য এইযে, মথুরাব্যতীত অন্যত্র পূজিত হলে শ্রীকৃষ্ণ আসক্তিশূন্য অযোগ্য ভজনকারীকে ভুক্তি মুক্তি দান করেন, কিন্তু আত্মবশ্যকারী ভক্তি সহজে প্রদান করেন না। স্ববিষয়ক আসক্তি দেখেই ভক্তি দান করেন: আসক্তি রহিত অযোগ্য ভজনকারীকে ভক্তি দেন না। যেহেতু অযোগ্য ভজনকারীর বশ্যতা স্বীকার উচিৎ নয়। যাবৎ ভজনকারীর যোগ্যতা লাভ না হয়, তাবৎ ভক্তি দেন না। যোগ্যতা হচ্ছে, ভক্তিতেই স্বহিত চিন্তা ও অন্য সর্বত্র নিরপেক্ষতা। কিন্তু যদি মথুরায় ( ব্রজমণ্ডলে ) কার্তিকমাসে একবারমাত্রও শ্রীদামোদরসেবা সংঘটিত হয়, তাহলে যোগ্যতারহিত জনও বস্তুপ্রভাবে সহসা সুদুর্লভা হরিভক্তি লাভ করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এইশ্লোকের টীকায় লিখেছেন, ‘যদা মথুরায়াং কার্ত্তিকে

শ্রীদামোদর-পূজনং ঘটেত, তদা তৎপ্রভাবাদেবান্যসাধনশূন্যৈ র্নরৈঃ সহসা প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ 'কার্তিকমাসে ব্রজমণ্ডলে শ্রীদামোদর-পূজা সংঘটিত হলে অন্যসাধনশূন্য জনও সহসা ভক্তি লাভ করে থাকেন।

(৫৯) জন্মাষ্টমী আদি উৎসব—শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং অন্যান্য ভগবদবতারগণের আবির্ভাব তিথিতে উৎসব। শ্রীহরির আবির্ভাবতিথিতে উপবাস শ্রীহরির নাম, গুণ, লীলাদি শ্রবণ-কীর্তনে পরমানন্দ লাভ এবং পরদিনে বৈষ্ণবসেবাদি মহামহোৎসব। এই জয়ন্তীব্রত পালনে শ্রীহরির প্রীতি এবং অকরণে প্রত্যবায়।

(৬০) শ্রীমূর্তির চরণসেবায় প্রীতি—প্রীতির সহিত শ্রীমূর্তির সেবা। "মম নাম-সদাগ্রাহী মম সেবা প্রিয়ঃ সদা। ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন॥" (ভঃ রঃ সিঃ ধৃত আদিপুরাণ বচন) 'যিনি সর্বদা আমার নাম গ্রহণ করেন এবং সর্বদা আমার সেবাপ্রিয়, আমি তাঁকে ভক্তিদান করি, মুক্তিদান করি না।' "বিগ্রহ নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন" এই জ্ঞানে শ্রীমূর্তির সেবাটি স্বাভাবিক প্রীতিময় হয়ে উঠে। শ্রেষ্ঠ উপাসকগণ এই জ্ঞানেই বিগ্রহসেবা করে থাকেন।

(৬১) শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদ—রসিক ভাগবতগণ সঙ্গে শ্রীভাগবতের অর্থসমূহের রসাস্বাদ গ্রহণ করা। শ্রীভাগবতের প্রারম্ভেই ভাগবতকে নিগম কল্পতরুর রসময় ফল বলে রসিক ভাগবত-

গণকে এর আস্বাদনের নিমিত্ত সাদরে আহ্বান জানানো হয়েছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥" ( ভাঃ ১।১।৩ )

'হে রসিক ! ( ভক্তিরসজ্ঞ ) হে ভাবুক ! ( রসবিশেষ ভাবনাচতুর ) শ্রীশুকমুখ থেকে নিঃসৃত শিষ্য-প্রশিষ্যাদি ক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ রসময় অর্থাৎ ত্বগষ্টি প্রভৃতি হেয়াংশ-রহিত তরল পানযোগ্য শ্রীমদ্ভাগবতনামক বেদকল্পতরুর সুপরিপক্ক ফল আপনারা মুক্তাবস্থাতেও পুনঃ পুনঃ পান করতে থাকুন।' ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও এই লীলারসের মাধুর্য সাতিশয় চমৎকারিত্ব-পূর্ণ বলেই নির্গুণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন শুকমুনির চিত্ত ভাগবতরসে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তিনি বেদব্যাসের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতা-খ্যান অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি স্বয়ং মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বলেছেন—

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে ! আখ্যানং যদধীতবান্ ॥"
( ভাঃ ২।১।৯ )

'হে রাজর্ষে ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মানুভবে নিমগ্ন ছিলাম ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় আমি

পিতার নিকট এই ভাগবতাখ্যান অধ্যয়ন করেছি।' রসিক ভক্ত-গণসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন প্রেমপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন।

(৬২) সাধুসঙ্গ—সদাচার-পরায়ণ ভক্তিনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তই 'সাধু,' তাঁদের সঙ্গ সতত বাঞ্ছনীয়। সমবাসন, স্নিগ্ধস্বভাব ও নিজ থেকে ভজনের উচ্চতর কক্ষায় স্থিত সাধুর সঙ্গে পরমকল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" ( চৈঃ চঃ ) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-বচন—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

( ভাঃ ১।১৮।১৩ )

'অত্যল্পকাল সাধুসঙ্গ যে ফলদান করে, কি স্বর্গ, কি অপবর্গ, কিছুই তার সহিত তুলনীয় হয় না। জগতের নশ্বর রাজ্য-সম্পদাদি যে তুলনীয় হবে না, তা বলাই বাহুল্য।' শ্রীজীবপাদ বলেন, সমবাসন সাধুসঙ্গেরই এতাদৃশ প্রভাব দর্শিত হয়েছে।

ভগবৎকৃপা সাধুসঙ্গ এবং সাধুকৃপাকে বাহন করেই জীবান্তরে সংক্রমিত হয়—স্বতন্ত্রভাবে হয় না। ভগবৎকৃপাই ভক্তি-লাভের মুখ্য-কারণ বা স্বতঃসিদ্ধ উপায় হলেও সেই ভগবৎকৃপা সাক্ষাৎ সাধুর মূর্ত্তি ধারণ করেই বিশ্বে বিচরণ করছেন। এই মূর্ত ভগবৎকৃপাকে উপেক্ষা করে পরোক্ষ ভগবৎকৃপার সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত কিছুই নয়।

সাধুসঙ্গ এবং সাধুসেবা বলতে কেবল সাধুদের নিকট গমন, অবস্থান, খেচরান্নাদি ভোজন করানো প্রভৃতিই বুঝায় না। সাধুর পরিচর্যা এবং তাঁদের মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণাদি করে তার মনন ও তাঁদের উপদেশাবলির আচরণ বা ভজন-সাধন করাই যথার্থ সাধুসঙ্গ।*

(৬৩) নামসঙ্কীর্তন —এই নামসঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "ন হ্যতঃ পরমোলাভো দেহীনাং ভ্রাম্যতামিহ। যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যেত সংসৃতিঃ॥" এই বিশ্বে নানা-যোনীতে ভ্রমণরত জীবের পক্ষে নামসঙ্কীর্তনে রুচি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুই নেই। যার আনুষঙ্গিকফলে সংসারনাশ ও মুখ্যফলে ভগবৎপাদপদ্মে প্রেমলাভ রূপ পরমাশান্তির সন্ধান পেয়ে জীব ধন্য হয়ে থাকে।

"যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ 'যিনি সহস্র সহস্র জন্ম শ্রীবাসুদেবের সেবন করেছেন, তাঁরই মুখে শ্রীহরিনাম সতত বিরাজ করেন।' এইশ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, "এতাদৃশস্যাপ্যস্য পুনঃ-পুনর্জন্ম—সমুৎকণ্ঠাময়ভক্তিবর্দ্ধনার্থং পরমেশ্বরেচ্ছয়ৈব জ্ঞেয়ম্।"

* ভক্ততত্ত্ববিজ্ঞানে ভক্তসঙ্গ মহিমা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ 'শ্রীবাসুদেবের সেবানিষ্ঠ ভক্তের পুনঃপুনঃ জন্ম সমুৎকণ্ঠাময় ভক্তিবর্ধনের নিমিত্ত পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে বলে জানতে হবে।'

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥" ( চৈঃ চঃ )*

(৬৪) শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি এটি একটি অতি অন্তরঙ্গ ভজনাঙ্গ। এই মথুরামণ্ডলে একদিনমাত্র বাস করলেও মুক্তদিগের প্রার্থনীয় হরিভক্তি লাভ হয়ে থাকে। অভীষ্ট লীলাকথায় রত হয়ে সর্বদা ব্রজেবাস করাই প্রকৃত মথুরামণ্ডলে স্থিতি বা ব্রজবাস। প্রীতির সহিত মথুরামণ্ডলে বাস করলে সহসা ভাবভক্তির উদয় হয়। মথুরা স্পর্শমাত্রেই নিরপরাধজনের ভক্তিলাভ হয়ে থাকে এটিই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কারণ পরব্যোমোপরি চিন্ময় প্রেমধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনই ভূমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকটিত রয়েছেন যথা।—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে – নাহিক নিয়ম॥

---

* নামতত্ত্ববিজ্ঞানে সঙ্কীর্তন-মহিমা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥” ( চৈঃ চঃ )

যদ্যপি এই পাঁচটি অঙ্গ পূর্বেও লিখিত হয়েছে বটে তবু এদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনের জন্য পুনরায় লিখিত হল। শ্রীমূর্তি, শ্রী-ভাগবত, শ্রীভক্ত, শ্রীনাম ও শ্রীমথুরা —এই পাঁচটি দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্যশালী সাধনাঙ্গ। এই সাধনপঞ্চকে শ্রদ্ধার কথা দূরে থাক, এর স্বল্পমাত্র সম্বন্ধ হলেই নিরপরাধজনের সহসা ভাবের আবির্ভাব হয়ে থাকে।

“সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঅঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥” ( চৈঃ চঃ )

## ভক্তির ক্রমবিকাশ।

উল্লিখিত ভক্তিঅঙ্গসমূহ কি ভাবে ক্রমশঃ পরিপক্বদশা লাভ করে এবং সাধক ভাব ও প্রেমস্তরে উন্নীত হন, সে বিষয়ে শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন—

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥”

"প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, অতঃপর রুচি, তদনন্তরে আসক্তি, তারপর ভাব, তৎপরে প্রেমের উদয় হয়। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবের এইটিই প্রায়িক ক্রম।"

উত্তমাভক্তি— সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে ত্রিবিধ। শ্রদ্ধার থেকে আসক্তি পর্যন্ত সাধনভক্তি, তারপর ভাব-ভক্তি অতঃপর প্রেমভক্তি। সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা হলেও আপাত প্রতীতির নিমিত্ত ত্রিবিধ আখ্যায় অভি-হিত হয়েছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি দ্বারা সাধনীয়া ভক্তি-কেই 'সাধনভক্তি' বলে। এই সাধনভক্তিই সাধকের শুদ্ধ বা পরিমার্জিত চিত্তে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রকটন করে থাকেন। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি ভক্তি অপ্রাকৃত হলেও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়ে স্বয়ংই আবির্ভূত হয়ে থাকেন। "নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥" ( চৈঃ চঃ )

(১) শ্রদ্ধা - মহতের নিকট শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা তাঁর বাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম 'শ্রদ্ধা'। 'আদৌ শ্রদ্ধা' এই শ্রদ্ধাই ভজনের প্রথম সোপান এবং ভজন-সাধনের মূল। শ্রদ্ধা-বান্ ব্যক্তিই ভজনবিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন। আমরা

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ ইতিপূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।* এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভজনের অধিকারী। শ্রদ্ধা জাত হলে ভজনবিষয়ে ঔদাসীন্য থাকে না। ভজনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ জন ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় নিমিত্ত তাদৃশ মহতের অন্বেষণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শ্রীগুরুপদাশ্রয় ঘটে। এইটিই দ্বিতীয় সোপান সাধুসঙ্গ।

(২) সাধুসঙ্গ—প্রথম সৎসঙ্গে সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধালাভ, তৎপরে ভজনাকাঙ্ক্ষায় দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ—সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়। 'সাধু' বলতে এখানে যাঁরা ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণপূর্বক তাঁতে প্রীতিস্থাপন করে সেই প্রীতিকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন, তাঁরাই সাধু। 'সঙ্গ' বলতে সাধুর সেবা পরিচর্যাদি, তাঁদের মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, তাঁদের আচরণের অনুসরণ, তাঁদের মহিমা কীর্তনাদি কায়িক, বাচিক ও মানসিক অভিনিবিষ্টতাই 'সাধুসঙ্গ'। অতঃপর সাধুগণমধ্যে যাঁকে শ্রীগুরুরূপে আশ্রয় করার একান্ত অভিলাষ, তাঁর নিকট দীক্ষা-শিক্ষাদি গ্রহণ।

(৩) ভজনক্রিয়া—শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান। এই ভজনক্রিয়া দ্বিবিধ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা।

---

* 'শ্রদ্ধা কাকে বলে' এই অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

• ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গবর্ণনায় শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন দ্রষ্টব্য।

অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় প্রথমভজনে প্রবৃত্ত সাধককে কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করে নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় পৌঁছাতে হয়। শ্রদ্ধাশীল ভক্ত সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করে যখন ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন প্রথমে তাঁর চিত্তে ভজনবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনবরত সাধন ভজন করার উৎসাহ হয়। এজন্য এই অবস্থার নাম উৎসাহময়ী। এই অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হয় না। অল্প দিনেই সেই উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে। অবসাদ এসে ভজনে শৈথিল্য জন্মায়। ভজন কখনও ঘন কখনও বা তরল—এই অবস্থা অতিক্রম করে তাঁকে চলতে হয় বলে বিজ্ঞগণ একে 'ঘন-তরলা' বলেন। এই সময়ে ভক্তের চিত্তে নানারূপ সঙ্কল্প-বিকল্পের উদয় হয়। যেমন—'সংসার ছেড়ে বনে যেয়ে একান্তে ভজন করব, অথবা সংসারে থেকেই ভজন করব, শ্রবন-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির একটি আচরন করব, না সবগুলিই করব' ইত্যাদি সঙ্কল্প বিকল্পের উদয় হয় বলে এই অবস্থার নাম 'ব্যূঢ়বিকল্পা'। সাধককে বিষয়ভোগের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়, কখনও বিষয়ভোগের জয় হয় কখনও নিজের জয় হয়, এইভাবে চলতে থাকে বলে সেই অবস্থার নাম 'বিষয়সঙ্গরা'। ভজনের প্রভাবে বিষয়-ভোগ-বাসনার ক্ষয় হয়ে শ্রীভগবদ্ভজনে অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া দরকার। কিন্তু ভক্ত ভজনের যে নিয়মগুলি গ্রহণ করেন, সেগুলিকে সব সময় ঠিক-ভাবে ধরে রাখতে পারেন না বলে এই অবস্থার নাম 'নিয়মাক্ষমা'। যাঁরা ভজন করেন, স্বভাবতঃই সকলে তাঁদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে

থাকেন। এতে ভক্তের নিকট লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপস্থিত হয়। এদের ভক্তিকল্পলতার উপশাখা বলা হয়েছে এবং প্রথমেই এগুলিকে ছেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে অবস্থায় ভক্ত নিজ ভজনক্রিয়াকে এই সব তরঙ্গে রঙ্গ করতে দেখেন সেই অবস্থার নাম 'তরঙ্গরঙ্গিণী'।

(৪) অনর্থনিবৃত্তি—অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় যা সাধককে সাধনভূমি থেকে নামিয়ে দেয়; তাকেই অনর্থ'বলা হয়। এইসমস্ত অনর্থ চতুর্বিধ—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। প্রাচীন ও অর্বাচীন পাপকর্ম থেকে যে সব অনর্থের উদ্গম হয় তাকে দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ বলে। পুণ্যকর্মজনিত ভোগাভিনিবেশের ফলে যে সব অনর্থের উদ্রেক হয়, তা সুকৃতোত্থ অনর্থ। নামাপরাধ, সেবাপরাধ থেকে যে সব অনর্থের উদ্ভব হয় তার নাম অপরাধোত্থ অনর্থ। লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠা থেকে যে সব অনর্থের উদ্ভব হয়, তাই ভক্ত্যুত্থ অনর্থ। সাধক যদি এই সব অনর্থে অভিভূত না হয়ে সৎসঙ্গে ভজন-সাধন করেন, পুনরায় মহৎনিন্দাদি অপরাধের উদ্গম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে দৈন্যাবলম্বনে ভজন করে যান, তাহলে শ্রীভগবৎ কৃপায় অচিরে তাঁর সঞ্চিত অনর্থসমূহ বিনষ্ট হয়ে নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় প্রবেশ লাভ ঘটে।*

---

* চতুর্বিধ অনর্থের মধ্যে অপরাধোত্থ অনর্থ ই ভজনের প্রবল বিঘাতক, যা বিশেষভাবে শ্রীনামতত্ত্ব বিজ্ঞানে বিবৃত হবে।

(৫) নিষ্ঠা—নিষ্ঠাই নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া। "শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিষু যত্নস্য শৈথিল্য-প্রাবল্য এব হ্যস্যাজ্যে সংভবন্তী নিষ্ঠিতা-নিষ্ঠিতে ভক্তি প্রদর্শয়েতামিতি সংক্ষেপতো বিবেকঃ।" (মাধুর্য-কাদম্বিনী ৪র্থ বৃষ্টি) অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদিতে যত্নের শৈথিল্য এবং প্রাবল্যই অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা ভক্তি জানার সংক্ষিপ্ত বিবেক প্রণালী। লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ এই পাঁচটি অন্তরায়ের অভাবই নিষ্ঠার চিহ্ন। কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণের কালে উত্তরোত্তর নিদ্রার উদ্গমের নাম 'লয়'। কীর্তন, শ্রবণাদি কালে ব্যবহারিক বার্তার সম্পর্ককেই বিক্ষেপ বলা হয়। লয় বিক্ষেপ না থাকলেও কখন কখন যে শ্রবণ-কীর্তনাদিতে অসামর্থ্য বোধ হয়, তারই নাম 'অপ্রতিপত্তি'। শ্রবণ, কীর্তনাদি ভজন-কালে ক্রোধ, লোভ, গর্বাদির সংস্কারই 'কষায়'। বিষয়সুখোদয় হেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনভিনিবেশের নাম 'রসাস্বাদ'। এই পঞ্চবিধ অন্তরায়ের অপগমে ভজনে যে নৈশ্চল্য তাঁরই নাম 'নিষ্ঠা'।

(৬) রুচি—সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের, নাম, রূপ, গুণ লীলা-দির অনুভবজ আস্বাদবিশেষের নামই 'রুচি'। এই রুচি দ্বিবিধ—বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী ও বস্তুবৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী। কীর্তনাদিতে সুমিষ্ট সুর-তালাদির অপেক্ষায় ভগবল্লীলাদিতে যে রুচির আধিক্য দেখা যায় তা বস্তুবৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী। মন্দক্ষুধা যেমন উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদির অপেক্ষা রাখে তদ্রূপ। অনপেক্ষিণীরুচি কিন্তু সুর-

তালাদির অপেক্ষা রাখে না। শ্রীভগবানের নাম, গুণাদির শ্রবণ-কীর্তনে পরমোল্লাস জাগিয়ে থাকে। আর সুর-তালাদির বস্তু-বৈশিষ্ট্য থাকলে তো কথাই নেই। এই অনপেক্ষিণী রুচিই প্রৌঢ়-রুচি ; তারপরই আসক্তির ভূমি।

(৭) আসক্তি—"অথ সৈব ভজনবিষয়া রুচিঃ পরম প্রৌঢ়-তমা সতী যদা ভজনীয়ং ভগবন্তং বিষয়ীকরোতি তদেয়মাসক্তি-রিত্যাখ্যায়তে। যৈব ভক্তিকল্পবল্যাঃ স্তবকীভাবমাসাদয়ন্তী ভাবপ্রেম্ণি পুষ্পফলে অচিরাদেব ভাবিনী দ্যোতয়তি।" (মাধুর্য-কাদম্বিনী ৬ষ্ঠী অম্বৃতবৃষ্টি) ভজনবিষয়া রুচি যখন প্রৌঢ়তমা হয়ে ভজনীয় শ্রীভগবানকে বিষয় করে প্রবর্তিত হয়, তখন তাকে 'আসক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। এই আসক্তি মঞ্জু কল্পবল্লীর স্তবকের ভাব প্রাপ্ত হয়ে তাতে যে অচিরায় ভাবরূপ কুসুম ও প্রেমরূপ ফল ফলবে তা জানিয়ে দেয়। আসক্তি ভক্তের চিত্ত-মুকুরকে এরূপভাবে মার্জিত করে যে, শ্রীভগবান্ যেন সহসা তাতে অবলোকিতের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকেন। পূর্বে যে চিত্ত ভগবান্ থেকে দৈবাৎ বিচ্ছিন্ন হলে সাধককে বুদ্ধিপূর্বক শ্রীভগবানে সংযোজিত করতে হত, আসক্তিতে তা হয় না, ইহা স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধরে রাখে। মহাজনগণ এই অবস্থাকে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' আখ্যা দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দরিদ্রব্যক্তি যেমন সুমিষ্ট অন্নাদির প্রাপ্তিতে এবং মধুমক্ষিকা যেমন মধুপ্রাপ্তিতে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আসক্তি ভূমিকারূঢ় ভক্তের চিত্ত স্বভাবতঃই

শ্রীভগবানে এবং তাঁর নাম, গুণ, লীলাদিতে আসক্ত হয়ে থাকে। এই আসক্তিই সাধনভক্তির চরমভূমি, এর পরই ভাবভক্তির রাজ্য।

(৮) ভাব বা রতি —এই ভাব বা রতিই ভক্তিকল্পবল্লীর কুসুমিত-দশা। যার সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে চিন্ময় ভগবল্লোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ভগবান্ মধুসূদনকে আমন্ত্রণ করে ভক্তের নিকট আনয়ন করে। আসক্তি গাঢ় হয়েই রতিদশা প্রাপ্ত হয়। জাত-রতি সাধক সাক্ষাৎকারের ন্যায় স্ফূর্তিতে শ্রীভগবানের অলৌকিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অনুভব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এইদশায় সাধকের অহংতা সিদ্ধস্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে সাধকশরীর যেন ত্যাগ করেই অবস্থান করে। মমতা মধুকরীর ন্যায় অভীষ্টের শ্রীপাদপদ্ম-মকরন্দ পানে মত্ত হবার উপক্রম করে। ভাবভক্তির কতকগুলি লক্ষণ আছে এইগুলিই ভাবভক্তির পরিচায়ক।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ—১।৩।২৫-২৬)

ক্ষান্তি অর্থাৎ চিত্তক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অক্ষোভতা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করা, বিরক্তি—কৃষ্ণেতর সর্ববিষয়ে অরুচি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ—শ্রী-ভগবান্ নিশ্চয় দয়া করবেন এই আশা অন্তরে পোষণ করা,

সমুৎকণ্ঠা—ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা, সদা নাম গানে রুচি, শ্রীভগবানের নাম, গুণাদির কীর্ত্তনস্পৃহা, বৃন্দাবনাদি লীলাস্থানে বাসের প্রবল আগ্রহ—যাঁদের ভাবের অঙ্কুরমাত্র জাত হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই নয়টি অনুভাব দৃষ্ট হয়। মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্ল্লভা ভাবভক্তির এই দুটি গুণ।

(৯) প্রেম—ভক্তির পরমাবস্থার নাম প্রেম। প্রেমের উদয়ে চিত্ত সম্যক্ মসৃণতা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীভগবানে মমতাতিশয় জাত হয়ে থাকে। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী প্রেমের দুটি গুণ।

"পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ-ভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥" ( চৈঃ চঃ )*

---

* প্রেমসম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রেমতত্ত্ববিজ্ঞানে দ্রষ্টব্য।

# শ্রীনামতত্ত্ব-বিজ্ঞান

## নাম কাকে বলে ?

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে লিখেছেন— "মনোগ্রাহ্যস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিত শব্দোনামেতি" অর্থাৎ 'মনোগ্রাহ্য পদার্থের ব্যবহার নিমিত্ত কোনও সাঙ্কেতিক শব্দকে 'নাম' বলা হয়।' শব্দ প্রধানতঃ দু'প্রকার, 'ধ্বন্যাত্মক' ও 'বর্ণাত্মক'। 'স চ ধন্যাত্মকো বর্ণাত্মকশ্চ' (শব্দকল্পদ্রুম) এখানে বর্ণাত্মক শব্দের কথাই বলা হচ্ছে। মনে উদয় হয়েছে এমন কোন বস্তু বা পদার্থবিশেষকে ব্যবহার অর্থাৎ প্রকাশ বা ব্যক্ত করার জন্য যে বর্ণাত্মক শব্দসঙ্কেত নির্দেশ করা হয়, তাকেই বলা হয় 'নাম'। যেমন কোনও পিপাসার্তব্যক্তি 'জল দাও' বল্লে 'জল' শব্দটি যে কলসস্থিত পিপাসা নিবারক তরল পানীয়-পদার্থ, তা শ্রবণকারী নিজ মনে সহজেই গ্রহণ করতে পারেন। এইপ্রকার মনোগ্রাহ্যবস্তু সকলকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুরই যে বিভিন্ন শব্দসঙ্কেত আছে ঐগুলিই তাদের নাম।

'নাম' বা বর্ণসঙ্কেতদ্বারা যে পদার্থকে নির্দেশ করা হয়, তাকে বলা হয় 'নামী'। নাম এবং নামীতে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ।

নামী বা পদার্থ সকল বাচ্য এবং নাম বা পদ সকলই তাদের বাচক। নাম বা বাচক পদসকল নামী বা বাচ্য পদার্থকে জানিয়ে দিয়েই নিরস্ত হয়। নামের মধ্যে নামীর অন্য কোন গুণ থাকে না। তা না হলে জল পান না করে 'জল জল' জপ করলেও তৃষ্ণা নিবারিত হত। সুতরাং পদ বা নাম সকল পদার্থ বা নামীর নির্দেশক কেবল শব্দসঙ্কেত মাত্র। নাম ও নামী যদি ভিন্নবস্তু হয়, তা হলে নামীকে নির্দেশ করা ব্যতীত নামের মধ্যে নামীর কোন ধর্ম বা শক্তি বিদ্যমান থাকতে পারে না। আর নাম ও নামী যদি অভিন্ন হয় তবে নামীর সমস্ত গুণ সর্বশক্তিই যে নামে নিহিত থাকবে তাতে সংশয় নেই।

শাব্দিকগণ বলেন, "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ" ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ) অর্থাৎ বর্ণাত্মক-শব্দসঙ্কেত বা নাম সকল আবার দ্বিবিধ (১) আধুনিক, (২) আজানিক। যা মনুষ্য কর্তৃক রচিত জাগতিক অনিত্য পদার্থসমূহের অর্থাৎ ব্যক্তি ও বস্তুসমূহের নাম তাকে বলা হয় আধুনিক সঙ্কেত এগুলি কেবলই নামীর নির্দেশক শব্দসঙ্কেত মাত্র, নামীর কোন শক্তি বা ধর্ম এতে নেই। যে সব নাম চিন্ময়রাজ্যে বা ভগবল্লোকে অনাদিকাল থেকে আছে এবং অনন্তকাল থাকবে সেই সব চিন্ময়পদার্থের নামকে বলা হয় আজানিক সঙ্কেত। এর মধ্যে পরমেশ্বরের যে সব নাম তা নামীর থেকে সর্বথা অভিন্ন। ঈশ্বরের নামে নামীর সমস্তগুণ ও শক্তি বিরাজিত। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীভগবন্নামের

অভিন্নত্ব সংবাদ শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে একথা সর্বদা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

## শ্রীনাম ও নামীর অভিন্নত্ব।

শ্রীভগবান্ এবং তাঁর নামে কিছুমাত্র ভেদ নেই। ভগবন্নাম যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানই—শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি নিখিলশাস্ত্রের এবং তত্ত্বদর্শী মহাজনগণের এটিই সম্মিলিত অভিপ্রায়। নাম ও নামীর অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সাধুশাস্ত্রবাণীর যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে শ্রীভগবানের নাম যে কেবল শ্রীভগবানের নির্দেশক শব্দসঙ্কেত-মাত্রই নয়, তা সহজেই উপলব্ধি হয়ে থাকে। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

"শ্রীনাম নামী কৃষ্ণের অভিন্নতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই চিন্তামণিস্বরূপ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ নিত্য ও মুক্তস্বভাব।" উক্তশ্লোকে 'অভিন্ন' শব্দে নাম ও নামীর একত্ব নির্দেশিত হয়েছে। এই অভেদত্বকে প্রমাণিত করার জন্য বলা হয়েছে নাম চিন্তামণিস্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের ন্যায়ই তাঁর নামেও সর্বার্থ-দাতৃত্বাদি নিখিল গুণরাজি বিদ্যমান তাঁর নাম তাঁরই মত পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্তস্বভাব। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎজীবগোস্বামি-পাদ লিখেছেন—"নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব অপিতু চৈতন্যাদি লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ তত্

হেতুরভিন্নত্বাদিতীতি"(ভগবৎসন্দর্ভ-৪৮ অনুঃ) অর্থাৎ নামই চিন্তা-মণি যেহেতু নাম সর্বাভীষ্টপ্রদানে সমর্থ। কেবল ভগবানের ন্যায় নাম সর্বার্থপ্রদানে সমর্থ তাই নয়, পরন্তু চৈতন্যাদি-লক্ষণ যে কৃষ্ণ —সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণই নাম। নাম ও নামীর অভিন্নত্ব বলার এটিই তাৎপর্য।

"দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম —নাম, দেহ, স্বরূপবিভেদ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবানের যেমন দেহ ও দেহীতে কোন ভেদ নেই, "দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ" (কূর্মপুরাণ) তেমনি তাঁর নাম ও নামীতে কোন ভেদ নেই। জীবের স্বরূপ চিৎপদার্থ, তার দেহ জড়, পাঞ্চভৌতিক ও নশ্বর, তার নাম তার জড়ীয় নশ্বর দেহের নির্দেশক মাত্র, অতএব এগুলি পরস্পর পৃথক্ বস্তু। ইহা জীবেরই ধর্ম, ঈশ্বরের নয়। শ্রীভগবান্ এবং তাঁর নাম এক অভিন্ন-তত্ত্বেরই প্রকাশভেদ মাত্র। সুতরাং নামীস্বরূপে যে ধর্ম যে শক্তি বিদ্যমান নামস্বরূপেও তা পূর্ণরূপে বিরাজিত বলে জানতে হবে। অধিক কি, শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৪৮ অনুঃ) লিখেছেন, "অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি" শ্রীরাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্মাদির অবতারের ন্যায় শ্রীনাম পরমেশ্বরেরই সাক্ষাৎ বর্ণরূপী অবতার।

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া" ( ১।৩।২৬ ) কিন্তু শ্রীহরির বর্ণরূপী অবতার শ্রীনামে যেরূপ পতিত-পাবনত্ব, কারুণ্যাদি গুণ বিরাজিত সেরূপ অপর কোন অবতারেই দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপাদ শুক-মুনি বলেছেন—

"যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ,
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্ত-কর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং,
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥" (১২।৩।৪৪)

"আসন্ন মরণ, আতুর, পতিত, স্খলিত ব্যক্তিও বিবশদশায় যাঁর নাম উচ্চারণ করলে কর্মবন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে উত্তমাগতি লাভ করেন, কলিযুগে জনগণ সেই শ্রীহরিকে নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা অর্চনা করে না।" শ্রীনাম নামীর স্বরূপভূত বলে যে কোন রূপে কীর্তনে শ্রবণে এমন কি আভাসেও শ্রীভগবানের প্রীতির কারণ হয়ে থাকে বলে মহাপাতকীরও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। শ্রী-মদ্ভাগবতে শ্রীঅজামিলের উদ্ধার প্রসঙ্গে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের প্রতি বলেছেন—

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" (ভাঃ ৬।২।৯-১০)

"চোর, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নী-গামী, স্ত্রী-রাজা-পিতৃ-গো-হন্তা, অন্যান্য নিখিলপাতকিগণের পক্ষে শ্রীনারায়ণের নামই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করা মাত্র নামোচ্চারণকারী ব্যক্তির প্রতি তাঁর মতি হয়, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু মনে করেন, 'এ ব্যক্তি আমার, একে সর্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।'

মৃত্যুকালে মহাপাতকী অজামিল অতি ভয়াবহ যমদূতগণের দর্শনে ভীত হয়ে 'নারায়ণ' নামক নিজপুত্রকে ডেকেছিল, ভগবান্ নারায়ণকে ডাকেনি। এর নাম সঙ্কেত-নামাভাস। বহু বহু পাতক মহাপাতকের একটিমাত্র নামাভাসদ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত হয়। কেবল প্রায়শ্চিত্তই নয়, শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হয় অর্থাৎ তার দ্বারা পাপের মূল অবিদ্যা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। কেবল তাই নয় নামোচ্চারণকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রীবিষ্ণুর এরূপ মতি হয় যে, 'এ ব্যক্তি আমারই অন্য কারও নয়; সুতরাং সর্বতোভাবে একে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্তব্য।' সুতরাং পাতকী উদ্ধারে শ্রীহরির নাম-স্বরূপের ন্যায় পতিত পাবন অন্য কোন স্বরূপ নেই। তদ্রূপ শ্রীভগবানের নামস্বরূপে তাঁহা অপেক্ষা অধিক কারুণ্যগুণের কথাও জানা যায়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে লিখেছেন—

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং,
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥”

“হে শ্রীনাম! বাচ্য অর্থাৎ বিভুচৈতন্যানন্দাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ এবং বাচক অর্থাৎ ‘কৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দ’ ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাম—তোমার এই স্বরূপদ্বয় বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছেন। তন্মধ্যে আমি তোমার বাচ্যস্বরূপ অপেক্ষা বাচক-স্বরূপকেই বা নামস্বরূপকেই অধিকতর সদয় বলে জানি। কারণ যে ব্যক্তি বাচ্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে কৃতাপরাধ, তিনি তোমার বাচকস্বরূপ নাম মুখে উচ্চারণ পূর্ব্বক অপরাধ থেকে বিমুক্ত হয়ে সদা আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত হন অর্থাৎ প্রেমসুখাস্বাদনে মগ্ন হন।” এই সব প্রমানে নাম এবং নামী যে অভিন্নতত্ত্ব তা জানা যায়।

“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদে নাহি, তিন চিদানন্দ স্বরূপ ॥” (চৈঃ চঃ)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম ও তাঁর বিগ্রহ তাঁর স্বরূপ থেকে সর্বথা অভিন্ন। এখানে তাঁর ‘বিগ্রহ’ বলতে শ্রীভগবানের দেহ এবং অর্চাবিগ্রহ উভয়কেই বুঝাবে। অর্থাৎ ভগবত্তনু বা তাঁর শরীর এবং শাস্ত্রানুসারে প্রতিষ্ঠিত ও স্বয়ং প্রকাশিত শ্রীমূর্তি সকল—উভয়ই ‘বিগ্রহ’ শব্দের বাচ্য। শ্রীভগবান্ তাঁর নাম এবং তাঁর বিগ্রহ এই তিনটি একরূপ বা অভিন্ন। উল্লিখিত পয়ার থেকে যদি কারও এরূপ মনে হয় যে, শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ এই তিনটি পৃথক্ বস্তুই, কিন্তু তদীয় স্বরূপের মতই তাঁর নাম ও বিগ্রহ

চিদানন্দময় হওয়ায় চিন্ময়ত্ব নিবন্ধন তিনে ভেদ নেই এরূপ বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা সমীচীন নয়, কারণ শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁর ধাম, পরিকর চিচ্ছক্তির বৈভব সবই চিন্ময়। তাহলে চিদানন্দলক্ষণ অসংখ্যবস্তু থাকতে 'এই তিনটি একরূপ' 'এই তিনে ভেদ নাই,' এরূপ উক্তির কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না। সুতরাং কেবল চিন্ময়ত্ব হেতু এই তিনটির অভিন্নতা বলা হয় নি, স্বরূপতঃই এই তিনে অভিন্নত্ব হেতু ঐরূপ উক্তি জানতে হবে।

তার প্রমাণ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তি সকল যে শ্রীভগবৎস্বরূপ থেকে ভিন্নবস্তু নন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই বিগ্রহরূপে প্রকাশ তার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়—

"স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ
স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্তু প্রতিষ্ঠয়া ॥"

অর্থাৎ 'শ্রীভগবানের মূর্তিসকল দ্বিবিধ (১) স্বয়ং ব্যক্ত বা স্বয়ং প্রকটিত, (২) স্থাপিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে স্বয়ং ব্যক্ত মূর্তি সকলকে স্বয়ং কৃষ্ণ এবং স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সকলকে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সেই কৃষ্ণ বলেই জানতে হবে।' যেমন ব্রজের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ,শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি স্বয়ং প্রকটিত মূর্তি স্বয়ং ভগবান্‌ই। এরূপ নিত্য বা অনাদিসিদ্ধমূর্তি সুদুর্লভ বলে অর্চনাদির নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বিধানে যে সব ভগবন্মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাক্ষাৎ

ভগবানই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলেছেন—"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্" ( ভাঃ ১১।২৭।১৩ ) অর্থাৎ 'চলা ও অচলা এই দু'প্রকার প্রতিমাই জীবমন্দির।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে ( ২৮৬ অনুঃ ) শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, "প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, জীবস্য জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম 'মন্দিরং' মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ।" যদ্বা প্রতিষ্ঠা-লক্ষণেন কর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তা প্রতিমা মম তদাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ।………অথবা জীবমন্দিরং সর্ব্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ। পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎপরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি; ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্।"

টীকার অর্থ—এস্থলে প্রতিষ্ঠা' শব্দের অর্থ 'প্রতিমা'। 'জীব' শব্দের অর্থ জীবের জীবনপ্রদ পরমাত্মা যে আমি সেই আমার মন্দির। অর্থাৎ আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন আকারের আস্পদ বা স্থান। আমার অঙ্গ-প্রতঙ্গের সহিত আমার শ্রীমূর্তির কোনপ্রকার ভেদ নেই। অথবা প্রতিষ্ঠা শব্দে শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠারূপ কর্মদ্বারা পূর্বোল্লিখিত চল ও অচল প্রতিমা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অভেদাস্পদ হয়ে থাকে। অথবা 'জীবমন্দির' শব্দে সমস্তজীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা। পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দেখে থাকেন। কিঞ্চিন্মাত্র ভেদস্ফূর্তি হলেই তা

ভক্তির বিচ্ছেদক হয়ে থাকে বলে সর্বথা অভেদবুদ্ধিতেই সেবা করা কর্তব্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার॥
শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাসবিলাস।
মন্মথমন্মথ-রূপে যাঁহার প্রকাশ॥
স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন॥"

× × × × × × × × ×

"বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরু বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য-প্রকাশি করেন জগত-মোহন॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলাগুণ গান॥

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ বর্ণন॥
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি-জ্ঞান।
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর॥" ( চৈঃ চঃ )

দু'জন ব্রাহ্মণভক্তের হিতকল্পে শ্রীসাক্ষিগোপাল পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন থেকে সুদূর বিদ্যানগরে গমন করেন। উৎকলের রাজা সেই দেশ জয় করে সাক্ষিগোপালের আজ্ঞাক্রমে তাঁকে কটকে নিয়ে যান এবং সেখানে সাক্ষিগোপালের সেবা স্থাপন করেন।

"তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয়॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে॥
বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি॥

সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা – নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া॥" ( চৈঃ চঃ )

এইসব প্রমাণে অর্থাৎ মহদনুভব এবং শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্যে যেমন স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁর প্রতিমাতে কোনরূপ ভেদ নেই তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁর নামে অর্থাৎ নাম ও নামীতে কোনরূপ ভেদ নেই। কিছুমাত্র ভেদ কল্পনা করলেই মহাযাতনাময় নরকভোগ অনিবার্য।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধির্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"
( পদ্যাবলী )

অর্থাৎ "যে ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুর অর্চাবিগ্রহে ও শালগ্রামে শিলা বুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের পাদোদকে জলবুদ্ধি, নিখিল পাপাদি নাশক শ্রীবিষ্ণুর নামে ও নামাত্মক মন্ত্রে সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে অন্য দেবতার সঙ্গে সমতাবুদ্ধি হয়—সে নারকী।" এইশ্লোকে

শ্রীভগবন্নাম সম্বন্ধে যা বলা হল তার তাৎপর্য এইযে, শ্রীভগবন্নাম সকল সাধারণ শব্দের ন্যায় দৃষ্ট এবং অক্ষরাদিরূপে কথিত হলেও ইনি অক্ষরাকৃতি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবানই।

## শ্রীভগবন্নামকীর্তনমাহাত্ম্য।

বেদাদি নিখিলশাস্ত্র এবং মহাজনগণ ভগবন্নামকীর্তনের মহিমা মুক্তকণ্ঠে গান করেছেন। ঋগ্বেদ বলেন "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ-সদিত্যাদি" ১।১৫৬।৩॥ শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যার তাৎ-পর্য—"হে বিষ্ণো তোমার নাম চিৎস্বরূপ অতএব স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যক্‌রূপে না জেনেও, সামান্য কিছুমাত্র জেনেও যদি আমরা কেবল এই অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করে যাই, তারই ফলে আমরা তোমাবিষয়িণী বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করতে পারব। যেহেতু ইহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ।

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি বলেছেন—

"গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মমসন্নিধৌ।
ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥
গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥"

'হে অর্জুন! যাঁরা আমার নাম গান করে আমার সম্মুখে নৃত্য করে থাকেন, আমি সত্য করে বলছি—আমি তাঁদের দ্বারা

ক্রীত হয়ে থাকি। যাঁরা আমার নাম গান করে আমার সম্মুখে রোদন করে থাকেন জনার্দন আমি সর্বতোভাবে তাঁদেরই ক্রীত—বশীভূত হয়ে থাকি। অপর কারও ক্রীত হই না।' মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্‌গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥"

"কৃষ্ণা যে দূরবাসী আমায় আর্তকণ্ঠে 'গোবিন্দ' বলে উচ্চস্বরে ডেকেছেন, তাঁর এই গোবিন্দ-ডাকই আমার প্রবৃদ্ধশীল ঋণ হয়ে পড়েছে, এ ঋণ আমার হৃদয় থেকে অপসৃত হচ্ছে না।" বৃহন্নারদীয়ে শ্রীবলিমহারাজ শ্রীশুক্রাচার্যের প্রতি বলেছেন—

"জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥"

অর্থাৎ "যাঁর জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় বিদ্যমান, তাঁর বিষ্ণুলোকে গতি হয়, তাঁকে আর সংসারে আসতে হয় না" লিঙ্গপুরাণে শ্রীনারদের নিকট শ্রীশিব বলেছেন—

"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥"

অর্থাৎ 'গমনে, উপবেশনে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয়নে, ভোজনে, শ্বাসত্যাগকালে, বাক্যপূরণে কি হেলাতেও যদি কেউ কলিমর্দন হরিনাম কীর্তন করেন, তাহলে তিনি শ্রীহরির স্বরূপতা

বা মুক্তি লাভ করেন, আর ভক্তিযুক্ত হয়ে যিনি হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করে পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারেন।' শ্রীমদ্ভাগবতে নিখিল বিশ্বের পরম সাধন ও সাধ্যরূপে শ্রীনামকীর্তনেরই উপদেশ করা হয়েছে। যথা—

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

( ভাঃ ২।১।১১ )

"সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃপরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব, যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতম্, নাত্র প্রমাণং ব্যক্তব্যমিত্যর্থঃ।" ( টীকা শ্রীধরস্বামী ) সাধকগণের এবং সিদ্ধপুরুষগণেরও এর অধিক অন্য শ্রেষ্ঠ সাধন নাই এই অভিপ্রায়েই বলছেন, 'হে রাজন্! যারা সকাম সেই সকল কামী ব্যক্তিগণের এই নামসঙ্কীর্তনই সেই সেই কাম্যফলের অব্যভিচারী সাধন। নির্বিদ্যমান্ অর্থাৎ মুমুক্ষুজনের এই নামসঙ্কীর্তনই মুক্তিলাভের একমাত্র সাধন। যোগী অর্থাৎ জ্ঞানিগণেরও জ্ঞানসাধনের মুখ্যফল এই নামসঙ্কীর্তন। এবিষয়ে প্রমাণ উল্লেখ করার কোন আবশ্যক নেই, এই অভিপ্রায়েই বলা হয়েছে 'নির্ণীতং' অর্থাৎ এবিষয়ে সংশয়ের অবসর নেই।'

সাধনান্তর-নিরপেক্ষ কেবল শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ লাভ হয়ে থাকে এবং অন্য ভজনাঙ্গের অপূর্ণতাও

দূরীভূত হয়ে থাকে। এজন্য নামসঙ্কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ। এর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, "নববিধভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" ( চৈঃ চঃ ) অর্থাৎ অন্যান্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে যে ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকে, শ্রীনামকীর্তনাঙ্গ তার পূর্ণতা বিধান করে থাকেন। কারণ অন্যান্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান-ব্যাপার স্বতঃপূর্ণ নয়, শ্রীভগবন্নামের যোগেইপূর্ণ হয়ে থাকে ; শ্রীনামকীর্তন কিন্তু স্বয়ংই পূর্ণ সুতরাং তাদের অপূর্ণতা দূর করতে সক্ষম। এজন্য নাম-সঙ্কীর্তনদ্বারাই ধ্যানাদির অসাধ্য সর্বোৎকৃষ্ট ভগবৎপ্রেম লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসার ক্ষয় হয়ে যায়।

সত্য প্রভৃতি যুগের মানবগণ ধ্যানাদি কৃচ্ছ্র সাধনায় সামর্থ্যযুক্ত বলে তাঁরা জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্রে সম্পন্ন নাম-কীর্তন যে উত্তম-সাধন হতে পারে, তা বিশ্বাস করতে পারতেন না। এজন্য তাঁরা নামকীর্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত হতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে কলিযুগের সর্বপ্রকার সাধনশক্তি রহিত মানবগণ সঙ্কীর্তনদ্বারা পরমভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্তি শ্রবণ করে অনায়াসসাধ্য নাম-কীর্তনকেই সার করে থাকেন। তাই দীনজনের প্রতি অধিক দয়ালু শ্রীভগবন্নাম তাঁদের প্রতি সর্বাধিক করুণা বিতরণ করে কলিযুগের যুগধর্ম হয়েছেন। এজন্য সত্যাদির প্রজাগণ কলিতে জন্মগ্রহণের বাসনা করে থাকেন—"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলা-বিচ্ছন্তি সম্ভবম্" ( ভাঃ ১১।৫।৩৮ ) অর্থাৎ 'কলিযুগে ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্তির উপায় সুগম থাকায় সত্যাদি যুগের প্রজাগণ কলিতে

জন্মলাভের প্রার্থনা করে থাকেন।' কলির অশেষ দোষ থাকলেও "কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন সার।" (চৈঃ চঃ) এই একমাত্র মহাগুণের দ্বারা সকলদোষ নিরাকৃত হয়ে যায় এবং সত্যাদি যুগের বিদ্বান্ মানবগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের কামনা করেন।

যদিও শ্রীনামসঙ্কীর্তন দেশ, কাল, পাত্র ইত্যাদির কোন অপেক্ষাই রাখেন না অতএব সত্যাদি যুগেরও যুগধর্ম হতে পারেন; তবু দীনগামিনী শ্রীনামের করুণা দীর্ঘ আয়ু, অটুট্ সাধনশক্তি প্রভৃতির অভিমানে গর্বিত সত্যাদি যুগের মানুষের দিকে যাবার ইচ্ছা করেন না। মেঘবর্ষিত জলধারা যেমন পর্বতাদি উচ্চভূমিতে স্থায়ী হয় না, স্বভাবতঃই নিম্নভূমির দিকে ছুটে যায় এবং সেখানেই স্থায়ী হয়, তদ্রূপ শ্রীনামের কৃপা অভিমানী ব্যক্তিকে ত্যাগ করে নিরভিমান দীনজনের হৃদয়েই স্থায়ী হয়।

কলিযুগের মানবের ধ্যানাদি সাধনের সামর্থ্য নেই বলেই অনায়াসসাধ্য নামসঙ্কীর্তনের দ্বারা তাঁদের সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়ে থাকে, পরন্তু নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন নহে: এরূপ মনে করলে নামাপরাধ অনিবার্য। কেননা ধ্যান, স্মরণাদি থেকে নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শিত হয়েছে

"অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥"

"শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ সর্বপাপবিনাশন হলেও উহা বহু আয়াসসাধ্য; অতএব ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রে সম্পন্ন কীর্তন তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীনামকীর্তন সর্বথা নিরপেক্ষ সাধন বলে দেশ কাল অথবা অন্য ভক্তিঅঙ্গ মিশ্রণের অপেক্ষা রাখেন না সুতরাং কেবল সঙ্কীর্তনদ্বারাই সর্বার্থ সিদ্ধ হয় এই সিদ্ধান্ত সুসঙ্গতই হয়েছে।

শ্রীনামসঙ্কীর্তন বিষয়ে দেশ-কালাদির নিয়ম না থাকলেও এই বিশেষ কলিতে নাম সঙ্কীর্তনের প্রশস্ততার বিষয়ে শ্রীমৎ জীব-গোস্বামিপাদ লিখেছেন—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্" (ভাঃ ১১।৫।৩২) "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" ইতি। (ভক্তিসন্দর্ভ—২৭৩ অনুঃ) অর্থাৎ সকল যুগেই নামকীর্তনের সমান সামর্থ্য, কিন্তু কলিতে শ্রীভগবান্ নিজেই কৃপা করে জীবকে তা গ্রহণ করান এজন্য কলিতে কীর্তনের প্রশংসা। শ্রীভগবান্ সাধারণ কলিতে যুগাবতার রূপে কীর্তনের প্রচার করেন এবং এই বিশেষ কলিতে সপার্ষদে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম কীর্তন করে জীবকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তা গ্রহণ করান বলে এই বিশেষ কলিতে হরিনাম কীর্তনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এজন্য এই কলিতে যদি অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করতেও হয়, তা এই নামকীর্তনের সহযোগেই করতে হবে। এই জন্যই শ্রীভাগবতে কলিযুগের যুগধর্ম বর্ণনে শ্রীপাদ করভাজন ঋষি নিমিরাজের প্রতি বলেছেন, 'সুমেধাগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির

আরাধনা করেন।' "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" (ভাঃ ১১।৫।৩২)

"সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥" (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্রে শ্রীনামকীর্তনের বিপুল মাহাত্ম্য ও অনন্তশক্তি কীর্ত্তিত হয়েছে, আমরা তা যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করছি। মহাপাতকী জীবের পক্ষে শ্রীহরিনাম কীর্তন নিখিল পাপের উন্মূলক। যথা গারুড়ে—

"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥"

অর্থাৎ 'সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ অবশেও নামকীর্তন করলে মানব সদ্যই সর্বপাতক থেকে বিমুক্তি লাভ করে।' অর্থাৎ সর্বপাপ দূরীভূত হয়ে ভক্তিলাভ করে ধন্য হয়।

পাপনাশের কথা কি, নামকীর্তনকারী নারকীর পর্যন্ত দিব্যগতি লাভ হয়; যথা শ্রীনারসিংহে

"যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥"

অর্থাৎ 'নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্তন করেছিলেন

সেই সেই স্থানে তাঁরা হরিভক্তি লাভ করে দিব্যধামে গমন করে-ছিলেন।' শ্রীনামকীর্তনকারীর সকলপ্রকার আধি-ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যথা স্কান্দে—

"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরন্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহন্ ॥"

'যাঁর নাম স্মরণ, কীর্তন থেকে যাবতীয় আধি (মনঃপীড়া) ব্যাধি (দেহপীড়া) তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি প্রণাম করি।' নামকীর্তনে সর্বপ্রকার দুঃখের উপশম হয়. যথা শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

"সর্ব্বরোগোপশমং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥"

'অনুক্ষণ শ্রীহরির নামকীর্তন সর্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রব-নাশক, সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশক ও শান্তিদ।' হরিনাম কীর্তনে মহা-পাতকী ব্যক্তিও পংক্তিপাবন হয়ে থাকেন। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবন ॥"

অর্থাৎ 'মহাপাতকীও যদি সতত হরিনাম কীর্তন করেন তা হলে তিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হয়ে পংক্তিপাবন হন বা দ্বিজশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।' নামোচ্চারণকারীর প্রতি কলি-বাধা থাকে না; যথা শ্রীবৃহন্নারদীয়ে—

"হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥"

'যাঁরা নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব এই নাম সমূহ কীর্তন করেন, তাঁদের প্রতি কলির কোন আধিপত্য থাকে না।' শ্রীহরিনামকীর্তন সর্ববেদের অধিক ; যথা স্কান্দে -

"মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥"

'হে তাত ! ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠে কিছুই প্রয়োজন নেই। গোবিন্দাদি হরিনামই কীর্তনীয়, তুমি তাই সতত গান কর।' শ্রীহরিনাম কীর্তন সর্বতীর্থের অধিক ; যথা বামন পুরাণে—

"তীর্থকোটী সহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তনাৎ ॥"

'শত শত সহস্র সহস্র তীর্থসেবার ফল শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্তন থেকে লাভ করা যায়।' শ্রীহরিনাম কীর্তন সর্বপ্রকার সৎকর্মের অনন্তগুণে অধিক ; যথা স্কন্দপুরাণে—

"গো-কোটীদানং গ্রহণে খগস্তপ্রয়াগগঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞায়ুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্নসমং শতাংশৈঃ॥"

'সূর্যগ্রহণে কোটী গাভীদান প্রয়াগ-গঙ্গোদকে কল্পবাস, অযূত যজ্ঞ ও মেরুপ্রমাণ সুবর্ণদান— এসব গোবিন্দনাম কীর্তনের শতাংশের একাংশের তুল্যও নয়।' শ্রীহরিনাম কীর্তন সর্বার্থ প্রদাতা; যথা স্কান্দে—

"এতৎ ষড়বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

"অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর নামসঙ্কীর্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়বর্গের বিনাশ কামাদি রিপুগণের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল।" শ্রীহরিনামে সর্বশক্তি নিহিত আছে ; যথা স্কান্দে—

"দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরা শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥"

"যা দান, ব্রত, তপস্যা তীর্থক্ষেত্রাদিতে স্থিত এবং শ্রেষ্ঠ দেবগণের সর্বপাপহারিনী ও মঙ্গলদায়িনী যে শক্তিসমূহ, রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে যা নিহিত আছে, ভগবান্ শ্রীহরির সেই সমূহ শক্তিই আকর্ষণ করে নিজনামে অর্পণ করেছেন।" নাম উচ্চারণকারীকে নাম বিশ্ববন্দিত করে থাকেন; যথা বৃহন্নারদীয়ে –

"নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥"

'যাঁরা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দন প্রভৃতি নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্বত্র বন্দিত হন।' শ্রীহরিনাম অগতির গতি; যথা পাদ্মে—

"অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥"

"যে সব মানবের অন্য গতি নেই, যাঁরা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞান-বৈরাগ্যরহিত, ব্রহ্মচর্যাদি বর্জিত সর্বধর্মাচার বিহীন তাঁরা একমাত্র বিষ্ণুর নাম কীর্তনদ্বারা সুখে যে গতি লাভ করেন, সমুদয়-ধার্মিকগণ মিলিত হয়েও তা পান না।" মুমুক্ষুগণকে শ্রীহরিনাম অনায়াসে বিমুক্তি দান করে থাকেন ; যথা বারাহে—

"নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং স হি॥"

'জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব প্রভৃতি নাম সর্বদা কীর্তন করেন তাঁরা ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে যুক্ত হন।' হরিনাম কীর্তন মানবকে অনায়াসে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি করান ; যথা নন্দীপুরাণে—

"সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥"

"যিনি সর্বদা ও সর্বকালে পাপকর্মাদিতে রত, তিনিও নামকীর্তন প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।" শ্রীহরিনামকীর্তন শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা জাত করান ; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

"নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্‌প্রপীড়িতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ॥"

'হে বিপ্রগণ! ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিতে ক্লিষ্ট হয়েও যাঁরা সতত শ্রীহরির নাম কীর্তন করেন, তাঁদের প্রতি শ্রীহরি অতিশয় প্রসন্ন হন।' শ্রীহরিনামকীর্তনই জীবের পরমপুরুষার্থ ; যথা স্কান্দে ও পাদ্মে—

"ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্‌যদ্দামোদর-কীর্ত্তনম্॥"

'শ্রীদামোদর নামকীর্তনই একমাত্র মঙ্গল ইহাই ধনার্জন এবং জীবনেরও একমাত্র ফল।' শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ নামসঙ্কীর্তনকে ভক্তিরও ফল বলেছেন—

"তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সদেবাব্যভিচারতঃ॥"

( বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫ )

'ভক্তিরসিকগণ নামসঙ্কীর্তনকেই ভক্তির ফল বলে মনে করেন। কারণ নামসঙ্কীর্তনই অব্যর্থ ভগবৎপ্রেমসম্পদ্ জাত করে থাকেন এর কখনও ব্যভিচার হয় না।' এইশ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল গোস্বামিপাদ লিখেছেন—"অহো কিং বক্তব্যং শ্রেষ্ঠসাধনমিতি, সাধ্যমপি তদেব কৈশ্চিন্মন্যতে ইত্যাহুঃ তদেবেতি, নামসংকীর্ত্তনমেব। তত্র রসিকৈর্নামসংকীর্ত্তন-লম্পটৈঃ। ননু সর্ব্বেষামপি সাধনভক্তিপ্রকারাণাং প্রেমৈব ফলমিত্যভিপ্রেতং

সত্যং, নামসংকীর্ত্তনে সতি প্রেম্নঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ উপচারেণ তদেব ফলং মন্যত ইত্যাহুঃ ভগবদিতি, ভগবতি প্রেম্নঃ সম্পত্তৌ সম্পন্নতায়াং সদৈব নামসংকীর্ত্তনস্য অব্যভিচারত আবশ্যকহেতুত্বাদিত্যর্থঃ।" টীকার তাৎপর্য—অহো! শ্রেষ্ঠসাধন নামসংকীর্তনের মহিমা আর কি বলব? ভক্তিরসিকগণ একেই সাধ্য বলে নিশ্চয় করেছেন। যদি কেউ বলেন, সর্বপ্রকার সাধনভক্তির ফল প্রেম, নামসংকীর্তন তার সাধন; তবে একে ফল বলা হচ্ছে কেন? তদুত্তরে বল্লেন, সত্যই, কিন্তু নামসংকীর্তনে প্রেমোদয়ের অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু নামসংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলে গণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই নিয়মের কখনও ব্যভিচার হয় না। এজন্য সাধুগণ নামসংকর্তনকেই ভক্তির ফল বলে থাকেন। নামসংকীর্তন করলেই ভগবানে প্রেমসম্পদ্ স্বতঃই সিদ্ধ হয়ে থাকে বলে নামসংকীর্তনই সাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলেছেন—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি—সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥" ( চৈঃ চঃ )

## শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীভগবানের নাম শ্রীভগবানেরই ন্যায় যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তা আমরা বলেছি। এই হিসাবে তাঁর সকল নামই সমান; তথাপি নাম-মাহাত্ম্যের দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ

নামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারা যায়। নাম ও নামী যখন অভিন্নতত্ত্ব তখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাদির নামের থেকে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বৈশিষ্ট্য থাকাই স্বাভাবিক। শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে মৎস্য, কূর্মাদি সব অবতারাপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের পরাবস্থার কথা শাস্ত্রদৃষ্টে জানা যায়। সুতরাং তাঁদের নাম অপেক্ষা 'রাম' নামের শ্রেষ্ঠতা পদ্মপুরাণাদিতে কীর্তিত হয়েছে। সমস্ত দেবতার নাম অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্তন শ্রেষ্ঠ, আবার শ্রীবিষ্ণুর সহস্র-নামের তুল্য এক রামনাম। দেবীর প্রতি শ্রীমন্মহাদেবের উক্তি—

"রামো রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥"

শতনামস্তোত্রেও রামনামের এরূপ মহিমার কথা শোনা যায়—

"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃঙ্ নামসহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্॥"

শ্রীবিষ্ণুর এক একটি নাম সববেদপাঠ অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ। এরূপ বিষ্ণুর সহস্রনাম একটি রাম নামের তুল্য। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়—

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥"

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম তিনবার পাঠ করলে যে ফল হয়, একবার শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলে জীবের সেই ফল লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং এক কৃষ্ণনাম যে তিন রামনামের সমান ফলপ্রদ তা বুঝতে

পারা যায়। এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণনামের মহামহিমা অবগত হওয়া যায়। রামনামকে তারক বা মুক্তিপ্রদ এবং কৃষ্ণনামকে পারক বা প্রেমপ্রদ বলা হয়েছে। "মুক্তি হেতুক 'তারক' হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান॥" (চৈঃ চঃ) সুতরাং বিভিন্ন শাস্ত্রবাণী এবং আচার্যের অনুভব থেকে বুঝতে পারা যায় যে, শ্রীভগবানের সকল নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, "নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।" 'হে অর্জুন! আমার সকলনাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামই মুখ্যতম। আস্বাদনের দিক্ দিয়েও শ্রীকৃষ্ণনাম অতুলন। যথা প্রভাসখণ্ডে—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

'হে শৌনক! যিনি মধুর অপেক্ষাও সুমধুর, সমূহ মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, যিনি নিখিল বেদ-লতিকার অতি উপাদেয় ফল, চিদেক স্বরূপ, সেই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাপূর্বক কিম্বা অবহেলাপূর্বক একবার মাত্র পরিগীত হলেই মনুষ্যমাত্রকে পরিত্রাণ করে থাকেন।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ তাঁর বিদগ্ধমাধব নাটকে লিখেছেন—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"

"যিনি জিহ্বায় নৃত্য করে বহু জিহ্বা লাভের নিমিত্ত বাসনা জাগান, কর্ণে অঙ্কুরিতা হয়ে ( ঈষৎ স্পর্শমাত্রেই ) অর্বুদ-সংখ্যক কর্ণলাভের স্পৃহা বিস্তার করেন, চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয়ে সর্বন্দ্রিয়-ব্যাপারকে স্তিমিত করে দেন, জানি না 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয় কত প্রভূত অমৃত দিয়ে রচিত।" পদকর্তা শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর মহাশয়ের উল্লিখিত শ্লোকের পদ্যানুবাদ অতি অতুলন—

"মুখে লইতে কৃষ্ণনাম,          নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়ায়—অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাইয়া,          ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া,          কে জানি গঢ়িল ইহা,
'কৃষ্ণ' এই দু'আঁখর করি ॥
আপন মাধুরী গুণে,          আনন্দ বাঢ়ায় কাণে,
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ,          যবে হয় তবে নাম,
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
'কৃষ্ণ' দু-আঁখর দেখি,          জুড়ায় তপত আঁখি,
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।

যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম-উনমাদ॥
যে কাণে পশয়ে নাম, সে তেজয়ে আন্ কাম,
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্য-স্থান, সব রস কৃষ্ণনাম,
এ যদুনন্দন দাস কয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"
(শিক্ষাষ্টকম্)

'যা আনন্দসিন্ধুকে বর্ধিত করে, যার প্রতিপদেই পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন লব্ধ হয়, যা নিখিল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সকলের পরাতৃপ্তি বিধায়ক—সেই শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছেন।' শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥"
(বৃঃ ভাঃ—২।৩।১৬২)

"কৃষ্ণনামামৃতরস এক বাগিন্দ্রিয়ে উদিত হয়ে স্বীয় মধুররসে সমুদয় ইন্দ্রিয়কে আপ্লাবিত করে থাকেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুগের সব মানুষকেই কৃষ্ণনাম বলতে দ্বাত্রিংশবর্ণাত্মক 'হরেকৃষ্ণেতি' মহামন্ত্র বা তারকব্রহ্ম নাম করতেই উপদেশ দিয়েছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর॥"

উল্লিখিত পয়ারগুলিতে "ইহা সবে জপ গিয়া করিয়া নির্ব্বন্ধ" এইবাক্যে মহামন্ত্র নিয়মপূর্বক সংখ্যাজপের কথা বলা হয়েছে এবং "সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর" এই বাক্যে অসংখ্যাত উচ্চকীর্তনের উপদেশও প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে বুঝা যাচ্ছে 'হরেকৃষ্ণেতি' দ্বাত্রিংশবর্ণাত্মক নাম যুগপৎ জপ্য ও উচ্চস্বরে কীর্তনীয়। কেউ কেউ বলেন, 'মন্ত্রের উচ্চস্বরে কীর্তনের বিধান নেই, "হরেকৃষ্ণেতি" নাম যখন মহামন্ত্র, তখন উহা সংখ্যাপূর্বক জপ্যই; কীর্তনীয় নয়।' এবিষয়ে বক্তব্য

এইযে, যাতে বীজ এবং 'স্বাহা' প্রভৃতি শব্দ থাকে এবং যা চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত তাকেই মন্ত্র বলা হয়,তাই-ই জপ্য—কীর্তনীয় নয়। সম্বোধনাত্মক 'হরেকৃষ্ণেতি' নামে এগুলি কিছুই নেই। সুতরাং ইহা যে জপ্য এবং বহুপ্রকারে কীর্তনীয়ও হবে, এবিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কোন সংশয় থাকতে পারে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রে, মহাজনবাণীতে এমনকি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে ও আচরণে তার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সংক্ষেপে দু'একটির উল্লেখ করছি। শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

"হরের্নামমহামন্ত্রৈ র্নশ্যেৎ পাপপিশাচকম্।
হরেরগ্রেস্বনৈরুচ্চৈর্নৃত্যং স্তন্নামকৃন্নরঃ।
পুনাতি ভুবনং বিপ্র! গঙ্গাদি সলিলং যথা।
হরে প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ।
করতালাদি সন্ধানং সুস্বরং কলশব্দিতম্॥"

"যে কোনব্যক্তি শ্রীহরির অগ্রে হরিনাম মহামন্ত্র নৃত্যাদিপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, তাঁর পাপরূপ পিশাচ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গঙ্গাদি পবিত্র নদীর জল যেমন জগতকে পবিত্র করে, সেইপ্রকার করতালাদি সংযোগে সুমধুর কণ্ঠে ষোড়শনামাত্মক মহামন্ত্র যাঁরা উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্তন করতে করতে শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁরা জগতকে পবিত্র করে থাকেন॥" যাঁরা বলেন, মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে করলেও সংখ্যাপুর্বকই জপ করতে হয় অসংখ্যাত কীর্তনের কোন প্রমাণ নেই। তাঁরা উল্লিখিত পদ্মপুরাণ-বাক্যে

সহজেই বুঝতে পারবেন যে, করতালাদি সংযোগে নৃত্যসহকারে কীর্তন অসংখ্যাতই হয়, সংখ্যাপূর্বক হয় না।

শ্রীল কবিকর্ণপূর কর্তৃক রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে -

"ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ সমবদদতীবপ্রমুদিতো,
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্বদ মুহুরিতি শ্রীময়তনুঃ।
ততোঽসৌ তং প্রোচ্য প্রতিবলিতরোমাঞ্চললিতো
রুদংস্তত্তৎ কর্ম্মারভত বহুদুঃখৈর্বিদলিতঃ ॥"

"গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণকালে যখন নাপিত ক্ষুর হস্তে নিয়ে ও শোকভরে কিছুতেই তদীয় সুকুঞ্চিত কেশরাশি ক্ষৌর করতে পারছেন না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাকে উচ্চৈঃস্বরে 'হরে-কৃষ্ণেতি' মহামন্ত্র পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতে বললেন। তখন নাপিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে করতে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে রোদন করতে করতে ক্ষৌরাদি কার্য করেছিলেন।" এটিও যে অসংখ্যাত উচ্চকীর্তন, তা নিশ্চিত, কারণ ক্ষৌর করতে করতে সংখ্যা রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র কেবল যে অসংখ্যাত উচ্চকীর্তনের উপদেশই করেছেন তা নয়, নিজেও তা করেছেন। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে লিখেছেন—"হরে কৃষ্ণ নাম সেহ বলে নিরন্তর" এখানে 'বলে' এবং 'নিরন্তর' কথার দ্বারা অসংখ্যাত উচ্চকীর্তন স্পষ্ট। ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাই বলেন—

"প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলি প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে এবং আচরণে যেমন অসংখ্যাত কীর্তনের বিধান পাওয়া যায়, তেমনি সংখ্যাপূর্বক জপেরও বিধান পাওয়া যায়—"হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণিঃ সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ" ইত্যাদি শ্রীমৎ রূপগোস্বামি-পাদের বাক্যে এবং নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্ হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনাবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ" ইত্যাদি শ্রীল রঘু-নাথদাস গোস্বামিপাদের বাক্যে মহাপ্রভুর সংখ্যাপূর্বক মহামন্ত্র জপও প্রমাণিত হয়। সুতরাং 'হরেকৃষ্ণেতি' মহামন্ত্র যে যুগপৎ জপ্য ও উচ্চৈঃস্বরে অসংখ্যাত কীর্তনীয়—তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। শ্রীল সার্বভৌমভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর চৈতন্যশতকে লিখেছেন—

"বিষণ্ণচিত্তান্ কলিপাপভীতান্
সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনামমন্ত্রম্।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান্ সমাদিশৎ
কুরুধ্ব সংকীর্ত্তনং নৃত্যবাদ্যৈঃ॥"

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশ্বের জনগণকে কলিপাপে ভীত এবং বিষণ্ণচিত্ত দর্শন করে স্বয়ং তাঁদের হরিনাম মন্ত্র প্রদান করেছিলেন

এবং এই মহামন্ত্র নৃত্য-বাদ্যাদি সহ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন কর বলে সম্যক্‌রূপে আদেশও করেছিলেন।" 'সমাদিশৎ' এইবাক্যের দ্বারা এইটিই বুঝা যাচ্ছে যে, মহাপ্রভু যে বিশ্বমানবকে প্রেমরসে নিমগ্ন করার সঙ্কল্প নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা উচ্চকীর্তনের দ্বারাই সম্ভবপর। কারণ জপের দ্বারা নিজের নিস্তার হয় কিন্তু উচ্চ-কীর্তনে স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলেরই শ্রবণ হয় এবং তাদেরও নিস্তার হয়ে থাকে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, "নামকীর্ত্তন-ঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্" অর্থাৎ 'এই নামকীর্তন উচ্চস্বরেই প্রশস্ত।' শ্রীল গোস্বামিপাদ প্রমাণের সঙ্গে তার কারণটিও নিরূপণ করেছেন—'তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্ত্তার কিমুত স্বেষাম্; যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন—"তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিক-বান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ-ভগবন্নাম গায়ন্ত্যু-চ্চৈর্মুদান্বিতাঃ'॥" ইতি (ভক্তিসন্দর্ভ—২৬৯ অনুঃ) অর্থাৎ 'যাঁরা উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করেন তাঁরা নিজের হিতের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিমাত্রেরও পরমহিত-সাধন করে থাকেন।. শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে প্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'হে ভগবন্! যে মহদ্‌গণ উচ্চৈঃস্বরে পরমানন্দে তোমার নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্বজীবেরই নিরুপাধি বান্ধব বলে জানতে হবে।' নামাচার্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের শ্রীমুখে উচ্চকীর্তনের উচ্চপ্রশংসা—

"জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥

অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ-জন্মা ইহারা নিস্তার যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম করিতে॥
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সংকীর্ত্তনে॥" ( চৈঃ ভাঃ )

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরেকৃষ্ণেতি' মহামন্ত্রের উচ্চকীর্তনেই বিশ্বকে প্রেমরসে আপ্লাবিত করেছেন। তদীয় অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥"
( লঘুভাগবতামৃতম্ )

'শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ অসংখ্যাত 'হরেকৃষ্ণেতি' দ্বাত্রিংশৎ বর্ণের কীর্তন বিশ্বকে প্রেমসাগরে নিমগ্ন করতে করতে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন।' শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ "তদাহ্বয়াঃ"শব্দের টীকায় লিখেছেন, "কৃষ্ণনামানি" অর্থাৎ এই ষোলটি নামই 'কৃষ্ণ' নাম। এইনামই মনুষ্যমাত্রকে উদ্ধার করে প্রেমরসে নিমগ্ন করতে সক্ষম।

## শ্রীহরিনাম গ্রহণের প্রকার।

প্রেমলাভের একতম অব্যর্থ সাধনা শ্রীহরিনাম গ্রহণের প্রকার বা রীতি সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলেছেন—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" (চৈঃচঃ)

অর্থাৎ "তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হয়ে, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে, নিজে অমানী হয়ে অন্যকে সম্মান দিয়ে সর্বদা হরিকীর্ত্তন করবে।"* শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইশ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপনধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥" (চৈঃ চঃ)

---

* এইশ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকম্' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য

একমাত্র অপরাধব্যতীত শ্রীহরিনামের অব্যাহত শক্তিকে কুণ্ঠিত করতে পারে এমন কোন অনর্থ নেই। শ্রীস্বরূপদামোদর ও রামানন্দরায়ের নিকট শ্রীহরিনাম গ্রহণের এই রীতিটি ব্যক্ত করে মহাপ্রভু সাধুনিন্দাদি নামাপরাধের মূলেই কুঠারাঘাত করে-ছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সাধকগণকে দৈন্যাবলম্বনে নামকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়েছেন। দৈন্যই ভক্তিসাধনার প্রাণবস্তু। যে ভাব চিত্তে উদিত হয়ে সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিজেকে অসাধারণ অসমর্থ ও অধমবুদ্ধি জন্মায় বিজ্ঞগণ তাকেই 'দৈন্য' বলে থাকেন। ভক্তসাধকের নাম-সাধনায় এই দৈন্যই বৈষ্ণবনিন্দাদি ভক্তির বিঘাতক বা প্রতিকূল অপরাধকে অপসারিত করে সাধ-কের প্রতি শ্রীনামের প্রসন্নতা আকর্ষণ করে। কেউ যেন মনে না করেন, আগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই দৈন্যের যোগ্যতা অর্জন করে তারপরই নামকীর্ত্তন করা উচিৎ। শ্রীনামকীর্ত্তনের প্রভাবে মহাপ্রভুর কথিত দৈন্য সাধকের চিত্তে অচিরায় স্বয়ং উদিত হয়ে সাধককে নিরপরাধে নামকীর্ত্তনের যোগ্যতা দান করে থাকে। প্রেমলাভেচ্ছু সাধকগণকে অপরাধগুলির প্রতি সতর্কদৃষ্টি রেখে দৈন্যাবলম্বনে নামকীর্তন করতে হবে—এটিই নামসাধকগণের প্রতি সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ। দশবিধ নামাপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হচ্ছে। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

(১) "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥"

অর্থাৎ "সাধুগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে থাকে। যে সব নাম-নিষ্ঠ সাধুগণ কর্তৃক শ্রীনামের মহিমা বিশ্বে প্রচারিত হন, শ্রীনাম সেই সব সাধুগণের নিন্দা কিরূপে সহ্য করবেন?" দশবিধ অপরাধের মধ্যে এটিই অতি প্রবল, তাই একে মহদপরাধও বলা হয়। প্রায়শঃ এই অপরাধটিই নাম-সাধকগণের ভজনের বিঘাতক হয়ে থাকে। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে সর্বপ্রধান হওয়ায় এটিই আগে উক্ত হয়েছে। এখানে 'নিন্দা' অর্থে দোষকীর্তন। 'নিন্দনং দোষকীর্ত্তনম্' (ভাঃ) সাধুরপ্রতি নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, সাধুদের কার্যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ, সাধুর প্রতি বিদ্বেষ, দ্রোহাদি আচরণ বুঝতে হবে। সাধুগণের নিন্দাই যখন সর্বপ্রধান অপরাধ, তখন তাঁদের প্রতি দ্বেষ, দ্রোহাদি আচরণে যে কি পরিমাণ অপরাধ সৃজিত হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

অনেকে মনে করেন, সাধু যদি নিন্দনীয় কার্য করেন, তার সমালোচনায় কোন দোষ হয় না। কারণ তা'ত সত্য কথা। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ ধারণাও অপরাধজনক। কারণ সাধুর-দোষ কীর্তনকেই 'নিন্দা' বলা হয়েছে, তাতে সত্য মিথ্যার কোন প্রশ্ন নেই। 'সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ' এই বাক্যে দোষ কীর্তন মাত্রই নিষিদ্ধ হয়েছে। এখানে 'সাধু' বলতে কাকে লক্ষ্য করা হয়েছে? এই প্রশ্ন সবার মনে জাগা স্বাভাবিক। 'সদ্ধর্ম' বা ভাগবতধর্মের আশ্রিত যাঁরা, তাঁরাই এখানে 'সাধু' পদ বাচ্য। যাঁরা মুক্তি

কামনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে একমাত্র প্রেমপ্রাপ্তি বা ভগবৎ-পাদপদ্মসেবা প্রাপ্তির কামনায় ভজননিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরাই 'সাধু'।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁর মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে লিখেছেন, 'এরূপ মনে করা সঙ্গত হবে না যে, যাঁরা কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তাঁরাই যথার্থ সাধু, তাঁদের নিন্দা করলেই অপরাধ হয়ে থাকে; কিন্তু যাঁরা ঐ সকল গুণ-সম্পন্ন নন তাঁদের নিন্দায় অপরাধ হয় না। বস্তুতঃ "সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ" তাঁদেরও যদি ভগবদ্ভজন থাকে, তাঁরাও 'সাধু' বলে পরিগণিত হবেন। কেননা অনন্য-ভজনশীল ভক্ত দুরাচার হলেও নিন্দনীয় নন, তাঁকে 'সাধু' বলেই মানতে হবে—একথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলেছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

( গীতা—৯।৩০ )

'হে অর্জুন! অতি দুরাচার ব্যক্তিও অর্থাৎ পরহিংসা পরায়ণ, পরদ্রব্য, পরদার হরণকারীও যদি অনন্যভাবে আমার ভজন করেন, অর্থাৎ আমাব্যতীত অন্যদেবতার উপাসনা, ভক্তি ব্যতীত কর্ম জ্ঞানাদির আশ্রয় গ্রহণ না করেন, আমার কামনাব্যতীত অন্য কামনা অন্তরে না থাকে—তিনি অনন্যভজনশীল, তিনিই সাধু বলে গণ্য। কারণ তিনি উত্তম অধ্যবসায় বিশিষ্ট, অর্থাৎ স্বীয় দুস্ত্যজ পাপের ফলে নরকেই যাই অথবা তির্যক্‌যোনিতেই ভ্রমণ

করি না কেন, ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজন কিছুতেই ত্যাগ করব না,' এরূপ শোভন অধ্যবসায় যাঁর, তিনি সাধু। তাঁর নিন্দা করলে অপরাধ অনিবার্য। সদাচারী সাধুগণের নিন্দায় যে অপরাধ হবে তা'ত বলাই বাহুল্য। দুরাচারী ভক্তের দুরাচার দর্শনে নিন্দা আসতে পারে এজন্য শ্রীভগবান্ তাঁকে 'সাধু' বলে তাদৃশ ভক্তের নিন্দা নিষেধ করেছেন। বলা ও শোনা দুইই অপরাধ—সুতরাং সাধূর নিন্দাপ্রসঙ্গ উত্থিত হলে কর্ণে হস্ত দিয়ে 'শ্রীবিষ্ণুর' স্মরণ করতে করতে সে স্থান ত্যাগ করা বিধেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও ব্যাপকভাবে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন—

"প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম—পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥" ( চৈঃ চঃ )

যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যাবে, তিনি যে বৈষ্ণব, প্রভু সে কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥" (ঐ)

এইভাবে বৈষ্ণব বা সাধু নিরূপণ করে যদি সাধুনিন্দা বর্জন করতে পারা যায় অর্থাৎ একবার কৃষ্ণনাম না বলেছেন এরূপ ব্যক্তি কেউই নেই.এই জ্ঞানে যদি সর্বনিন্দা বর্জন করা যায় তাহলে এই মহদপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে।

"নিন্দায় নাহিক কার্য্য—সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা—সেই মহাভাগ॥"

"কাহারো না করে নিন্দা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অজয় চৈতন্য সেই—জিনিবেক হেলে॥" (চৈঃ ভাঃ)

(২) "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি এই সংসারে শ্রীবিষ্ণুর ও শ্রীশিবের এবং তাঁদের গুণ, নামাদি সকলের পৃথকত্ব দর্শন করে, তার পক্ষে উহা শ্রীহরিনামের নিকট অকল্যাণকর বা নামাপরাধজনক হয়ে থাকে। ভিন্ন দর্শন বা পৃথকত্ব দর্শন বলতে শ্রীবিষ্ণু এক পৃথক্ শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং শ্রী.শিব পৃথক্ শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর, তাঁদের নাম গুণাদিরও তদ্রূপ পৃথকত্ব দর্শন করলে বহ্বীশ্বরবাদ উপস্থিত হয়, যাতে শ্রী-নাম অপ্রসন্ন হয়ে থাকেন। শ্রীবিষ্ণুই সাক্ষাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' স্বয়ংসিদ্ধ স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ রহিত সর্বেশ্বর, ব্রহ্মা মহাদেবাদি সব শ্রীবিষ্ণুরই বিভূতি কেউই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নন। তাই শ্রীব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে—

"ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি॥"

"দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষযোগে দধিরূপে পরিণত হয়; কিন্তু সেই দধি স্বীয় কারণ দুগ্ধ থেকে পৃথক্ বস্তু নয়, সেইপ্রকার যিনি সংহারাদি কার্যের নিমিত্ত শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হন, সেই

আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।" শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বর, তাঁর থেকে ব্রহ্মা মহাদেবাদি নিখিল দেবগণের অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের থেকে কেহই ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নন, তেমনি আবার কেউই শ্রীকৃষ্ণের সমানও নন; কারণ তিনিই সর্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং শ্রীমন্মহাদেবকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে পৃথক্ ঈশ্বর মনে করা অথবা সমান মনে করা নামাপরাধজনক।

যাঁরা শ্রীবিষ্ণুর একান্ত ভক্ত, তাঁরা শ্রীশিবকে 'পরম বৈষ্ণব' বলেই সম্মান করেন। কেউ কেউ বা তাঁকে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান বা গুণাবতার বলেও সম্মান করে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে লিখিত আছে—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"

(ভাঃ ১২।১৩।১৬)

"নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শ্রীমন্মহাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে হবে।" সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশিবকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেই ভজন করবেন।

(৩) 'গুর্ব্ববজ্ঞা'—অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা বা তাঁতে মনুষ্যবুদ্ধি করলে নামাপরাধ হয়। গুরুতত্ত্ব না জানার ফলেই সাধকের গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

( ভাঃ ১১।১৭।২৭ )

'আচার্যকে বা শ্রীগুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলেই জানবে। কখনও তাঁকে অবজ্ঞা করা বা মনুষ্যজ্ঞানে তাঁর প্রতি কোনরূপ অসূয়া করা কর্তব্য নয়। যেহেতু গুরু সর্বদেবময়।' শ্রীগুরুদেবের অবমাননায় বা তাঁর প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি করলে সবই ব্যর্থ হয়। যথা—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

( ভাঃ ৭।১৫।২৬ )

শ্রীনারদ বললেন, 'প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ শ্রীগুরুতে যাঁর মনুষ্যজ্ঞানরূপ দুর্বুদ্ধি থাকে, তার শাস্ত্রাধ্যয়নাদি সবই হস্তী-স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।' পক্ষান্তরে যাঁর শ্রীভগবানের ন্যায় পরাভক্তি শ্রীগুরুদেবেও বিদ্যমান, সেই মহাত্মার নিকট শ্রুতির মর্মার্থ সব প্রকাশ পেয়ে থাকে। যথা—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

( শ্বেতাশ্বতর )

সুতরাং শিষ্য সর্বদা স্বীয় শ্রীগুরুদেবের সদ্গুণসমূহ ভাবনা করবেন। শ্রীগুরুদেবের দিব্যবিগ্রহের কোন ঔপাধিক দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে ভজন

না করা, তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রজপাদি না করা প্রভৃতিও গুর্ববজ্ঞারূপ অপরাধ বলে জানতে হবে।*

(৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্—এই চতুর্থ অপরাধের তাৎপর্য হচ্ছে, বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা। উপলক্ষণে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা প্রভৃতি যে কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ বুঝায়। বেদ অপৌরুষেয়, এজন্য বৈদিক পুরুষেরা বেদকেই মুখ্য প্রমাণ বলে মনে করেন। বেদ স্বপ্রকাশ—"বেদয়তীতি বেদঃ" অর্থাৎ যিনি নিজেই জ্ঞাপন করেন, তিনিই বেদ। বেদের অর্থ ইতিহাস, পুরাণাদির দ্বারা স্পষ্টীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদানুগত শাস্ত্র। এই সমস্ত শাস্ত্রের কোনরূপ নিন্দা অবজ্ঞাদি করলেই অপরাধ হয়।

বেদের তিনটি বিভাগ কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। সাধারণতঃ ভক্তিপথাশ্রয়ী কখনই ভক্তিপর শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা করবেন না। কিন্তু কর্মকাণ্ডীয়, জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি দর্শনে কোন ভক্তিপথাশ্রয়ী সাধক যদি মনে করেন, এই সকল শ্রুতি যখন ভগবদ্ভক্তিকে সাক্ষাদ্ভাবে স্পর্শ করে না তখন এরা বহির্মুখ কর্তৃকই উদ্গীত হওয়ার যোগ্য—তাহলে অপরাধ হয়। কারণ জ্ঞান, কর্মাদি প্রতিপাদক শ্রুতিগণ পরম করুণা পরায়ণ। তাঁরা কৃপা করে ভক্তিমার্গে অনধিকারী স্বেচ্ছাচারসম্পন্ন এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে কৃত-

---

* শ্রীগুরুতত্ত্ববিজ্ঞানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

সংকল্প হয়েছেন। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে একদিন কর্মী, জ্ঞানিদেরও ভক্তিমন্দিরে প্রবেশ-যোগ্যতা লাভ হবে—এইটিই সেই সব কর্ম-জ্ঞান-প্রতিপাদক শ্রুতিশাস্ত্রের মূল অভিপ্রায়। এই ভাবে শ্রুতিসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে শ্রুতিনিন্দনরূপ অপরাধ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৫) তথার্থবাদো—শ্রীহরিনামের মহিমায় অর্থবাদ মনন। অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে শ্রীহরিনামের যেসব অতুলনীয় মহিমার কথা দৃষ্ট হয়, তা কেবল স্তুতিবাক্যমাত্রই এরূপ মনে করা।

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য অতলস্পর্শ সিন্ধুর ন্যায় বিশাল ও দুরবগাহ। শাস্ত্র ও মহাজনগণ তার কতটুকুই বা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন? হয়ত সিন্ধুর একবিন্দুই বলা হয়েছে। তাকেই স্তুতিবাক্য মাত্র বা বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলে মনে করা যে কি ভয়ঙ্কর নামাপরাধ, তা সহজেই অনুমেয়। প্রশ্ন হতে পারে, বেদোক্ত বিষয়ের মধ্যে অর্থবাদ দৃষ্ট হয়ে থাকে. নামের মহিমাও যখন বেদোক্ত, তখন নামমহিমা সম্বন্ধেই বা অর্থবাদ মনে করা এত অসঙ্গত এবং এরূপ অপরাধজনক হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, অবিবেকী, ভোগাসক্ত, কামনা-পরায়ণ ব্যক্তিগণকে কর্মকাণ্ডীয় যাগ-যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করার জন্য আপাত-মধুর স্বর্গাদি সুখকে অক্ষয় অনন্ত ও পরমার্থ প্রায় বলে অতিরঞ্জিত, লোভনীয় বাক্যে বর্ণন করা হয়েছে। এগুলিই অতিরঞ্জিত বা স্তুতিবাদ মাত্র। বস্তুতঃ যা এক, অখণ্ড ও পরতত্ত্ব

বস্তু সেই ভগবান্ তাঁর নাম, ভক্তি ও প্রেম এসবের মহিমা বেদেরও অগোচর, সুতরাং এসব স্থলে অর্থবাদের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

"তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দস্বরূপ ॥" (চৈঃ চঃ)

(৬) হরিনাম্নি কল্পনম্—প্রকারান্তরে শ্রীহরিনামের অর্থ কল্পনা। শ্রীজীবপাদ লিখেছেন, "তন্মাহাত্ম্য-গৌণতা-করণায় গত্যন্তর-চিন্তনম্" ( ভক্তিসন্দর্ভ ) শ্রীহরিনামের অসমোর্ধ্ব মাহাত্ম্যের গৌণত্ব প্রতিপাদন করার জন্য অর্থান্তর কল্পনা। শ্রীহরিনামের অসাধারণ মহিমা এবং অচিন্ত্য প্রভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়,কারণ এজগতে আমরা মণি, মন্ত্র, মহৌষধাদির অচিন্ত্যশক্তি অনুভব করে থাকি। কিরূপে ঐসব বস্তুর এতাদৃশ শক্তি হল, তা আমাদের বুদ্ধি বিচার নির্ণয় করতে অক্ষম। তথাপি মণি, মন্ত্রাদির অচিন্ত্যশক্তি দেখে তা অস্বীকারও করা যায় না। এই সব প্রাকৃতবস্তুর শক্তিই যদি আমাদের বুদ্ধির গোচর না হয়, তখন অপ্রাকৃত চিন্ময় মহাচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীহরিনামের প্রভাব যে মানবীয় বুদ্ধির গোচর হবে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই অচিন্ত্যবস্তুতে বুদ্ধি-বিচার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হয়েছে—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

'যে সকল ভাব বা পদার্থ অচিন্ত্য, সে সব বিষয়ে তর্কের যোজনা নিষিদ্ধ। যা প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত তাই অচিন্ত্য।' তাৎপর্য এই যে, আমরা জগতের মানুষ, প্রকৃতির বিকারভূত বস্তুর সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। যুক্তি তর্কে আমরা এই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতারই প্রয়োগ করে থাকি। আমাদের বুদ্ধি যখন অপ্রাকৃত হবে, তখনই অপ্রাকৃত বস্তুর তত্ত্ব গ্রহণে তা সক্ষম হবে। সুতরাং শাস্ত্র এবং অপ্রাকৃত ধারণা সম্পন্ন মহাজনগণ অচিন্ত্যবস্তুর তত্ত্ব যা বলেছেন, শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সহিত তা-ই গ্রহণীয়। তাতে প্রাকৃত বুদ্ধির প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যাঁরা প্রাকৃত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা যুক্তি তর্কে অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীহরিনামের মহিমাকে লঘু বা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন—তাঁরা নামাপরাধী।

(৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে যমৈর্হি শুদ্ধিঃ—অর্থাৎ নামবলে যার পাপবুদ্ধি হয়, তার বহু যম-নিয়মাদিদ্বারা বা বহু যমযন্ত্রণা ভোগেও সেই অপরাধ থেকে মুক্তি হয় না। অর্থাৎ নামগ্রহণে পাপাদি বিনষ্ট হয় নামের এই প্রভাব অবগত হয়ে নামকে পাপনাশের উপায়রূপে গ্রহণ করে যাদের পাপকার্যে মতি হয় তারা নামাপরাধী। যদিও নামবলে পাপাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ঠিকই, তবু নামাশ্রয়ী ব্যক্তি যে নামবলে পরমপুরুষার্থ প্রেম বা ভগবৎসেবাসুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই নামবলেই আবার ঘৃণাস্পদ পাপকার্যে মতি হলে পরম দৌরাত্ম্যই

প্রকাশ পেয়ে থাকে। শ্রীনামকে নিকৃষ্ট করা হয় বলে অনুষ্ঠিত পাপ অপেক্ষাও কোটিগুণ অপরাধ সঞ্চিত হয়ে থাকে। এজন্য তার প্রায়শ্চিত্তরূপে যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করলেও অথবা দণ্ড-দাতা বহু যমরাজকর্তৃক বহুকাল যমযাতনা ভোগ করলেও তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে না।

তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধনামাশ্রয়ী ব্যক্তির পাপবুদ্ধির কথা দূরে থাক, পুণ্যকার্যেও মতি হয় না; পাপপুণ্যের কথা কি, মোক্ষেও রুচি থাকে না। সুতরাং নামাশ্রয়ী ব্যক্তির কখনই পাপবুদ্ধি জন্মে না। সাধকের যেখানে কিছু কিছু অপরাধ থাকে সেখানে উচ্চারিত নাম নামাভাস হয়, শুদ্ধনাম হয় না। নামাভাসেও পূর্বপাপ ক্ষয় হয় এবং নূতনপাপে প্রবৃত্তি জন্মে না। তথাপি পূর্ব পাপকার্যাবশেষ কিছু কিছু বিদ্যমান থাকে। সেই অবস্থায় যদি কোন সাধকের মনে হয়, নামের দ্বারাই ঐ ক্রিয়মাণ পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হবে, তবে উহাই ভয়ঙ্কর নামাপরাধ হয়ে থাকে।

(৮) ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপিপ্রমাদঃ —ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুভকর্মাদির ফলের সহিত শ্রীহরি-নামের ফলকে সমান মনে করা প্রমাদ বা নামাপরাধ। এতে শ্রীনামের মহিমাকে খর্ব করা হয় বলে অপরাধ মধ্যে গণ্য হয়। শাস্ত্রে যে সব শুভক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে সবই জড়ধর্মান্তর্গত সুতরাং প্রাকৃত; ভগবন্নাম অপ্রাকৃত বা চিন্ময়। অন্যান্য সৎকর্ম স্বর্গাদি সুখরূপ উপেয় সংগ্রহ করার উপায় মাত্র, কেউই উপেয় নয়।

শ্রীহরিনাম পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের অনন্য উপায় হয়েও স্বয়ং উপেয় সুতরাং কোন সৎকর্মেরই শ্রীহরিনামের সহিত তুলনা নেই। যাদের মনে সৎকর্মের সহিত নামের সমতাবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তারা নামাপরাধী। অন্যান্য সৎকর্মের যে সব ক্ষুদ্র ফল নির্দিষ্ট আছে, শ্রীহরিনামের নিকট তা প্রার্থনা করলেও অপরাধ হয়; কারণ তাতে ঐ সব সৎকর্মের সঙ্গে হরিনামের সমতা বিধান করা হয়। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন, শ্রীনাম সর্বত্রই স্বতন্ত্র, সুতরাং কর্মাদির পূর্তির নিমিত্ত তাঁকে কর্মাঙ্গরূপে নিয়োজিত করলে অপরাধ হয়, সেইরূপ জানতে হবে। "তদেবং নাম্নঃ সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যেঽপি কর্ম্মাদেঃ পূর্ত্ত্যর্থং তদঙ্গত্বেন কৃতমপ্যপরাধ এব।" ( ভাঃ ৬ ২ ২০—২২ টীকা )

(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিব-নামাপরাধঃ—শ্রদ্ধাহীন, নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশ প্রদান করলে মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট তা অপরাধ বলে গণ্য হয়। ভক্তিঅঙ্গ যাজনে শ্রদ্ধারই পরম অপেক্ষা, সুতরাং শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই নামভজনের অধিকারী। যারা অশ্রদ্ধালু নামশ্রবণে রুচিহীন তাদের হরিনামোপদেশ দান অপরাধজনক। হরিনাম সর্বোপরি, হরিনাম কীর্তন করলে সবার মঙ্গল হবে—এরূপ উপদেশ করাই ভাল। অধিকারী না দেখে হরিনাম দান করা উচিৎ নয়। শ্রদ্ধাহীন এবং নামশ্রবণে বিমুখজনকে নামোপদেশ অপরাধজনক—এই বাক্যে উপদেশকের অপরাধ প্রদর্শিত হয়েছে,

অর্থাৎ উপদেষ্টাকেই এই অবজ্ঞাদি অপরাধ স্পর্শ করবে।

(১০) "শ্রুতেঽপি-নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥"

'যে ব্যক্তি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেও 'আমি' ও 'আমার' এরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হয়ে শ্রীহরিনামে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না সে ব্যক্তিও নামাপরাধী। এই বাক্যে উপদেশ্য ব্যক্তির অপরাধের কথা বলা হয়েছে। কারণ তাদৃশব্যক্তি নশ্বর দেহ-দৈহিকাদিতে 'আমি' ও 'আমার' এই অভিমানের প্রাবল্যে নামে প্রীতিযুক্ত না হয়ে বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয় এবং শ্রীহরিনামে অনাদরযুক্ত হয় বলে অপরাধী। কারণ তার দ্বারা নামের প্রতি অবজ্ঞাই সূচিত হয়ে থাকে। সেরূপ ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা উচিৎ নয়। উল্লিখিত দশবিধ নামাপরাধ বর্জন করেই সাধকগণকে নামভজন করতে হবে—ইহাই সাধুশাস্ত্রের উপদেশ। নিরপরাধে নামগ্রহণের একমাত্র উপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট তৃণাদপি শ্লোকানুরূপ আচরন। যার দ্বারা সাধক অচিরে নামের ফল লাভ করে ধন্য হতে পারেন। নামাপরাধ ক্ষয়বিষয়ে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি হি॥" অর্থাৎ 'নামাপরাধ নামদ্বারাই দূর হয়। অবিশ্রান্ত নামগ্রহণের ফলেই নামাপরাধের ক্ষয় হয়ে থাকে।' মহদপরাধ হলে যে মহতের নিকট অপরাধ তাঁকে প্রসন্ন করলেই সেই অপরাধ নাশ হয়। তিনি কোনমতেই প্রসন্ন

না হলে অনুতাপের সহিত অহর্নিশ নামকীর্তনে তার ক্ষয় হয়। অন্যান্য অপরাধগুলি অনুতাপের সহিত সতত নামকীর্তনে বিনষ্ট হয়ে থাকে।

কেউ বলতে পারেন 'আমার অপরাধ নেই এবং শ্রদ্ধারত্তির সহিতই নামগ্রহণ করে থাকি, তবে নামের ফল পাই না কেন?' ইহারও কারণ একমাত্র অপরাধই। অপরাধব্যতীত শ্রীনাম-কীর্তনের ফল লাভের আর এমন অন্য কিছু অন্তরায় বা বাধা নেই। যদ্যপি আমরা জ্ঞানতঃ অপরাধ না-ই করে থাকি তবু আমরা যে নিরপরাধ একথা বলতে পারি না। কারণ আমাদের জন্মান্তরীয় যে প্রাচীন অপরাধ নেই তা বলা যায় না এবং অজ্ঞা-নতঃ অনেক অপরাধ করে থাকি। তবে আমরা সাপরাধ কি নিরপরাধ এটি বুঝবার একটিমাত্র অব্যর্থ উপায় আছে। যদি আমরা দেখতে পাই বহুনাম গ্রহণ করেও হৃদয়ের মধ্যে কিছু আনন্দের সঞ্চার হল না, অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার উদিত হল না, তবে বুঝতে হবে অপরাধের ফলে হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হয়ে গেছে। বহুনাম গ্রহণেও প্রেমচিহ্নের অনুদয়ই নামাপরাধ অস্তিত্বের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতবাণীই এবিষয়ে প্রমাণ—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"

( ভাঃ ২ ৩।২৪ )

এই শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম

এইরূপ যে, বারবার হরিনাম করলেও যে হৃদয়ে ভক্তিবিকার হয় না, অর্থাৎ বাইরে অশ্রুজল ও গাত্রে পুলকরূপ ভাববিকারের উদয় হয় না এবং চিত্তদ্রব হয় না সেই হৃদয় লৌহের ন্যায় কঠিন এইটি নামাপরাধের অস্তিত্বের চিহ্ন। আবার কেবল অশ্রু-পুলকাদিকেও চিত্তদ্রবের লক্ষণ বলা যায় না কারণ স্বভাবতঃ পিচ্ছিল-চিত্ত-ব্যক্তির বা যারা অশ্রুপুলকাদি উদ্গমের অভ্যাস করে তাদের সত্ত্বাভাস বিনাও অশ্রু-পুলক দেখা যায়। পক্ষান্তরে গম্ভীর প্রকৃতি মহানুভবের হরিনাম গ্রহণে চিত্তদ্রব সত্ত্বেও বাইরে অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায় না। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ এরূপ—যখন বাইরে অশ্রুপুলকাদি বিকার হয়, তখন যে হৃদয় ভক্তিভাবে বিগলিত হয় না ; সেই হৃদয় লোহার ন্যায় কঠিন। হৃদয়বিকারের সাধারণ লক্ষণ অশ্রু-পুলকাদি হলেও অসাধারণ লক্ষণ ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্বাদি নয়টি অনুভাব বলে জানতে হবে।*

অতএব নিরপরাধ সাপরাধ সব সাধকের পক্ষেই শ্রদ্ধাপূর্বক আদরের সহিত নামোপলক্ষিতা ভক্তিদেবীর সেবা করা কর্তব্য। এতে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রেমলাভ এবং সাপরাধ সাধকের নামাপরাধ ক্ষয়ের পর প্রেমলাভ হয়ে থাকে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় নামসাধককে স্নেহসংযুক্ত নামগ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন—"শ্রীভগবন্নামগ্রহণং খলু দ্বিধা ভবতি, কেবলত্বেন

* ভক্তিতত্ত্ববিজ্ঞানে ভাবভক্তির ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্নেহসংযুক্তত্বেন চ। তত্র পূর্ব্বেণাপি প্রাপয়ত্যেব সত্যস্তল্লোকং তন্নাম। পরেন চ তৎসামীপ্যমপি প্রাপয়াত। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ইতি তদ্বাক্যাৎ।” (ভাঃ ৬।২।২০ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা) অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ দু প্রকারে হতে পারে—(১) কেবল নামগ্রহণ (২) স্নেহসংযুক্ত নামগ্রহণ। কেবল বা স্নেহশূন্য নামগ্রহণেও নিরপরাধব্যক্তি সত্য ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু স্নেহসংযুক্ত নামগ্রহণে ভগবৎসান্নিধ্য এবং তাঁর সেবা লাভ হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কুরুক্ষেত্রে সমাগতা ব্রজগোপীগণের নিকট তাঁর প্রতি স্নেহের মাহাত্ম্য বর্ণন করেছেন—‘হে ব্রজসুন্দরী-গণ! আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্বের নিমিত্ত কল্পিত হয়, আপনাদের আমার প্রতি যে স্নেহ আছে তা আমায় বলপূর্বক আকর্ষণ করে আপনাদের সমীপে উপস্থিত করে।’ (ভাঃ ১০। ৮২।৩১) এই ভগবৎবাক্যে তাঁর প্রতি স্নেহ তাঁকে আকর্ষণের পরমোপায় বলে জানা যায়। তদ্রূপ স্নেহপূর্বক নামগ্রহণে নামো-চ্চারণকারীর নিকট শ্রীনাম নামীকে আকর্ষণ করে মূর্ত করে দেন। ভগবন্নামের প্রতি যাঁর স্নেহ আছে বা যিনি একান্তভাবে শ্রীনামকে ভালবেসেছেন সেই সাধক কতখানি আর্তির সহিত এই আহ্বানা-ত্মক ‘হরেকৃষ্ণেতি’ কীর্তন করবেন শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ তার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৭)—

“নাম্নান্তু সংকীর্ত্তনমার্ত্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ স্বপতে রথাঙ্গী-বর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি ॥”

অর্থাৎ 'বর্ষাকালে চাতককুল যেমন মেঘ বিনা আর্তির সহিত উচ্চরব করে, রাত্রিকালে চক্রবাকী প্রিয়বিরহে যেমন উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে, ভক্তসাধক নিজ প্রিয়-বিরহে তদ্রূপ আর্তির সহিত 'হরেকৃষ্ণেতি' আহ্বানাত্মক ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে করতে শ্রীভগবানকে ব্যাকুলপ্রাণে আহ্বান করবেন! এইভাবে স্নেহসংযুক্ত নামগ্রহণে সাধক অতি শীঘ্রই ভগবৎপ্রেম-লাভে ধন্য হয়ে থাকেন। দ্বাত্রিংশবর্ণাত্মক 'হরেকৃষ্ণেতি' মহামন্ত্রের অর্থ আস্বাদনের সহিত কীর্তনে সাধক অতিশীঘ্রই নামে স্নেহ বা প্রীতিলাভে ধন্য হন। শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর-কৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আস্বাদ্য অতি অপূর্ব 'হরেকৃষ্ণেতি' মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা—

"একদিন হরিদাস নির্জনে বসিয়া।
মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় গর্জে হুহুঙ্কার।
আচার্য্য গোসাঞি আসি করে নমস্কার॥
সঙ্কোচ পাইয়া হৈল ভাব সম্বরণ।
আচার্য্যে প্রণমি তিঁহ অর্পিল আসন॥
বসিয়া আচার্য্য গোসাঞি করে নিবেদন।
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন॥
কলিযুগে অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
চৈতন্য ভজয়ে যেই সেই বড় ধন্য॥

তুমি হও চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন॥

অথবা কি মর্ম্ম জানি প্রেমানন্দে ভাস।
সর্ব্বজীবে হরিনাম কৈলে উপদেশ॥

নিবেদয় হরিদাস করি করজোড়ে।
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে॥
কিবা ছল আচরহ পামর-শোধিতে।
নিবেদন করি শুন যাহা লয় চিতে॥
কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গূঢ় অবতার।
কোটি সমুদ্র গম্ভীর নাম লীলা যাঁর॥
গুরুভাবে করায় তিঁহ আপনা যজনে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্ব্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগ-অবতার।
হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম সার॥
মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন কভু নয়।
নাম নামী ভেদ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

হরে—ভানুসুতা যেঁহ কৃষ্ণপ্রিয়া-শিরোমণি।
শ্রীচৈতন্যরূপে এবে 'হরে' করি মানি॥

কৃষ্ণ—নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই 'কৃষ্ণ' এবে এহ চৈতন্য গোসাঞি॥

হরে— ব্রজের সর্ব্বস্ব হরি নদে অবতার।
এই হেতু চৈতন্যের 'হরে' নাম সার ॥

কৃষ্ণ— জীব-হৃদি কর্ষিয়া রোপিল ভক্তিবীজ।
অতএব চৈতন্যের 'কৃষ্ণ' নাম নিজ ॥

কৃষ্ণ— কৃষ্ণবর্ণে কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণবরণ।
অতএব তাঁর নাম 'কৃষ্ণ' নিরূপণ ॥

কৃষ্ণ—ন্যাসিবেশে আকর্ষিল পাষণ্ডীর গণ।
এইহেতু 'কৃষ্ণ' নাম তাঁহার গণন ॥

হরে—স্বমাধুর্য্যে হরে তেঁহ ভক্তমন প্রাণ।
'হরে' নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান ॥

হরে—স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরণ।
শ্রীচৈতন্য 'হরে' নাম করিল গ্রহণ ॥

হরে— স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'হরে' কলিযুগে সার ॥

রাম—দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রমে অভিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে 'রাম' ॥

হরে—হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল।
অতএব 'হরে' নাম সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥

রাম—স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমণ।
এতএব 'রাম' নাম করয়ে বহন ॥

রাম – আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠে কাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে 'রাম' নাম॥
রাম = কৌশল্যানন্দন যিনি ত্রেতায় শ্রীরাম।
সার্ব্বভৌমে দেখাইয়া ধরে 'রাম' নাম॥
হরে – স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁহ অবতার।
অতএব 'হরে' নাম হইল তাঁহার॥
হরে – স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কৃষ্ণাকৃতি হৈল।
অতএব 'হরে' নাম জগতে ঘোষিল॥
হরিনামের গূঢ় অর্থ করিল প্রকাশ।
আগম নিগম যাঁর নাহি জানে আশ॥"

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ-কৃত মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা—

"সর্ব্বচেতো হরঃ কৃষ্ণস্তস্য চিত্তং হরত্যসৌ।
বৈদগ্ধীসারবিস্তারৈরতো রাধা হরা মতা॥১॥

সর্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে বৈদগ্ধীসার বিস্তারদ্বারা যিনি হরণ করেন এজন্য শ্রীরাধার নাম 'হরা', সম্বোধনে 'হরে':

কর্ষতি স্বীয়লাবণ্য-মুরলীকলনিঃস্বনৈঃ।
শ্রীরাধাং মোহনগুণালঙ্কৃতঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥২॥

যিনি স্বীয় লাবণ্য ও মুরলীর কলধ্বনির দ্বারা শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করেন, সেই মোহন গুণালঙ্কৃত কৃষ্ণ', সম্বোধনে 'কৃষ্ণ'।

শ্রূয়তে নীয়তে রাসে হরিণা হরিণেক্ষণা।
একাকিনী রহঃকুঞ্জে হরেয়ং তেন কথ্যতে॥৩॥

শুনা যায়, রাসে শ্রীহরি একাকিনী শ্রীরাধাকে হরণ করে রহঃকুঞ্জে নিয়ে যান, শ্রীহরি হরণ করেন বলে শ্রীরাধার নাম 'হরা', সম্বোধনে 'হরে'।

অঙ্গশ্যামলিমস্তোমৈঃ শ্যামলীকৃতকাঞ্চনঃ।
রমতে রাধয়া সার্দ্ধমতঃ কৃষ্ণো নিগদ্যতে ॥৫॥

যিনি 'শ্রীঅঙ্গের শ্যামলকান্তিসমূহের দ্বারা সুবর্ণকেও শ্যামলবর্ণ করেন, অর্থাৎ স্বর্ণাঙ্গী শ্রীরাধাকে শ্যামলবর্ণা করে তাঁর সঙ্গে রমণ করেন, এজন্য তিনি 'কৃষ্ণ', সম্বোধনে 'কৃষ্ণ'।

কৃত্বারণ্যে সরঃ শ্রেষ্ঠং কান্তয়ানুমতস্তয়া।
আকৃষ্য সর্ব্বতীর্থানি তজ্‌জ্ঞানাৎ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥৫॥

কান্তা শ্রীরাধার অনুমতিক্রমে যিনি অরণ্যমধ্যে সর্বতীর্থ আকর্ষণ করে শ্রেষ্ঠ সরোবর (শ্যামকুণ্ড) রচনা করেন, সেই জ্ঞানবশতঃ তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়, সম্বোধনে 'কৃষ্ণ'।

কৃষ্ণেতি রাধয়া প্রেম্ণা যমুনাতটকাননম্।
লীলয়া ললিতশ্চাপি ধীরৈঃ কৃষ্ণ উদাহৃতঃ ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীযমুনাতটকাননে লীলায় ললিত অর্থাৎ ধীরললিত হয়ে বিলাপ করেন, এজন্য ধীরগণ তাঁকে 'কৃষ্ণ' বলেন, সম্বোধনে 'কৃষ্ণ'।

হতবান্ গোকুলে তিষ্ঠন্নরিষ্টং দুষ্টপুঙ্গবম্।
শ্রীহরিস্তং রসাদুচ্চৈর্গায়তীতি হরা মতা ॥৭॥

শ্রীহরি ব্রজে অবস্থান করে দুষ্ট অরিষ্ট নামক অসুরকে

বিনাশ করেন বলে রসবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে যিনি তাঁকে 'হরি' বলে গান করেন, সেই রাধার নাম 'হরা', সম্বোধনে 'হরে'।

হস্ফুটং রায়তি প্রীতিভরেণ হরিচেষ্টিতম্।
গায়তীতি মতা ধীরৈর্হরা রস-বিচক্ষণৈঃ ॥৮॥

যিনি শ্রীহরির চেষ্টাকে প্রীতিভরে প্রকাশ্যভাবে গান করেন, তাঁকেই রসজ্ঞ ধীরগণ 'হরা' বলে থাকেন, সম্বোধনে 'হরে'।

রসাবেশপরিভ্রষ্টাং জহার মুরলীং হরেঃ।
হরেতি কীর্ত্তিতা দেবী বিপিনে কেলিলম্পটা ॥৯॥

দেবী শ্রীরাধা বিপিনে কেলিপরায়ণা হয়ে রসাবেশবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের হস্তচ্যুত মুরলীকে হরণ করেন তাই তাঁর নাম 'হরা', সম্বোধনে 'হরে'।

গোবৰ্দ্ধন-দরীকুঞ্জে পরিরম্ভবিচক্ষণঃ।
শ্রীরাধাং রময়ামাস রামস্তেন মতো হরিঃ ॥১০॥

পরিরম্ভণ-কুশল শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গুহাকুঞ্জে শ্রীরাধাকে রমণ করেন বলে তাঁর নাম 'রাম'; সম্বোধনে 'রাম'।

হন্তি দুঃখানি ভক্তানাং রাতি সৌখ্যাতি চান্বহম্।
হরা দেবী নিগদিতা মহাকরুণশালিনী ॥১১॥

পরম করুণাময়ী দেবী শ্রীরাধা নিত্য সুখাতিশয় দ্বারা ভক্তগণের দুঃখ হরণ করেন বলে তিনি 'হরা', সম্বোধনে 'হরে'।

রমতে ভজতে চেতঃ পরমানন্দবারিধৌ।
অত্রেতি কথিতো রামঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ ॥১২॥

যাঁর ভজন করলে চিত্ত পরমানন্দসাগরে রমণ করে সেই শ্যামসুন্দর বিগ্রহ কৃষ্ণ 'রাম' নামে কথিত হন, সম্বোধনে 'রাম'।

রময়ত্যচ্যুতং প্রেম্ণা নিকুঞ্জবনমন্দিরে।
রামা নিগদিতা রাধা রামো যুক্তস্তয়া পুনঃ ॥১৩॥

শ্রীরাধা নিকুঞ্জবনমন্দিরে শ্রীঅচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করেন তাই 'রামা' নামে কথিতা হন সেই রামা সহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ 'রাম', সম্বোধনে 'রাম'।

রোদনৈর্গোকুলে দাবানলমকুয়তি হ্যসৌ।
বিশেষয়তি তেনোক্তো রামো ভক্তসুখাবহঃ ॥১৪॥

শ্রীগোকুলবাসিগণের রোদনে শ্রীকৃষ্ণ দাবানলভক্ষণ ও শোষণ করে ভক্তসুখাবহ হয়েছিলেন, এজন্য তিনি 'রাম' ( ভক্তান্ সুখয়তি রময়তি ), সম্বোধনে 'রাম'।

নিহন্তুমসুরান্ যাতো মথুরাপুরমিত্যসৌ।
তদাগমদ্রহঃকামো যস্যাঃ সাসৌ হরেতি চ ॥১৫॥

অসুরগণকে সংহার করতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যান, রহঃকেলি বাসনায় তথা হতে ব্রজে আগমন করে যে রাধার সঙ্গে মিলিত

হন সেই রাধা 'হরা', ( হরিণা মিলিতেহি হরা ) সম্বোধনে 'হরে'।

আগত্য দুঃখহর্ত্তা যঃ সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাম্।
শ্রীরাধাহারিচরিত্রো হরিঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ ॥১৬॥

শ্রীনন্দনন্দন মথুরা হতে আগমন করে সমস্ত ব্রজবাসীর দুঃখ হরন করেন ও শ্রীরাধার মনোহারী সুন্দরচরিত্র প্রকাশ করেন বলে তিনি 'হরি', সম্বোধনে 'হরে'।

শ্রীরাধার আস্বাদনের মাধ্যমে মঞ্জরীভাবাবিষ্ট সাধকের পরম আস্বাদ্য 'হরেকৃষ্ণেতি' মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রকাশ করেছেন। সেই দাস গোস্বামিপাদের মহামন্ত্র-ব্যাখ্যার শ্রীল শিবানন্দসেনের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস-কৃত পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত হচ্ছে—

হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরিলে যে নেত্র মনে,
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ—আনন্দধাম, মহা আকর্ষক ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥

হে হরে – ধৈরয ধরি গুরুভয় আদি করি,

কুলের ধরম কৈলে চূর।

হে কৃষ্ণ—বংশীর স্বরে আকর্ষিয়া আনি বলে

দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর॥

হে কৃষ্ণ—কর্ষিতা আমি কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,

তা দেখি চমক মোহে লাগে।

হে কৃষ্ণ · বিবিধচ্ছলে উরজ কর্ষহ বলে,

থির নহ অতি অনুরাগে॥

হে হরে—আমারে হরি লৈয়া পুষ্পতল্প-পরি,

বিলাসের লালসে কাকুতি।

হে হরে—গুপতবস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,

ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥

হে হরে – বসন হর তাহাতে রমণ কর

অন্তরের হর যত বাধা।

হে রাম—রমণঅঙ্গ নানা বৈদগধী রঙ্গ,

প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা॥

হে হরে—হরিতে বলী নাহি হে কুতূহলী,

সভার সে বাম্য না রাখিলা।

হে রাম—রমণরত তাহে প্রকটিয়া কত,

কিনা রস আবেশে ভাসাইলা॥

হে রাম—রমণশ্রেষ্ঠ মন রমনীয় শ্রেষ্ঠ,

তুয়া সুখে আপনা না জানি।

হে রাম—রমণ ভাগে ভাবিতে মরমে জাগে,

সে রসমূরতি তনুখানি॥

হে হরে—হরণ তোর তাহার নাহিক ওর,

চেতন হরিয়া কর ভোরা।

হে হরে—আমার বক্ষ হর সিংহ প্রায় দক্ষ,

তোমা বিনে কেহ নাহি মোরা॥

তুমি সে আমার প্রাণ তোমা বিনা নাহি জান,

ক্ষণেকে কল্প শত যায়।

সে তুমি অনত গিয়া রহ উদাসীন হৈয়া,

কহ দেখি কি করি উপায়॥

ওহে নবঘনশ্যাম কেবল রসের ধাম,

কৈছে রহ করি মন ঝুরে।

চৈতন্য বলয়ে যায় হেন অনুরাগ পায়,

তারে বন্ধু মিলয়ে অদূরে॥

( পদকল্পতরু )

# রাগানুগাভক্তিবিজ্ঞান

## রাগানুগাভক্তি কাকে বলে ?

ভক্তিতত্ত্ববিজ্ঞানে আমরা সাধনভক্তির কথা বলেছি। সেই সাধনভক্তি দ্বিবিধ—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। শাস্ত্রশাসন যে ভক্তির প্রবর্তক, তাকে 'বৈধীভক্তি' বলা হয় এবং একমাত্র লোভই যার প্রবর্তক তারইনাম 'রাগানুগাভক্তি'। 'রাগাত্মিকাভক্তির অনুগতা ভক্তিরই নাম রাগানুগাভক্তি : সুতরাং রাগানুগাভক্তি জানতে হলে প্রথমতঃ রাগাত্মিকাভক্তি কি তাই জানতে হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে রাগাত্মিকাভক্তির লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

অর্থাৎ ইষ্টে (শ্রীকৃষ্ণে) স্বাভাবিকী প্রেমময়ী প্রগাঢ়তৃষ্ণা, যার থেকে তাঁতে পরমাবিষ্টতা জন্মে—তার নাম রাগ, সেই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকাভক্তি।

"ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ—এই স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥" ( চৈঃ চঃ )

ইষ্টবস্তুতে যে প্রগাঢ়তৃষ্ণা অর্থাৎ অভীষ্টকে সেবা করে সুখী

করার যে প্রগাঢ় লালসা এটি রাগের স্বরূপলক্ষণ এবং সেই প্রগাঢ় লালসার ফলে ইষ্টবস্তুতে যে পরমাবিষ্টতা জন্মে এটি রাগের তটস্থ লক্ষণ।

আবিষ্ট অবস্থায় ভক্তের বাহ্যস্মৃতি থাকে না, কারণ তখন ভক্ত নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত বলবতী লালসায় সেইভাবে তন্ময় হয়ে যান। এই অবস্থায় ইষ্টের সেবামাত্র চিন্তাই হৃদয়জুড়ে বিরাজ করে। স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা বলতে যিনি যে রসের পাত্র, সেই রস বিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করে সুখী করার নিমিত্ত বিপুল লালসায় যে পরমাবিষ্টতা তাকেই স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা বলা হয়। এই রাগাত্মিকাভক্তি ব্রজবাসী নিত্যপার্ষদগণে পরিস্ফুটরূপে বিরাজিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দৃষ্ট হয় –

> "বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
> রাগাত্মিকামনুস্থৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥"

ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমান যে ভক্তি তাই রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিরই নাম 'রাগানুগা'।

> "রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
> তার অনুগতা ভক্তি 'রাগানুগা' নামে ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (৩১০ অনুঃ) রাগের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন--"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়-

সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ, যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স চ রাগো বিশেষণভেদেন বহুধা দৃশ্যতে ( ভাঃ ৩।২৫।৩৮ ) 'যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্' ইত্যাদৌ। তত্র 'প্রিয়ো' যথা তদীয়প্রেয়সীনাম্ ; 'আত্মা' পরব্রহ্মরূপঃ শ্রীসনকাদী-নাম্ ; 'সুতঃ' শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্ ; 'সখা' শ্রীশ্রীদামাদীনাম্ ; 'গুরুঃ' শ্রীপ্রদ্যুম্নাদীনাম্ ; কস্যাপি 'ভ্রাতা', কস্যাপি 'মাতুলেয়ঃ' কস্যাপি বৈবাহিকঃ' ইত্যাদিরূপ স এক এব তেষু বহুপ্রকারত্বেন 'সুহৃদঃ' সম্বন্ধীনাম্ ; 'দৈবমিষ্টং' তদীয় সেবকানাং শ্রীদারুক-প্রভৃতীনামিতি প্রসিদ্ধম্।

অত্র শ্রীমত্যাং মোহিন্যাং যঃ খলু রুদ্রস্য ভাবো জাতঃ স তু নাঙ্গীকৃতোঽনুকূলত্বাৎ, তস্য মায়ামোহিতত্বয়ৈব তাদৃশভাবাভ্যুপ-গমাচ্চ। তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাববিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্‌রাগপ্রযুক্তা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপাদসেবনবন্দনা-ত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তিগঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ।"

অর্থাৎ বিষয়ীর বিষয়-সংসর্গলাভের নিমিত্ত যে স্বাভাবিক অতিশয় ইচ্ছাময় প্রীতি তারই নাম 'রাগ'। যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়, তাতে যেমন কারও প্রেরণার অপেক্ষা নাই ; তদ্রূপ

শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের চিত্তবৃত্তি যদি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়ে থাকে তাদৃশ আকুল পিপাসাময় যে প্রেম তা-ই 'রাগ' নামে কথিত হয়। বিশেষণভেদে এই রাগ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি বহুপ্রকার দেখা যায়। এ বিষয়ে-শ্রীভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব বলেছেন, 'আমি যাদের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ্ ও ইষ্টদেব প্রভৃতি'। এইশ্লোকে 'প্রিয়' শব্দে যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীগোপী প্রভৃতিকে বুঝায়, তেমনি সনকাদি শান্তরসের ভক্তগণ 'আত্মা' অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপে. শ্রীব্রজেশ্বরাদি পুত্রভাবে, শ্রী-দামাদি সখ্যভাবে, শ্রীপ্রদ্যুম্নাদি গুরুভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম-সম্বন্ধে আবদ্ধ রয়েছেন। তিনি কারও ভ্রাতা, কারও মাতুল, কারও বৈবাহিক ইত্যাদিরূপে তিনি একাই সেই সেই সম্বন্ধান্বিত ভক্তের নিকটে বহুপ্রকার ধর্মে সুহৃদ্‌রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন। তদীয় সেবক দারুক প্রভৃতির নিকটে ইষ্টদেবরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন এটি প্রসিদ্ধ।

পূর্বে বলা হয়েছে, শ্রীভগবানের সহিত সংসর্গলাভের নিমিত্ত অতিশয় ইচ্ছাময় প্রীতিকে রাগ বলে। কিন্তু শ্রীভগবানের শ্রী-মোহিনীমূর্তির সংসর্গের নিমিত্ত শ্রীরুদ্রের যে ইচ্ছাময় ভাব সেটি রাগ রূপে স্বীকৃত হয়নি। কারণ ঐ ভাবটি অযুক্ত বলে এপ্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ শ্রীভগবান্ রুদ্রের ছলনার জন্য যখন মোহিনীরূপ ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর দর্শনে শ্রীরুদ্র মায়া বিমোহিত হয়েই কামভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একে রূপজ

মোহ বলা যেতে পারে, সুতরাং এটি রাগরূপে স্বীকৃত হয়নি।

এইরূপে সেই সেই কান্তাদি অভিমান লক্ষণ স্বাভাবিক ভাববিশেষে রাগের বৈশিষ্ট্য থাকলে সেই সেই রাগপ্রেরিত হয়ে যে শ্রবণ, কীর্তন স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, আত্মনিবেদন প্রধান ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তার নাম রাগাত্মিকাভক্তি। এই রাগাত্মিকা-ভক্তি গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশশীলা বলে সাধ্যভক্তি, এটি সাধনভক্তি নয় সুতরাং এই রাগাত্মিকাভক্তি সাধ্যরূপই এটি সাধনভক্তির প্রকরণভুক্ত নয়। এই শ্রবণ কীর্তনাদিরূপা সাধ্য-ভক্তির আনুগত্যময়ী ভক্তিবিশেষের নামই 'রাগানুগাভক্তি'। সুতরাং রাগানুগাভক্তি ব্রজবাসিদের সাধ্যভক্তির অনুসরণ মাত্র। এক্ষণে রাগানুগাভক্তিতে প্রবৃত্তির হেতু বলছেন—"যস্য পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি; ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং তস্য তাদৃশরাগসুধাকর-করাভাসসমুল্লসিতহৃদয়স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদি শ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তি সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ত্ততে।" ( ভক্তি-সন্দর্ভ—৩১০ অনুঃ )

যাঁর পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচিমাত্র জাত হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং রাগবিশেষের উদয় হয়নি, সেই ভক্তে পূর্বোক্ত রাগসুধাকরের কিরণাভাস পতিত হয়ে তাঁর হৃদয়রূপ স্ফটিকমণি উল্লসিত হয়, তা শাস্ত্রাদি শ্রবণ থেকে অবগত হয়ে তাদৃশী রাগাত্মিকাভক্তির সেবাপরিপাটীসমূহে তাঁর রুচির উদয় হয়ে থাকে। এস্থলের

তাৎপর্য এইযে যে ভক্তের হৃদয় স্বচ্ছ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্যাদি ভাবে দূষিত নয়, সেই ভক্ত শাস্ত্র ও সাধুমুখে রাগাত্মিকাভক্তের যে সব সেবাপরিপাটী সে সকল বিষয় শ্রবণ করলে তাতে রুচি হয়ে থাকে। এই রুচির সহিত তদীয় রাগের অনুগমন করলে তারই সম্বন্ধে রাগানুগাভক্তি প্রবৃত্তা হয়ে থাকে।

এস্থলে শ্রবণ বলতে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রজবাসিজনের প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করেন এবং ব্রজবাসিজন যে ভাবে তাঁর প্রেমসেবা করে থাকেন, তার শ্রবণ-কীর্তন করলে স্ফটিকমণিতে প্রতিবিম্বিত হলে চন্দ্রের কিরণ যেরূপ উল্লাস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রাগসুধাকরের কিরণস্থানীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি থেকে স্ফটিকমণিবৎ ভক্তের স্বচ্ছহৃদয়ে উল্লাসরূপে উদিত রুচিই রাগানুগাভক্তির প্রবর্ত্তক ; অর্থাৎ এই রুচিবিশেষ প্রেরিত হয়ে রাগের অনুগতভাবে যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় তাই রাগানুগাভক্তি। এখানে রুচি বলতে ব্রজবাসী নিত্যপার্ষদগণের যে ভাব, ঐভাব প্রতিপাদক-শব্দময় শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে প্রাচীন সংস্কারবশতঃ উত্তমতা জ্ঞান বুঝায়। এই রাগানুগাভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্তি হতেই লোভের উদয় হয় বলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না।

"রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি॥" (চৈঃচঃ)

লোভোৎপত্তি-কালে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না কিন্তু যে বিষয়ে লোভ হয়েছে তার প্রাপ্তির নিমিত্ত অতি অবশ্যই শাস্ত্রোক্ত শাসনের অপেক্ষা আছে। "রাগানুগাভক্তিঃ শাস্ত্রযুক্তিং ন মন্যতে; তজ্জননে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ। তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণেন জাতত্বাৎ।" (শ্রীল বিশ্বনাথ) ব্রজজনের ভাবমাধুর্য শ্রবণে জাত হয় বলে লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই, কারণ সে সময় শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকলে তাকে লোভ বলা যায় না। "লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ; সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈব অসিদ্ধেঃ।" (রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা) কিন্তু সাধ্য-বস্তু ব্রজপ্রেমলাভ করতে হলে রাগমার্গীয় শাস্ত্রবিধি অবলম্বনেই ভজন করতে হয়। কারণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির বিধানকে ত্যাগ করে যদি ঐকান্তিকী হরিভক্তিও দেখা যায়, তবু তাকে উৎপাত বলেই জানতে হবে।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

(ব্রহ্মযামলতন্ত্র)

তাৎপর্য এইযে, ইতিপূর্বে যে রুচির কথা বলা হয়েছে, তা প্রথমাবস্থায় প্রায় কারই থাকে না। তথাপি শাস্ত্রবিধির আনু-গত্যে ভজন করতে করতে ব্রজবাসিজনের রাগময় চেষ্টা শ্রবণ করে যে রুচির উদয় হয় ঐ রুচিই রাগানুগাভক্তির প্রবর্তক হয়। যাঁদের নির্মলরাগে চিত্ত সতত আবিষ্ট তাঁদের নিকট শ্রবণ করলে শীঘ্র রুচির

উদয় হয়ে থাকে। আবার যাঁদের রাগময়ী চেষ্টার কথা শুনে লোভের উদয় হয় তাঁরাই নিজভাবের অনুগম্যমান পরিকর হন। এই অনুগম্যমান রাগের নিকট পৌঁছিবার উপযোগী যে সাধনক্রিয়া তারই নাম 'রাগানুগা ভজন।' এই ভজন শাস্ত্রবিধি অনুসারেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেননা, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাগানুগাভক্তকে ঐ অনুগম্যমান নিত্যসিদ্ধপরিকরের আচরণের সংবাদ দিয়ে তাকেও রুচিসম্পন্ন করা। কারণ যা সিদ্ধের লক্ষণ তা সাধকের সাধন—"সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ।" যদি দেখা যায় যে ভক্তের রুচি শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করছে তবে বুঝতে হবে সেখানে যথার্থ রুচিরই উদয় হয়নি, রুচিরছলে কোন মায়িকভাবের উদ্গম হয়েছে। বাস্তব রুচির উদয় হলে শাস্ত্রবিধি তার অনুগমন করবে। রুচির পূর্বাবস্থায় শাস্ত্রবিধির অনুগত হয়ে ভজন হয় এবং রুচি উদয়ের পরে শাস্ত্রবিধিই তার অনুগত হয়ে থাকে এই পার্থক্য।

"এবৈবাবিহিতেতি কেষাঞ্চিৎ সংজ্ঞা, রুচিমাত্রপ্রবৃত্ত্যা বিধিপ্রযুক্তেনাপ্রবৃত্তত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং বিধ্যনধীনস্য ন সম্ভবতি ভক্তিরিতি। ( ভাঃ ২।১।৭ ) 'প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরে' ইত্যত্র শ্রূয়তে। ততো বিধিমার্গভক্তির্বিধিসাপেক্ষেতি সা দুর্ব্বলা ইয়ন্তু স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া।" ( ভক্তিসন্দর্ভ—৩১০ অনুঃ )

এই রাগানুগাভক্তি রুচিমাত্র থেকেই প্রবৃত্তা হয়ে থাকে, কোন অংশে বিধিদ্বারা প্রবর্তিত নয় বলে কেউ কেউ একে 'অবিহিতা' সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। একথা বলা যায় না যে, বিধির অনধীন বা নিরপেক্ষজনের ভক্তি হয় না ; শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হয়—'হে রাজন্ ! প্রায়শঃ বিধি-নিষেধের অতীত নৈর্গুণ্যাস্থিত মুনিগণ শ্রীহরির গুণানুকথনে রত হয়ে থাকেন।' অতএব বিধিমার্গ প্রবর্তিতভক্তি বা বৈধীভক্তি বিধিসাপেক্ষ হেতু দুর্বলা এবং রাগানুগাভক্তি বিধিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্তিত হয়, তাই প্রবলা বলে জানতে হবে। এই রাগানুগাভক্তি আরম্ভ মাত্রেই ভক্তিভিন্ন অন্য বিষয়ে অরুচি জন্মিয়ে দেয়। এরই অপর নাম লোভ। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে, যাঁর শ্রীহরিকথায় মতি হয়, তার মতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা হয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে থাকে।

## রাগভক্তির ক্রমোৎকর্ষ।

শ্রীভগবৎবিষয়ে রাগ স্বরূপতঃ এক বা অখণ্ড হলেও ভক্তের অভিমান এবং ভগবানের আবির্ভাব-তারতম্যে রাগ আবির্ভাবেরও তারতম্য হয়ে থাকে। যে ভগবৎস্বরূপে ভগবত্তার অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপে রাগেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ একমাত্র তাঁতেই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ বলে তাঁতেই রাগেরও পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা। আবার শ্রীভগবানের মাধুর্য অনুভবের তারতম্যে

ভক্তগণের অভিমান-বিশেষেরও তারতম্য বা ভেদ হয়ে থাকে। অভিমান বহুবিধ হলেও ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবই মুখ্যতম। তারমধ্যে দাস্য হতে সখ্যে, সখ্য হতে বাৎসল্যে এবং তার থেকে মধুরে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য নিবন্ধন মধুরভাবেই সর্বাধিক উৎকর্ষ জানতে হবে।

রাগাত্মিকাভক্তি সম্বন্ধরূপা ও কামরূপাভেদে দ্বিবিধ। রাগবিশেষ সম্বন্ধদ্বারা শ্রীগোবিন্দে পিতৃত্বাদির অভিমানই সম্বন্ধ-রূপা রাগাত্মিকাভক্তি। যেমন—'আমি গোবিন্দের দাস', 'আমি গোবিন্দের সখা', 'আমি গোবিন্দের পিতামাতা' এরূপ মননই সম্বন্ধরূপা। এতে সম্বন্ধানুরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধের মর্যাদা রক্ষাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্তি হয়। কামরূপাতে সম্বন্ধবিশেষ থাকলেও কামের প্রাধান্যহেতু এটি পৃথক্‌ভাবে উক্ত হয়েছে। মধুররসের আধার ব্রজসুন্দরীগণে কামরূপাভক্তি। এঁদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বীয় প্রাণবল্লভরূপ সম্বন্ধবিশেষ থাকলেও পরকীয়ভাবহেতু এঁদের মধুরপ্রেম সম্বন্ধের গণ্ডীবদ্ধ নয়, এঁদের প্রেমই প্রবল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমানুরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। সুতরাং এই প্রেম-মহত্ত্বের কুত্রাপি তুলনা নাই। ইহা 'কাম' শব্দে অভিহিত হলেও পরম মহত্ত্বপূর্ণ প্রেমবিশেষ।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ)

অর্থাৎ "গোপরামাগণের অতি মহত্ত্বপূর্ণ প্রেমই 'কাম' নামে অভিহিত হয়। ভগবৎপ্রিয় শ্রীউদ্ধবাদি মনীষিগণ এই কাম বাঞ্ছা করে থাকেন।" গোপিকার প্রেমই কোন অনির্বচনীয় মাধুর্য প্রাপ্ত হয়ে কাম নামে অভিহিত হয়, এতে অন্তর আত্মেন্দ্রিয়-সুখভাবনা-শূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখভাবনাময় হয়েও বাইরে কামের ন্যায় ক্রিয়াসাম্য থাকে অর্থাৎ বাহ্যতঃ তদনুরূপ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, এ এক অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্য!

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ প্রীতিসন্দর্ভে লিখেছেন—"এষ ভাবঃ ( কান্তভাব ) কামতুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্য-কাম-বিশেষস্ত্বন্যঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যম্ খলু স্পৃহা-সামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যন্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদনুগত-বিষয়স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। ততো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়চেষ্টত্বেঽপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যা, শুদ্ধপ্রীতিমাত্রস্য চেষ্টা তু প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যৈব।" অর্থাৎ এই কান্তভাব কামতুল্য বলে ব্রজগোপিকাগণে 'কাম' শব্দে অভিহিত হয়ে থাকে। স্মরাখ্য প্রাকৃত কাম থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন; কারণ উভয়ের বহু বৈলক্ষণ্য রয়েছে। সাধারণতঃ 'কাম' শব্দে স্পৃহা বা ইচ্ছা বুঝায়। প্রীতি বা প্রেম বলতেই বিষয়ানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত বিষয়াভিলাষময় জ্ঞান বিশেষকে বুঝায়। অর্থাৎ প্রীতির বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই আনুকূল্যদ্বারা তদনুভব-বিশেষই প্রেম। এজন্য কাম ও প্রেম উভয়ের বাহ্যচেষ্টা সমান

প্রায় হলেও কাম অর্থে স্বসুখতাৎপর্য ও শুদ্ধ প্রেম অর্থে প্রিয়ানুকূল্যই বুঝা যায়। সুতরাং বাহ্যক্রিয়াসাম্যহেতু ব্রজগোপিকাগণের অতি মহত্ত্বপূর্ণ প্রেমই কামনামে অভিহিত হয়। এজন্য তাঁদের ভক্তিকে কামরূপা ভক্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দাস্যাদি ভাব থেকে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য-নিবন্ধন মধুরভাবে শ্রেষ্ঠতার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তার অন্যতম কারণ এইযে, দাস্যভাবের সেবা চামরাদি ব্যজন, তাম্বূলার্পণ, পাদসম্বাহন প্রভৃতি দাস্যভাবোচিত ক্রিয়াবিশেষ। সখ্যভাবেও অনুরূপ সেবা দেখা যায়, কিন্তু খেলায় হারিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ, বসন ধরে আকর্ষণ উচ্ছিষ্ট ফলাদি দান প্রভৃতি দাস্যভাবে সম্ভবপর হয় না। এতে দাস্যভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। এইপ্রকার দাস্য ও সখ্যের ক্রিয়া বাৎসল্যভাবে পাওয়া যায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে হিতাহিত উপদেশ প্রদান, তাঁর ভোজন, পানাদিতে অতিশয় সতর্কতা, তাড়ন-ভৎর্সনাদি বাৎসল্যভাবের ক্রিয়া দাস্য, সখ্যাদিতে নাই। সুতরাং দাস্য সখ্যভাব অপেক্ষা বাৎসল্যভাব শ্রেষ্ঠ। আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যভাবের ক্রিয়াদি সবই মধুরভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে; অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি মধুর ভাবের ক্রিয়া অন্যভাবে নাই; সুতরাং মধুরভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার এই সকল ক্রিয়াদির ব্রজসুন্দরীগণে পূর্ণরূপে বিকাশ দেখা যায়। সুতরাং ব্রজসুন্দরীগণই প্রেমরাজ্যের সর্বোত্তমকক্ষায় স্থিত।

প্রশ্ন হতে পারে দাস্যাদিভাবের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ থাকলেও ভক্তবিশেষের বাসনাভেদে কোন কোন ভাব শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়; সুতরাং মধুরভাব সর্বশ্রেষ্ঠ হবে কিরূপে?

এর উত্তরে বলা হয়েছে, যে ভক্তের যে ভাব সেইটিই তাঁর পক্ষে সর্বোত্তম ঠিকই, কিন্তু তটস্থ হয়ে বিচার করলে তারতম্য অনুমান করা যায়। যে অরসিক সে কখনও রসবিচারে সমর্থ নয়। যিনি রসিক, অর্থাৎ নিজরসে আবিষ্ট অথচ অন্যরসে তটস্থ তিনিই রসবিচার করবেন। যেমন শ্রীউদ্ধব মহাশয় সখ্যমিশ্রিত দাস্যরসের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলায় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হয়ে গোপগোপী সান্ত্বনার জন্য ব্রজে এসে সেই বিরহাবসরে গোপীগণের প্রেমসিন্ধুর যে অদ্ভুত উচ্ছ্বাস দর্শন করেছিলেন, তাতে গোপীপ্রেমের মহামহত্ত্ব বুঝতে পেরে তাঁদের শ্রীচরণের রেণুকণায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্য ব্রজে তৃণ, গুল্ম হয়ে জন্মাবার প্রার্থনা করেছেন, ইহা শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হয়।

যদি বলা যায়, তাহলে সকলেরই সর্বোত্তম মধুরভাবে প্রবৃত্তি হয় না কেন?

এর উত্তরে বলা হয়েছে, মধুরভাব সর্বোত্তম হলেও ঐ দাস্যাদি ভাবের মধ্যে কোনটিতে কোনও ভক্তের প্রাক্তন বাসনানুসারে অথবা এই জন্মেই মহৎকৃপার জাতি অনুসারে রুচি হয়ে থাকে। যেমন মধুররস শ্রেষ্ঠ হলেও মধুর, অম্ল, কটু প্রভৃতি ষড়্-রসের মধ্যে কারও কোনটিতে রুচি হয়, অন্যরসে হয় না; সেইরূপ

দাস্য, সখ্যাদি ভাবের মধ্যে কারও কোনটিতে রুচি হয়ে থাকে। অবশ্য এটি সাধকভক্ত-সম্বন্ধেই জানতে হবে। কেননা রাগাত্মিকা ভক্তগণের দাস্যাদি ভাব স্বভাবসিদ্ধ। নিজ নিজ ভাবানুসারে যাঁরা নিজ হতে শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ অধিক প্রীতি বহন করে থাকেন এবং যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই আনন্দস্বরূপ তাঁরাই রাগাত্মিকা ভক্ত। এই রাগাত্মিকা ভক্তের রতিপ্রাদুর্ভাবের হেতু কেবল সংস্কারই। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি দ্বারাই সংস্কারের উল্লাস সাধিত হয় মাত্র। এই রাগাত্মিকা ভক্তগণমধ্যে ব্রজসুন্দরীগণই শ্রেষ্ঠা এবং এই মহাভাববতী গোপীগণমধ্যে শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা ; যেহেতু মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র তাঁতেই বিদ্যমান। এই মাদনভাবই প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা।

স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে এই মধুরভাব দ্বিবিধ। তার মধ্যে যাঁরা বিবাহবিধি অনুসারে প্রাপ্তা এবং পতির আদেশপালনে তৎপরা ও শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্যধর্মে অচলা তাঁরাই স্বকীয়া দ্বারকার ষোড়শসহস্র অষ্টোত্তরশত মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা অতএব স্বকীয়াকান্তা। যাঁরা অতুলনীয় অনুরাগবশতঃ স্বজন ও আর্যপথাদি ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিণী সেই ব্রজদেবীগণই পরকীয়াভিমানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে থাকেন। এই ব্রজদেবীগণ বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করে পরিণয়সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রণয়াবদ্ধ না হয়ে একমাত্র অনুরাগভরেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতা হয়েছেন। সুতরাং এঁদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা অচিন্ত্য অনুরাগেরই

ফল। এই সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁদের স্বজন আর্যপথ ত্যাগ করতে হয়েছে, ধর্মাধর্মকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। এটিই অনুরাগের চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্থল। তাই এঁদের প্রেমের চরমসীমা মহাভাবপর্যন্ত উন্নীত। তার মধ্যে মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধারাণীরই ভাবসম্পদ্।

ব্রজদেবীগণের ভাবটিই কেবল পরকীয়ার প্রকৃতপক্ষে এঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ বলে এঁদের পরকীয়াভাব-নিগীর্ণ দাম্পত্য। "পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥" (চৈঃ চঃ) "অত্রৈব পরমোৎকর্ষ শৃঙ্গারস্থ প্রতিষ্ঠিতঃ" (উঃ নীঃ) পরকীয়াভাবে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত শৃঙ্গাররসোল্লাস আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের রসিকশেখরতার পরাকাষ্ঠা প্রকটিত হয়। অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ থেকে রসগত উৎকর্ষই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারিক সম্বন্ধ লুপ্ত করে কেবল অনুরাগের আতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের পারস্পরিক রসোল্লাসময় মিলনসংঘটন করাবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটনশক্তি যোগমায়া আপনপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ব্রজদেবীগণে পরকীয়ভাবের আবরণ দিয়ে প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করায়ে থাকেন।

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করায় মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ)

## কামরূপা ভক্তিভেদ।

রাগাত্মিকাভক্তি যে সম্বন্ধাত্মিকা ও কামাত্মিকা এই দ্বিবিধ সে বিষয় আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই কামাত্মিকাভক্তি আবার দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগেচ্ছাময়ী (২) তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা।

"কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা॥"
( ভঃ রঃ সিঃ )

'কেলিতাৎপর্যবতীই সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং নায়িকাগণের ভাবমাধুর্যকামিতাই তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা।' এখানে 'সম্ভোগ' বলতে শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দিতে তাঁর সঙ্গে শ্রীরাধাদি যূথেশ্বরীগণের অঙ্গসঙ্গাদির অনুভাবক প্রেমবিশেষই বাচ্য। এই জাতীয় প্রেমবিশেষের অভিলাষরূপা যে ভক্তি তাই সম্ভোগেচ্ছাময়ী এটি নায়িকাভাব। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নায়িকাগণের অঙ্গসঙ্গাদি বিষয়ে সাহায্য করাতেই স্বীয় সুখাতিশয় জ্ঞানে নায়ক-নায়িকার আকর্ষক যে ভাববিশেষ তাতে অভিলাষময়ী যে ভক্তি,

তাই তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা এটি সখীভাব। এই ভক্তিতে সখীগণ কেবল নিজ নিজ যূথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদি আস্বাদন বিষয়ে সহায়তা করেন এবং তাতেই নিজসুখাতিশয় মেনে থাকেন। তত্তদ্‌সুখে স্বীয় সুখবোধ হেতু তাঁরা কখনই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের ইচ্ছা করেন না। কেননা যূথেশ্বরীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ হলে তাঁরা যে আনন্দ লাভ করেন তা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। অধিক কি, এই বিস্ময়কর সখীভাব নায়ক-নায়িকাকেও বিমুগ্ধ করে। তাঁরাও এই ভাববিশেষের স্পৃহা করে থাকেন। অতএব এই সখীভাব নায়িকাভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে ইহা 'মুখ্য কামানুগাভক্তি'।

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটিসুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥" (চৈঃচঃ)

"স্পৃশতি যদি মুকুন্দো রাধিকাং তৎসখীনাং
ভবতি বপুষি কম্প-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বাষ্পম্।

অধর-মধু মুদাস্যাশ্চেৎ পিবত্যেষ যত্না-

দ্ভবতি বত তদাসাং মত্ততা-চিত্রমেতৎ ॥"

( শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ )

"শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করেন, তাহলে দূরস্থ তাঁর সখীগণের দেহে কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ ও বাষ্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হয়ে থাকে এবং যদি শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে শ্রীরাধার অধরমধু পান করেন, তাহলে তাঁর সখীদের দেহে মত্ততা জাত হয়, এ-এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।"

যূথেশ্বরীগণের তুল্য রূপগুণশালিনী, প্রেম লীলা ও বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণী এবং বিস্রম্ভরত্নের পেটিকাসদৃশ ব্রজসুন্দরীগণই সখী। শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সীর প্রতি প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রীতিসম্পন্না বলে তাঁদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমগুণাদির কীর্তন, উভয়েরপ্রতি উভয়ের আসক্তিকারিতা, উভয়ের অভিসার, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রেয়সীকে সমর্পণ, পরিহাস, আশ্বাস দান বেশভূষারচনা, মনোভাব প্রকাশনে দক্ষতা, নায়িকার দোষ গোপন, পত্যাদি গুরুজনের বঞ্চনা-শিক্ষাদান, যথাকালে নায়ক-নায়িকার মিলন সম্পাদন, সময়ানুরূপ সেবা নায়ক ও নায়িকাকে তিরস্কার সন্দেশ প্রেরণ, বিরহে নায়িকার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যত্ন এতদ্ব্যতীত বিপক্ষা সখীগণের চেষ্টাদির বৈফল্যসাধন প্রভৃতি বিবিধ সখীগণের কার্য বা সেবা দেখা যায়।

এই সখীগণের পাঁচ প্রকার ভেদ, যথা—(১) সখী,

(২) নিত্যসখী, (৩) প্রাণসখী, (৪) প্রিয়সখী ও (৫) পরম-প্রেষ্ঠসখী। এঁদের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবানুসারে কেউ বিষম-স্নেহা, কেউ সমস্নেহা, কেউবা অধিকস্নেহা। শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা ধনিষ্ঠা, বিন্ধ্যাদি বিষমস্নেহা এঁরা সখী। প্রিয়সখী, কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি এবং পরম-প্রেষ্ঠসখী ললিতাদি অষ্টসখী সমস্নেহা। কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি প্রাণসখী ও নিত্যসখী এঁরা অধিকস্নেহা বা রাধাস্নেহাধিকা।

শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীচিত্রা, শ্রীইন্দুরেখা, শ্রীচম্পক-লতা, শ্রীরঙ্গদেবী, শ্রীতুঙ্গবিদ্যা ও শ্রীসুদেবী—এই অষ্টজন পরম-প্রেষ্ঠসখী। এঁরা শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ বহন করেও 'আমরা শ্রীরাধারই' এরূপ অভিমান পোষণ করে থাকেন বলে শ্রীরাধাতেই এঁদের মমতার আতিশয্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। বাস্তবিকরূপে এঁরা শ্রীরাধার প্রাণবন্ধুরূপেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে থাকেন—স্বকীয় প্রাণবন্ধুরূপে নয়। এঁদের সঙ্গে যে শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদি হয় সেও শ্রীরাধার সুখের নিমিত্তই যথা—

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট।
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত পরমপ্রেষ্ঠা সখীগণ শ্রীরাধাতে অধিক প্রীতি বহন করে থাকেন ঐ প্রীতি শেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে পর্যবসিত হয়। আবার এঁদের প্রীতি শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান হয়েও যে সময়বিশেষে ন্যূনাধিকরূপে প্রতীত হয় তা প্রেমস্বভাবেই হয়ে থাকে বুদ্ধিপূর্বক নয়। একস্থলে মমতাধিক্য সত্ত্বেও উভয়স্থলেই স্নেহসাম্য হতে পারে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বলেন—

"আসাং সুহৃদ্দ্বয়োরেব প্রেম্ণঃ পরমকাষ্ঠয়া।
কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষতে॥" (উঃনীঃ)

শ্রীললিতাদি প্রিয়নর্মসখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পরাকাষ্ঠা-প্রযুক্ত কখনও শ্রীরাধার প্রতি অধিক প্রীতি প্রকাশ করেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক প্রীতিশীলা হন—এটিই সখীভাব।

যাঁরা বিষমস্নেহা ( ধনিষ্ঠাদি ) শ্রীরাধা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অধিকস্নেহ বহন করেন, এঁদের অনুগামিনী কোন সখী নেই সুতরাং পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে এঁরা ন্যূনা। এঁদের আনুগত্যে ভজনের প্রথা নেই।

## মঞ্জরীভাব।

যাঁরা অধিকস্নেহা বা রাধাস্নেহাধিকা শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরী, শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরা সখীগণই মঞ্জরী। এঁরা সর্বাবস্থায় অপরিসীম ও অনির্বচনীয় নবনবায়মান সেবানন্দের আস্বাদন লাভ করে থাকেন। যদিও এঁদের অন্তরে শ্রীযুগলের

সেবাব্যতীত অন্য কোন বাসনারই স্থান নেই, তবু মঞ্জরীভাবের এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ়সেবার স্বরূপগত ধর্মবশতঃই এই আনন্দ এঁদের আপনা-আপনিই অনুভূত হয়ে থাকে। এঁদের ভাব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যেও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সেবার প্রভাবে তাঁকেও আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করে দেয়। এঁদের রতিই চমৎকারিতার চরমসীমায় আরূঢ়া হয়ে 'ভাবোল্লাসা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

"সঞ্চারী স্যাৎ সমোনা বা কৃষ্ণরত্যাঃ সুহৃদ্রতিঃ।
অধিকা পুষ্যমাণা চেদ্ভাবোল্লাস ইতীর্য্যতে ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ )

অর্থাৎ ললিতাদি সখীগণের যে রতি, তা যদি শ্রীকৃষ্ণরতির সমান বা ন্যূন হয়, তবে সুহৃদ্‌রতি (শ্রীরাধার প্রতি রতি) সঞ্চারিভাবমধ্যে পরিগণিত হয়। কেননা ঐ সুহৃদ্‌রতি শ্রীকৃষ্ণরতিমূলক হয়ে শ্রীকৃষ্ণরতির পোষকই হয়। আর যদি শ্রীকৃষ্ণরতি থেকেও অধিক এবং সতত অভিনিবেশদ্বারা সম্যক্ বর্ধিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক পুষ্যমাণা হয়, তবে ঐ সুহৃদ্‌রতিকে ভাবোল্লাসা' আখ্যা দেওয়া হয়। এই ভাবোল্লাসাখ্য রতিই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীস্নেহাধিকা মঞ্জরীগণের স্থায়িভাব। এই রতির অনুগত যে ভাব, তাই সাধকভক্তনিষ্ঠ সেবাপরা মঞ্জরীভাব। এই মঞ্জরী-ভাবই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের আচরিত ও প্রচারিত চরম-

সাধ্যবস্তু। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁর প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখেছেন —

"সমস্নেহা বিষমস্নেহা, না করিহ দুই লেহা,
কহি মাত্র অধিকস্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে,
নর্ম্মসখী এই সব জন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তূরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতূহলী ॥
এ সবা অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিব রস সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥
যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী রহিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায় ॥"

রাগসাধক নিত্যসিদ্ধা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের আশ্রিতা ও অনুগতা হয়ে মঞ্জরীভাবে উপাসনা করবেন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা অপেক্ষা শ্রীরাধার সেবা বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ করবেন এবং শ্রীরাধারই একান্ত আশ্রিত নিজজনরূপে নিজেকে ভাবনা করবেন। প্রশ্ন হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই সকলশাস্ত্রে চরম সাধ্যবস্তুরূপে নিরূপণ করেছেন সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় না করে শ্রীরাধার সঙ্গে প্রণয়ের প্রয়োজন কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে, শ্রীরাধার প্রণয়ের অধীনরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রণয় স্বয়ংই অধিক রূপে উদিত হবে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"বয়মিদমনুভূয় শিক্ষয়াম, কুরু চতুরে! সহ রাধয়ৈব সখ্যম্।
প্রিয়সহচরি! যত্র বাঢ়মন্ত,—র্ভবতি হরিপ্রণয়প্রমোদলক্ষ্মীঃ॥"

(উঃ নীঃ)

এইশ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত আনন্দচন্দ্রিকা টীকার তাৎপর্য—"শ্রীমণিমঞ্জরী কোন নবীনা সখীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বল্লেন, 'হে চতুরে? আমি স্বয়ং অনুভব করে তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, তুমি শ্রীরাধার সহিতই সখ্য স্থাপন কর। যদি বল শ্রীহরির সহিত প্রণয় না করে শ্রীরাধার স.ইত প্রণয়ের প্রয়োজন কি? হে প্রিয়-সহচরি! তার কারণ বলি শ্রবণ কর, শ্রী-রাধার প্রতি যদি তোমার প্রীতি প্রগাঢ় হয়, তা'হলে শ্রীহরিপ্রীতি-রূপ প্রমোদলক্ষ্মী (আনন্দসম্পত্তি) স্বয়ংই এসে উপস্থিত হবে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে তোমার প্রীতি, তা শ্রীরাধাপ্রীতির

মধ্যে পূর্ণভাবে নিহিত আছে। অতএব শ্রীরাধার সহিত সখ্য হলে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রীতি যে স্বয়ং এসে উপস্থিত হবে, এতে আর বক্তব্য কি? অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত তোমার সখীত্ব সিদ্ধ হলে 'এ আমার প্রিয়তমার সখী' এই বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ তোমাতে অধিক স্নেহ প্রকাশ করবেন। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় করলে তিনি তোমার প্রতি যতটা প্রীতি করবেন শ্রীরাধার প্রতি প্রণয়ে তদপেক্ষা অধিক প্রীতি করবেন। সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি প্রীতি সিদ্ধ হলে তোমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি বিনা যত্নে স্বতঃই সিদ্ধ হবে। যেহেতু নিজের প্রতি প্রীতি হতেও শ্রীরাধার প্রতি প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ অধিক সুখী হয়ে থাকেন। আবার কোন সময়ে শ্রীরাধার মান হলে কিম্বা তিনি গুরুজনকর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হলে তাঁর প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের তোমার অপেক্ষা অর্থাৎ সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন হবে, তখন তিনি স্বয়ংই তোমার সঙ্গে সখ্যস্থাপন করবেন; সুতরাং তাঁর প্রতি সখ্যবিধান জন্য তোমায় আর স্বতন্ত্রভাবে যত্ন করতে হবে না।' বিশেষতঃ রহস্যময় শ্রীকৃষ্ণ-রসমাধুরী আস্বাদন করতে হলে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের আরাধনা অপরিহার্য। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ ॥" (স্তবাবলী)

'যে ব্যক্তি শ্রীরাধাপাদপদ্ম-রেণুর আরাধনা করেনি, তাঁর পদাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবনও আশ্রয় করেনি, শ্রীরাধার দাস্যভাবে গম্ভীর-চিত্ত মহানুভবের সঙ্গে সম্ভাষণও করেনি, সেই ব্যক্তি শ্যামসিন্ধুর অর্থাৎ দুরবগাহ শ্রীকৃষ্ণরূপ সমুদ্রের রসাবগাহনে অর্থাৎ নিগূঢ় রসাস্বাদে কিরূপে সমর্থ হবে?' এজন্য শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ সখ্যাদি ছেড়ে একান্তভাবে শ্রীরাধার দাস্যই কামনা করেছেন—

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর-দাস্যমেব,
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি)

'হে দেবি শ্রীরাধিকে! তোমার পাদপদ্মে শ্রেষ্ঠ দাস্য ব্যতীত আমি কোনকালেই অন্য (সখ্যাদি) কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার সখীতে আমার নিত্যই নমস্কার থাকুক, তোমার দাসীত্বেই আমার দৃঢ় অনুরাগ হোক্—আমি শপথ করে বলছি।' রাধাদাস্য সাধারণ দাস্য নয়, এটি বরদাস্য বা শ্রেষ্ঠ দাস্য। সখী হয়ে দাসী মধুর রসান্তর্গতভাবে সেবাধিকারিণী। আগে রসের অনুভূতি, শেষে সেবা। সুতরাং রাধাদাস্য রসে গড়া দাস্য।*

---

* বিশেষতথ্য জানতে হলে মৎসম্পাদিত বিলাপকুসুমাঞ্জলি রাধারসসুধানিধি গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধারাণীর ইচ্ছায় ও চেষ্টায় কখনও ললিতাদি সখীগণের শ্রী-কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনাদি হয়ে থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে এমন-কি স্বীয় যূথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্যেও মঞ্জরীগণ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখে স্পৃহাবতী হন না। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে বর্ণিত আছে –

"অনন্যশ্রীরাধাপদকমলদাস্যৈকরসধী
হরেঃ সঙ্গে রঙ্গং স্বপনসময়ে নাঽপি দধতী।
বলাৎ কৃষ্ণে কূর্পাসকভিদি কিমপ্যাচরতি কা-
প্যুদশ্রুর্মেবেতি প্রলপতি মমাত্মা চ হসতি॥"

'যিনি শ্রীরাধাপদকমলের দাস্যরসেই অনন্যচিত্তা, (জাগ্রত-দশায় ত নয়ই) স্বপ্নেও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গ বা মিলনাদি স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁর কঞ্চুকাদি ছিন্ন ভিন্ন করে কিছু আচরণ করলে এমন কোন মঞ্জরী অশ্রুযুক্তা হয়ে, না — না—এরূপ প্রলাপ করছেন, তা দেখে আমার আত্মা বা প্রাণ-স্বরূপিণী শ্রীরাধা হাস্য করছেন। এরূপ শ্রীরাধাচরণে একান্ত শরণাগতির ফলে মঞ্জরীগণ শ্রীললিতাদি সখীগণেরও অলভ্য রহস্য-ময় যুগলসেবানন্দ লাভে ধন্য হয়ে থাকেন। যথা—

"তাম্বূলার্পণ-পাদ-মর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে॥"

(ব্রজবিলাসস্তব)

"তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা যাঁরা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নিয়ত পরিতৃপ্তি বিধান করছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ঠসখী শ্রীললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাও যাঁদের শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেলিভূমিতে গমনাগমনে অসঙ্কোচিত ভূমিকা রয়েছে—সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রধানা শ্রীরাধার দাসীগণকে আমি সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করি।" শ্রীরাধার দাস্যাভিলাষী গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের প্রাণভরা কামনা—

"কবে হেন দশা হবে সখীসঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব।
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥" (প্রার্থনা)

## রাগানুগাভজনরীতি।

নিত্যপার্ষদ ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যে জাতীয়ভাব ঐ ভাব পরিপাটী শ্রবণাদির ফলে ঐরূপ ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত লুব্ধব্যক্তিই রাগানুগা ভজনের অধিকারী। "তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রা-

ধিকারবান্।" ( ভঃ রঃ সিঃ ) রাগানুগার অধিকারিব্যক্তি কিভাবে ভজন করবেন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তা বর্ণনা করেছেন—

"কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ )

'নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে এবং তৎপ্রিয়তম অথচ সাধকের স্বজাতীয় ভাবযুক্ত ভক্তকে স্মরণ করতে করতে সমর্থ হলে দেহদ্বারা বৃন্দাবনে বাস করবে। অসমর্থে মনেও ব্রজে বাস করবে। সাধক-রূপে ( যথাবস্থিতদেহে ) এবং সিদ্ধরূপে ( অন্তশ্চিন্তিতদেহে ) ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রিয়জনের ভাবলিপ্সু হয়ে তাঁদের আশ্রিত ও অনুগতভাবে সেবায় প্রবৃত্ত হবে।'

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্ম এরূপ যে, শ্লোকদ্বয়ে রাগানুগার ভজন-পরিপাটীর কথা বলা হয়েছে। 'প্রেষ্ঠ' বলতে নিজপ্রিয়তম কিশোর শ্রীনন্দনন্দনকে এবং এইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তজন অথচ নিজের সমান বাসনাযুক্ত নিত্যপরিকরকে স্মরণ করতে করতে ব্রজে বাস করবে। সামর্থ্য থাকলে শরীরদ্বারা শ্রীমন্ নন্দব্রজের শ্রীবৃন্দাবনাদির কোন স্থানে বাস করবে। অসামর্থ্যে মনে মনেও তাতে বাস করা কর্তব্য।

সাধকরূপে বলতে যথাবস্থিতদেহে এবং সিদ্ধদেহে বলতে

অন্তশ্চিন্তিত তৎ সেবোপযোগিদেহে সেই ব্রজস্থ নিজের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে মধুরাখ্যভাব, সেই ভাব ( রতিবিশেষ ) লাভেচ্ছু ব্রজলোকগণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতির অনুসরণ করে সেবা করবেন। আর সাধকরূপে তাঁদের অনুগত শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতির অনুসরণে সেবা করবেন। অর্থাৎ সিদ্ধরূপে মানসীসেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা শ্রীরূপ-মঞ্জরীর আনুগত্যে এবং সাধকরূপে কায়িক্যাদি সেবা শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসিজনের আনুগত্যেই কর্তব্য। এখানে 'অনু-সারে' বলতে অনুকরণ বুঝায় না, অনুসরণই বুঝায় অর্থাৎ তাঁদের ভাবের অনুগত হয়েই তদনুসারে সেবা করবেন।

এই রাগানুগামার্গে লীলাস্মরণই ভজনের মুখ্য অঙ্গ, কিন্তু ভজনের প্রথমাবস্থায় লীলাস্মরণে তাদৃশ অধিকার হয়না বলে শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ মুখ্যভাবে যাজন করতে করতে চিত্ত যতই শুদ্ধ হতে থাকে, ক্রমশঃ ততই লীলাস্মরণের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হতে থাকে এবং স্মরণও গাঢ় হতে থাকে। পরিশেষে ভজনের পরিপক্কাবস্থায় লীলাস্মরণই মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ বৈধী-ভক্তিতে যে সব শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিঅঙ্গের কথা বলা হয়েছে, এই রাগানুগামার্গেও সেই সব অঙ্গের উপযোগীতা আছে যথা—

"শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদিনী বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ )

এখানে শ্রবণ-কীর্তনাদি বলতে আক্ষেপলব্ধ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদিও বুঝতে হবে। কারণ বৈধীভক্তিতে যে সব ভক্ত্যঙ্গ পূর্বে কথিত হয়েছে এই রাগানুগামার্গেও সেই সেই ভজনাঙ্গের অপেক্ষা দেখা যায়। কেননা ব্রজলোকের আনুগত্যে তত্তৎ কথায় রত না হলে তাঁদের আনুগত্যই সিদ্ধ হয় না। অতএব মনীষিগণ স্বীয় ভাবোচিত অঙ্গগুলিরই অনুষ্ঠান করবেন, কিন্তু তদ্বিরুদ্ধ আচরণ করবেন না। এস্থলে ভাববিরুদ্ধ আচরণ বলতে অর্চনমার্গে অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, প্রাণায়ামাদি দ্বারকাধ্যান, শ্রীরুক্মিণীর পূজা প্রভৃতি। এসকল ভক্ত্যঙ্গ যদিও আগমশাস্ত্রবিহিত, তথাপি এই রাগানুগাভক্তিমার্গে এই সব অঙ্গের অনুষ্ঠান করা উচিৎ নয়। এই ভক্তিমার্গে যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গ-বৈকল্যে কিছু ক্ষতি হয় না।*

এই রাগানুগাসাধন দু'প্রকারে সাধিত হয়—একটি বাহ্যদেহের সাধন, অপরটি অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের সাধন। যথাবস্থিত সাধকদেহদ্বারা শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজজনের আনুগত্যে শ্রবণ, কীর্তন, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রজবাসাদি ও সাক্ষাদ্রূপে সংগৃহীত যথাযোগ্য দ্রব্যাদিদ্বারা অভীষ্টের পরিচর্যাদি কর্তব্য। অন্তশ্চিন্তিত সাক্ষাৎ সেবোপযোগী সিদ্ধদেহদ্বারা নিজপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এবং

---

* মৎ-সম্পাদিত রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায় স্বাভীষ্টভাবময়াদি সাধনপঞ্চক দ্রষ্টব্য।

নিজের অভিলষণীয় শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রিয়াবর্গকে আশ্রয় করে যে উজ্জ্বলাখ্যভাব বিদ্যমান, তা লাভ করার ইচ্ছুক হয়ে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুসরণে মানসে সংগৃহীত যথাযোগ্য দ্রব্যাদি দ্বারা কালোপযোগী সেবা ভাবনা কর্তব্য।

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" (চৈঃ চঃ)

## সাধকের সিদ্ধদেহ।

সাধকের সিদ্ধদেহ বলতে শ্রীগুরূপদিষ্ট অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য দেহ। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলেন, অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সেবোপযোগী দেহ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন, অন্তরে চিন্তিত অভীষ্টের সাক্ষাৎ সেবার উপযোগী দেহ। এই 'সাক্ষাৎ' শব্দের দ্বারা সাধকদশায় অন্তরে চিন্তিত দেহই সিদ্ধদশায় সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয় বলে জানতে হবে। রাগানুগামার্গে অজাতরতি সাধকগণ মনোমধ্যে স্বীয় অভিলষিত সিদ্ধদেহ ভাবনা করে সেই দেহেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা চিন্তা করেন। জাতরতি সাধকগণের চিত্তে ঐ সিদ্ধদেহ স্বয়ংই স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

সাধকের অন্তশ্চিন্তিত ঐ দেহটি কল্পিত নয়—পরম সত্য, নিত্য ও চিদানন্দস্বরূপ। কেউ কেউ মনে করেন, জীবাত্মা

স্বরূপতঃ চিৎস্বরূপ হলেও অণুপরিমাণ, সুতরাং প্রথমতঃ সাধকের চিন্তাটি একটি কল্পিত মানসদেহকে অবলম্বন করেই হয়, পরে সাধকের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান্ "যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই নিয়মানুসারে সাধকের আত্মাকে পার্ষদ করে দেন। সুতরাং পরিণামে সিদ্ধদেহটি সত্য হলেও সাধনকালে তা কল্পিতই। এটি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সম্মত কথা নয়। সাধকের সিদ্ধদেহ নিত্যধামের শোভাসম্পদ্রূপে নিত্যই অবস্থিত। এই দেহসমূহ চিদানন্দস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্ত্বময়। শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়—"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের জ্যোতির অংশভূত অনন্তমূর্তি ভগবদ্বৈকুণ্ঠের শোভাসম্পদ্রূপে তথায় বিদ্যমান আছেন। শ্রীভগবানের কারুণ্যঘনমূর্তি শ্রীগুরুদেব ধ্যানপ্রভাবে সেসব নিত্যসিদ্ধ মূর্তিসমূহের মধ্যে যেটি সাধকের পার্ষদদেহ তাই সাধককে জানিয়ে দেন। সেই নিত্যপার্ষদমূর্তিকে 'আমি' অভিমানে চিন্তন করার নামই সিদ্ধদেহের চিন্তন। সুতরাং সাধনক্রমে সিদ্ধদেহের সৃষ্টি হয় না, ভক্তিসিদ্ধিক্রমে সাক্ষাৎ ভগবৎসেবার যোগ্যতা লাভ হলে সাধক অন্তশ্চিন্তিত নিত্যসিদ্ধ দেহেই সেবাসৌভাগ্য লাভ করে থাকেন। সুতরাং সাধকগণকে সাধনকালে শ্রীগুরুপরম্পরায় সিদ্ধপ্রণালী অবলম্বনে শ্রীগুরুপ্রদত্ত স্বীয় সিদ্ধস্বরূপ ভাবনা করতে হয়। সিদ্ধস্বরূপ চিন্তনের প্রকার শ্রীসনৎকুমার সংহিতায় শ্রীসদাশিব বলেছেন—

"পরকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়াজনাঃ।
প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়াম্॥
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপ-যৌবন-সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন ততো ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বীতম্॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাস্বাদভরেণাতি সুনির্বৃতাম্॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মমূহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ সান্তা মহানিশা॥"

"পরকীয়াভিমানিনী ব্রজসুন্দরীগণ যেমন আপনাপন ভাবানুসারে প্রিয়তম বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে প্রচুর আনন্দপ্রদান করে থাকেন, তুমিও তদ্রূপ তাঁদের ভাবের আনুগত্যে নিজেকে সেই ব্রজধামে গোপকিশোরীগণের মধ্যে একজন পরিচারিকারূপে চিন্তা করবে। তোমার চিন্তার প্রকার যথা—"আমি অতি মনোজ্ঞা রূপ-যৌবন-সম্পন্না কিশোরী প্রমদাকৃতি গোপবনিতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নানাবিধ শিল্পকলায় অভিজ্ঞা শ্রীরাধার নিত্য অনুচরী" এরূপ ভাবনা করবে। শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন করায়ে সেই সেবা-সুখে সুখী হওয়াই তোমার প্রেমসেবা। যদি কখনও কোন-

স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় রতি প্রার্থনা করেন, তুমি তাতে পরাঙ্মুখী হবে। কেননা, তুমি শ্রীরাধার পরিচারিকা—তাঁর সুখই তোমার সুখ। এভাবে শ্রীরাধার অনুচরীরূপে নিত্যকাল সেবা-পরায়ণা হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধারাণীতে অধিক প্রীতি বহন করে অষ্টকাল প্রীতিপূর্বক শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সম্পাদন করে সেবাসুখে নিমগ্না হবে। অর্থাৎ এভাবে নিজসিদ্ধদেহ চিন্তন করে শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবারসে নিমগ্না থাকবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত হতে আরম্ভ করে নিশান্তকাল পর্যন্ত যথাবিহিত সেবা করবে।"

যাঁদের সিদ্ধদেহ-চিন্তন, লীলাস্মরণাদি সুস্পষ্ট হয় না, বরং কিছু কিছু কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়, তাঁদের পক্ষে নিজসিদ্ধদেহ-চিন্তন, লীলাস্মরণাদির প্রতি অত্যাগ্রহ না করাই ভাল। মহাভাগবতগণের শ্রীমুখে লীলাশ্রবণাদির সাহায্যে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ-মননরূপ গোপীভাবের অনুশীলন, গোপীভাবের মহিমাব্যঞ্জক গ্রন্থাদি পাঠ, সেই ভাব প্রাপ্তির জন্য লালসাময়ী প্রার্থনাদির কীর্তন ও পুনঃপুনঃ আবৃত্তিই তাঁদের পক্ষে প্রশস্ততম ভজন। এভাবে ভজন করলে ক্রমশঃ সিদ্ধদেহের চিন্তন সুষ্ঠু হবে এবং যুগললীলা স্মরণ-মননে অধিকার ও শ্রীযুগলের প্রেমসেবা ভাবনাও সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। এক্ষণে শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধদেহের একাদশ ভাবের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

## সিদ্ধদেহের একাদশভাব।

"নাম রূপং বয়ো বেশঃ সম্বন্ধো যূথ এব চ।
আজ্ঞা সেবা পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ॥"

নাম, রূপ, বয়স, বেশ সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসী ও নিবাস এই প্রসিদ্ধ একাদশভাব।

(১) নামলক্ষণম্—

"শ্রীরূপমঞ্জরীত্যাদি নামাখ্যানানুরূপতঃ।
চিন্তনীয়ং যথাযোগ্যং স্বনাম ব্রজসুভ্রুবাম্॥"

যাঁরা ব্রজসুন্দরীরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেবা লাভ করতে ইচ্ছা করেন, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের অনুরূপ যথাযোগ্য স্বীয় মঞ্জরীনাম তাঁদের চিন্তনীয়।

(২) অথ রূপম্—

"রূপং যূথেশ্বরীরূপং ভাবনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং কামোদ্দীপনং গোপিকাপতেঃ॥"

যূথেশ্বরীর রূপের অনুরূপ সাধকমঞ্জরীর স্বীয় রূপ যত্নসহকারে ভাবনীয়। যে রূপ ত্রৈলোক্যমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও কামোদ্দীপক।

(৩) অথ বয়ঃ—

"বয়ো নানাবিধং তত্র যত্ত্ৰ ত্রিদশবৎসরম্।
মাধুর্য্যাদ্ভুত কৈশোরং বিখ্যাতং ব্রজসুভ্রুবাম্॥"

বাল্য, পৌগণ্ডাদি ভেদে বয়স নানাবিধ হলেও সাধক-

মঞ্জরীর অদ্ভুত কৈশোর মাধুর্যময় ত্রয়োদশ বৎসর বয়সই খ্যাত।

(৪) অথ বেশঃ —

"বেশো নীলপটাদ্যৈশ্চ বিচিত্রালঙ্কৃতৈস্তথা।
স্বস্থ দেহানুরূপেণ স্বভাবঃ রসসুন্দরঃ॥"

স্বীয় দেহের অনুরূপ নীল-পীতাদি বসন এবং বিচিত্র অলঙ্কারাদির দ্বারা স্বভাব ও রসের অনুকূল সুন্দর বেশ হবে।

অথ সম্বন্ধঃ —

"সেব্য-সেবক সম্বন্ধঃ স্বমনোবৃত্তিভেদতঃ।
প্রাণাত্যয়েঽপি সম্বন্ধং ন কদা পরিবর্ত্তয়েৎ॥"

স্বীয় মনোবৃত্তির ভেদবশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ সম্বন্ধ থাকিলেও সেব্য-সেবক সম্বন্ধই মুখ্য। প্রাণত্যাগেও কদাচ এই সম্বন্ধের ব্যবচ্ছেদ হয় না।

(৬) অথ যূথঃ

"যথা যূথেশ্বরী-যূথ সদা তিষ্ঠতি তদ্বশে।
তথৈব সর্ব্বদা তিষ্ঠেদ্ ভূত্বা তদ্বশবর্ত্তিনী॥"

যূথ যেমন যূথেশ্বরীর অনুগতভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ যূথ-প্রবিষ্ট সাধকমঞ্জরীও সর্বদা যূথেশ্বরীর বশবর্তিনী হয়ে অবস্থান করবেন।

(৭) অথ আজ্ঞা —

"যূথেশ্বর্য্যাঃ শিরস্যাজ্ঞামাদায় হরিরাধয়োঃ।
যথোদিতাং তচ্ছুশ্রূষাং কুর্য্যাদানন্দসংযুতাম্॥"

মঞ্জরীগণের যূথেশ্বরী শ্রীরূপমঞ্জরী, তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আনন্দের সহিত যথোক্তভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই সেই সেবা করতে হবে।

(৮) অথ সেবা—

"চামর-ব্যজনাদীনাং সংযোগ প্রতিপালনম্।
ইতি সেবা পরিজ্ঞেয়া যথামতি বিভাগশঃ ॥"

এখানে সেবা বলতে স্ব স্ব রুচিগত বিভাগানুসারে প্রতি-পালনীয় নির্দিষ্ট সেবা। যেমন, চামরব্যজন, গন্ধদ্রব্যদান, জলদান, তাম্বূলদান প্রভৃতি সেবা বুঝতে হবে।

(৯) অথ পরাকাষ্ঠা—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যদ্বদ্ রূপমঞ্জরীকাদয়ঃ।
প্রাপ্তা নিত্য-সখীত্বঞ্চ তথা স্যামিতি ভাবয়েৎ ॥"

"শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি যেমন শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসখীত্ব প্রাপ্ত তদ্রূপ আমিও তাঁদের অনুগতভাবে তৎসদৃশ নিত্যসখীত্ব পদ অবশ্য প্রাপ্ত হব"—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসপূর্বক সাধক স্বীয় মঞ্জরীদেহ ভাবনা করবেন।

(১০) অথ পাল্যদাসী—

"পাল্যদাসী চ সা প্রোক্তা পরিপাল্যা প্রিয়ংবদা।
স্বমনোবৃত্তিরূপেণ যা নিত্যা পরিচারিকা ॥"

পাল্যদাসী বলতে যিনি শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তিরূপা হয়েও

পরিপাল্যা এবং প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি গুণশালিনী হয়েও তাঁরই নিত্য পরিচারিকা।

(১১) অথ নিবাসঃ—

"নিবাসো ব্রজমধ্যে তু রাধাকৃষ্ণস্থলে মতঃ।
বংশীবটশ্চ শ্রীনন্দীশ্বরশ্চাপ্যতি কৌতুকঃ॥"

শ্রীব্রজমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলে যেমন বংশীবট, শ্রী-নন্দীশ্বর প্রভৃতি স্থানে অতি কৌতুকবশতঃ নিবাস হয়ে থাকে।

সিদ্ধদেহে গোপীভাবের অনুগত সেবাভিলাষই চিত্তেরকঠোরতা অপনীত করে দ্রবীভাব সম্পাদন করে থাকে। ক্ষুধা যেরূপ আহার্য বস্তুর ভোজনজনিত সুখের সহায়ক হয়, তদ্রূপ সেবাভি-লাষই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণাদিজনিত মাধুর্য আস্বাদনের সহায়তা বিধান করে। যাঁরা গোপীভাবের অনুগত হয়ে সেবাভিলাষ করেন, তাঁদেরই লীলামাধুর্যরসের আস্বাদন লাভ হয়ে থাকে। ভক্তভাবের পূর্ণতম বিকাশের নামই "গোপীভাব"। এই গোপী-ভাবেই সর্বাধিক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন লাভ হয়। একান্তভাবে নিজসুখকামনাশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যাবতীয় চেষ্টাই গোপীভাবের বিশেষ লক্ষণ। মঞ্জরীগণে এই বৃত্তি সর্বাধিক বিকাশ প্রাপ্ত। মঞ্জরীগণ শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের সেবা কামনায় সতত তন্ময়। মনের অবস্থাবিশেষকে 'ভাব' বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষপ্রাপ্ত অথবা মানসিক চিন্তনাদিদ্বারা স্মৃত বিষয়ের সঙ্গে মনের যে তন্ময়বৃত্তি সাধারণতঃ তাকেই, 'ভাব' বলে। শ্রীশ্রীরাধা-

মাধবের সেবারসে ঐকান্তিক তন্ময়তাই 'মঞ্জরীভাব'। মঞ্জরীভাবের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সাধক সেই ভাবে ভাবিতচিত্ত হয়েই উপাসনা করবেন।

## মন্ত্রময়ী ও স্বারসিকী উপাসনা।

প্রকট ও অপ্রকট ভেদে শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধ ; তার মধ্যে অপ্রকটলীলার উপাসনার দুটি ভেদ আছে—স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ী। "তত্রাপ্রকটা দ্বিবিধা—মন্ত্রোপাসনাময়ী স্বারসিকী চ" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-১৫৩ অনুঃ) তার মধ্যে যে যে মন্ত্রে যে যে লীলার উপাসনা বিহিত, সেই সেই লীলাযোগ্য কোন একস্থানে অর্থাৎ যোগপীঠে নিত্যস্থিতিশীলা যে লীলা এবং সেই লীলাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রময়ী ধ্যানানুসারে লীলাপরিকরগণের যেরূপ সংস্থিতি বর্ণিত হয়েছেন, তদনুসারে তাঁদের উপাসনাকে মন্ত্রময়ী উপাসনা বলা হয়। এলীলা একস্থানে একরূপে নিত্যস্থিতি বিশিষ্টা বলে এক একটি লীলাত্মকস্থান যেন স্রোতস্বিনীর হ্রদের ন্যায়; সুতরাং মন্ত্রধ্যানময়ী সাধন স্রোতস্বিনীরূপা স্বারসিকী সাধনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নদীর মধ্যে মধ্যে হ্রদ থাকে, সেই প্রকার স্বারসিকী লীলারূপ নদীর মধ্যে মধ্যে হ্রদবৎ যোগপীঠলীলা বিরাজিত। এই যোগপীঠে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করার নামই 'মন্ত্রময়ী উপাসনা'। এই প্রকার ব্রজের মধ্যে বহুস্থানে বহু প্রকাশে বিবিধ মন্ত্রোপাসনাময়ী যোগপীঠলীলা বিদ্যমান।

বৌধায়নস্মৃতি অনুসারে মন্ত্রময়ী উপাসনার ধ্যান—

"গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদ্ গবাং মধ্যে স্থিতং শুভম্।
বর্হাপীড়সংযুক্তং বেণুবাদনতৎপরম্।
গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বন্যপুষ্পাবতংসকম্॥"

অর্থাৎ "মনে মনে শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করবে—তিনি গো-সকলের মধ্যে অবস্থিত, শুভ ময়ূরপুচ্ছ-রচিত চূড়াসমন্বিত, বেণু-বাদন তৎপর, গোপীজনে পরিবৃত, বনফুলে তাঁর কর্ণভূষণ রচিত।" শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার উল্লেখ আছে যথা,—"তদ হোবাচ—হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্।" তদিহশ্লোকা ভবন্তি—

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বম্॥
গোপ-গোপী-গবাবৃতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্কারণোপেতং রত্নমণ্ডপমধ্যগম্॥
কালিন্দীজল-কল্লোল-সঙ্গিমারুত-সেবিতম্।
চিন্তয়েচ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥"
"গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥" ইতি

শ্রীব্রহ্মা বল্লেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ, মেঘের ন্যায় শ্যামল-কান্তি, কিশোরমূর্তি সৎপুণ্ডরীকনয়ন, পীতাম্বর দ্বিভূজ, মৌন-মুদ্রাধারী, বনমালী, ঈশ্বর, দিব্যালঙ্কারভূষিত, গোপ-গোপী-গোগণ-পরিবৃত, কল্পতরুমূলস্থিত, রত্নমণ্ডপে সমাসীন, কালিন্দী-

জলকণা-সংসিক্ত বায়ূদ্বারা সেবিত কৃষ্ণকে মনে মনে সেবা করলে সংসার থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়। 'গোবিন্দ' 'সচ্চিদানন্দ' ইত্যাদি বাক্যগুলি মন্ত্রময়ী উপাসনার পরিচায়ক।

এই মন্ত্রময়ী উপাসনা আবার দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বর্ণিত লীলার মধ্যে যে সংযোগময়ী উপাসনা তা একবিধ। স্মরণ-মননাত্মক শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে তা চিন্তনীয়। দ্বিতীয় হচ্ছে অর্চাবিগ্রহের উপাসনা। স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেবই ভক্তের প্রেমসেবা গ্রহণের নিমিত্ত মৌনমুদ্রা ধারণ করে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহবৎ অবস্থান করছেন। প্রেমিকভক্তগণের নিকটে মৌনমুদ্রা ত্যাগকরে সেবককে স্বপ্নযোগে বিবিধ সেবার আদেশ করেন, সাক্ষাৎ শ্রীমুখেও কথা বলেন। অতীব রহস্যহেতু এবং আচার্যগণের নিষেধ থাকায় প্রকাশ্য ভাবে তাঁরা তা—কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। এই উপাসনার বিষয় স্মৃতিশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে বিবৃত আছে।

স্বারসিকী লীলা বলতে স্ব-রস-সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা। এই স্বারসিকীলীলা হচ্ছে প্রবাহরূপা। এলীলা আদি-মধ্য-অন্তহীনা, নানাবৈচিত্রময়ী ; সুতরাং এর অন্তর্ভুক্ত বহু লীলা। এসব লীলা একই সময়ে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয় ; সুতরাং অপ্রকট লীলার সামগ্রিকভাবে প্রবাহরূপা লীলাই স্বারসিকীলীলা। এলীলা স্বেচ্ছাময়ী ও যথাবসরে অনুষ্ঠিতা। "যথা-

বসর-বিবিধস্বেচ্ছাময়ী স্বারসিকী” (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—১৫৩ অনুঃ) শ্রীকৃষ্ণকে বিচিত্র লীলারস আস্বাদন করাবার জন্য তাঁর লীলা-শক্তিই যথাযথ সময়ে যথাযথ লীলা প্রকটিত করেন। এভাবে স্বারসিকীলীলা মন্ত্রময়ী লীলাকে ক্রোড়ীকৃত করে বিবিধ বৈচিত্রী সহকারে নিত্যকাল প্রবহমানা। প্রকটলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় গমন করেন, তৎকালে ব্রজপরিকর-গণের উৎকট বিরহের সময়েও এই বৃন্দাবন ধামেরই এক প্রচ্ছন্ন প্রকাশে নিত্য সংযোগময়ী প্রবাহরূপা স্বারসিকীলীলা চলতে থাকে এবং পরিকরবৃন্দ তা অনুভবও করেন কিন্তু তীব্রবিরহের আবেশে তাঁদের তা স্ফূর্তি বলেই মনে হয়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামি-পাদ বলেন—

“বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদি বিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥” (উঃনীঃ)

“শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা শ্রীব্রজদেবীগণের সঙ্গে রাসাদি লীলায় বিহার করছেন. শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁদের কখনই বিরহ হয় না।” এতে অপ্রকট লীলা-বিশেষেরই বিহার সূচিত হয়েছে। ‘বৃন্দারণ্য’ বলতে এখানে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশের কথাই বলা হয়েছে (শ্রীজীবের টীকার মর্ম)। “গো-গোপ-গোপীকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা” এই পদ্মপুরাণবাক্যেও ‘ক্রীড়তি’ এই বর্তমান প্রয়োগে সর্বদা বিহার সূচিত হয়।

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

"চিন্তামণিসমূহদ্বারা নির্মিত গৃহসকলে এবং অসংখ্য কল্প-বৃক্ষ সুশোভিত বৃন্দাবনে যিনি সুরভি সকলকে পালন করছেন, যিনি শত সহস্র গোপসুন্দরীগণকর্তৃক পরমাদরে সেব্যমান সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।" এইশ্লোকে স্বারসিকী লীলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাপঞ্চিক মানবের নয়নে যে লীলা প্রকাশিত হয়, তাই প্রকটলীলা আর প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট যা' অপ্রকাশিত তাই অপ্রকটলীলা। এতে লীলাগত ভেদ নেই, দ্রষ্টাগত ভেদ মাত্র। অর্থাৎ প্রকট ও অপ্রকট লীলায় স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য নাই, তবে অপ্রকট লীলার প্রাপঞ্চিকলোক ও বস্তুর সঙ্গে মিশ্রণ নাই; প্রকটে কিন্তু প্রাপঞ্চিকের মিশ্রণ দেখা যায়। এই প্রকটলীলা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় দেশ, কালাদির পরিচ্ছেদরহিত হয়েও পরিছিন্নের ন্যায় আরম্ভ সমাপ্তি বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁর স্বরূপশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত - কাল-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বলে জানতে হবে।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ব্রজের অভিন্নধাম শ্রীশ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এবং ব্রজপার্ষদগণ যে তথায় প্রেমিক ভাগবতরূপে নিত্যলীলারসাস্বাদন করেন; সাধকগণ প্রথমতঃ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মন্ত্রময়ীলীলা অর্থাৎ যোগপীঠের ধ্যান ও স্বারসিকী লীলার ভাবনা করে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে প্রতিটি লীলায় ব্রজভাবে আবিষ্ট হলে সাধকও স্বীয় মঞ্জরী স্বরূপে ব্রজে সপার্ষদ শ্রীশ্রীরাধামাধবের মন্ত্রময়ী যোগপীঠসেবা ও স্বারসিকী অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ, মননাদি করে থাকেন। ভজনসিদ্ধিতে "সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা" ( প্রেঃ ভঃ চঃ ) এই রীতি অনুসারে নিত্যধামে নিত্যলীলায় সিদ্ধস্বরূপে উভয়লীলাতেই সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হন। 'হেথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ' ( শ্রীল ঠাকুরমহাশয় ) এটিই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনতনাদি আচার্যপাদগণের আশ্রিত ও অনুগত গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধকগণের রাগানুগাভক্তি সাধনার নিগূঢ় রহস্য ।

# প্রেমতত্ত্ব-বিজ্ঞান

## প্রেম কাকে বলে ?

"হ্লাদিনীর সার—প্রেম" ( চৈঃ চঃ ) 'প্রেম' হ্লাদিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি ; হ্লাদিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ। ভজনপ্রভাবে ভগবৎ কৃপায় যখন সাধকের চিত্তের সমস্ত মালিন্য দূরীভূত হয়ে যায়, চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তি ভক্তচিত্তে স্থিতি প্রাপ্ত হন। ভক্তের চিত্ত তখন হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমান ধর্ম লাভ করে। লৌহ যেমন অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়ে অগ্নির সমান ধর্মতা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ। তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মনের যোগেই শুদ্ধসত্ত্ব স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করতে থাকে, এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত হ্লাদিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেও মনের বৃত্তি বলেই বিবেচিত হয় এবং তা-ই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা 'প্রেম' নামে কথিত হয়। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম।" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণে এই শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিরূপা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রেম নিত্য বিরাজিত। সাধকের চিত্ত শ্রবণ, কীর্তনাদির দ্বারা পরিমার্জিত হলে শ্রীভগবানের নিত্য-পার্ষদগণে বিরাজিত এই প্রেম-ভক্তি মন্দাকিনীধারার ন্যায় সাধু-ভক্তরূপ প্রণালিকার মধ্য দিয়ে প্রপঞ্চে অবতরণ করে সাধকের চিত্তে প্রকাশিত হন। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥" ( চৈঃ চঃ ) এক্ষণে বুঝা গেল, এই মায়িক বিশ্বে আবির্ভূত হলেও 'প্রেম' কখনই মায়া-শক্তির বৃত্তি নন্; ইনি চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরই বৃত্তি-বিশেষ। সুতরাং জগতের প্রীতি বা ভালবাসাকে যাঁরা 'প্রেম' নামে অভিহিত করেন, যেমন 'ভ্রাতৃ প্রেম', 'সমাজ প্রেম', 'স্বদেশ প্রেম', 'নায়কনায়িকার পারস্পরিক প্রেম'—তাঁরা এই 'প্রেম' শব্দটির যে কতখানি অবমাননা করেন, তা সহজেই বোধ-গম্য হয়। বস্তুতঃ—

> "কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
> আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ;
> কামের তাৎপর্য্য - নিজ সম্ভোগ কেবল।
> কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য—হয় প্রেমত প্রবল ॥" (চৈঃ চঃ )

জড়ীয় ভালবাসা বা জীবের পারস্পরিক প্রীতির নাম কাম। এই কাম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনায় লৌহের ন্যায় মলিন, প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনায় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। কাম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনায় পূতিগন্ধময় নরক, আর প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনার নন্দন কানন। কাম আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনায় অমানিশার অন্ধকার, আর প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনার স্বপ্রকাশ দিবালোক !

"অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন —

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ১৪১)

যে ভাবভক্তি প্রথমদশা অপেক্ষা চিত্তের অতিশয় আর্দ্রতা বা স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় মমতা প্রদান করে সেই ভাবকেই পণ্ডিতগণ 'প্রেম' আখ্যা দিয়ে থাকেন। ভাব ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভাব চিত্তমাসৃণ্যকারী, প্রেম সম্যক্ প্রকারে মসৃণতাকারী, ভাবে রুচির সাধকতমতা, প্রেমে মমত্বাতিশয়বত্তা। শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের বাণী উদ্ধৃত করে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্বাতিশয়বত্তা প্রমাণিত করেছেন —

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥"

'যাতে দেহ-গেহাদি অখিল বিষয়ে মমতাশূন্য হয়ে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুবিষয়েই মমতা প্রযুক্তা হয় ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি মহাজনগণ তাকেই 'প্রেম' আখ্যা দিয়ে থাকেন।' "সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো" এইশ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"অত্র সান্দ্রাত্মকত্বং স্বরূপলক্ষণম্, অন্যদ্বয়ং তটস্থলক্ষণম্" অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলে প্রেম ঘনীভূত আনন্দরূপা, এটি প্রেমের স্বরূপলক্ষণ এবং সম্যক্ চিত্তমাসৃণ্যকারী ও শ্রীবিষ্ণুতে মমত্বাতিশয়বত্তা এই দুটি প্রেমের তটস্থলক্ষণ। "আকৃতি প্রকৃতি দুই স্বরূপলক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥" ( চৈঃ চঃ ) প্রেমের আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ হচ্ছে সান্দ্রতা বা গাঢ়তা। এই অংশেই ভাব থেকে প্রেমের বৈশিষ্ট্য। ভাব তরল ভাগবতীপ্রীতি আর প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত ভাগবতীপ্রীতি। প্রেমের প্রকৃতি বা উপাদানগত স্বরূপলক্ষণ হচ্ছে হ্লাদিনীর সার সমবেত সম্বিৎসাররূপা। একথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

বস্তুর তটস্থ লক্ষণ প্রকাশ পায় তার কার্যের দ্বারা বা প্রভাবের দ্বারা। প্রেমের তটস্থলক্ষণ হচ্ছে দুটি—সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তত্ব ও মমত্বাতিশয়াঙ্কিতত্ব। চিত্তস্থিত ভাব বা রতি গাঢ়তা লাভ করলে বা প্রেমের আবির্ভাব ঘটলে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মসৃণ

হয়, অর্থাৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণসম্বন্ধী অভিলাষ বর্ধিত হয়। চিত্তদ্রবের লক্ষণ অশ্রু, পুলকাদির দ্বারা বাহ্যে প্রকাশ পায়। যথা—

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২৩)

অর্থাৎ 'চিত্তের দ্রবতা ব্যতীত রোমহর্ষ হয় কিরূপে? রোমহর্ষব্যতীত আনন্দাশ্রুকলা প্রকাশ পায় কিরূপে? আর আনন্দাশ্রুকলাব্যতীত চিত্তশুদ্ধি কিরূপে হয়?' শ্রীমৎ জীব-গোস্বামিপাদ প্রীতিসন্দর্ভে (৬৯ অনুঃ) লিখেছেন—"তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকম্। কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে, রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্॥" 'এরূপে দেখা গেল, প্রীতির লক্ষণ চিত্তদ্রবতা এবং চিত্তদ্রবতার লক্ষণ হচ্ছে রোমহর্ষাদি। চিত্ত কথঞ্চিৎ দ্রবীভূত হলেও এবং তার ফলে দেহে কথঞ্চিৎ রোমহর্ষাদি দৃষ্ট হলেও যদি চিত্তশুদ্ধি না ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে কৃষ্ণপ্রেমের সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই।'

এসব প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যখন চিত্ত শুদ্ধ হয় তখন সেই চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়; ভক্তির আবির্ভাবে ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত সাধকের বিপুল উৎকণ্ঠা জাগে এবং সেই উৎকণ্ঠারূপ অগ্নিদ্বারা সাধকের চিত্তরূপ স্বর্ণ দ্রবী-

ভূত হয় — "দর্শনোৎকণ্ঠাগ্নিদ্রুতীকৃতচিত্তজাম্বুনদঃ" ( শ্রীজীবপাদ )
এভাবে প্রেমের উদয়ে চিত্ত সম্যগ্ দ্রবীভূত হলে প্রেমিক রোদন
গান, নৃত্যাদি করে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১১।৩।৩১—৩২ )
দৃষ্ট হয় —

"স্মারন্তঃ স্মরয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ হসন্তি ক্রন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"

অর্থাৎ 'যাঁদের চিত্তে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তগণ সর্বপাপনাশন শ্রীহরির স্মরণ করে এবং পরস্পরকে স্মরণ করায়ে সাধনভক্তি থেকে উদ্ভূতা প্রেমভক্তির প্রভাবে পুলকিত তনু ধারণ করেন। অচ্যুত শ্রীভগবানের চিন্তা করে তাঁরা কখনও বা রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও বা ক্রন্দন করেন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন, গান করেন ; অজ শ্রীভগবানের অনুশীলন করে তাঁরা পরমানন্দ লাভে মৌনাবলম্বন করে থাকেন।'

কৃষ্ণপ্রেমের আর একটি তটস্থলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে মমতাতিশয়বত্তা। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে ( ৮৪ অনুঃ ) লিখেছেন — "মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতিভঙ্গহেতবো যদীয়মুত্তমং স্বরূপং বা ন গ্লপয়িতুমীশতে। মমতাতিশয়েন প্রীতিসমৃদ্ধিশ্চান্যত্রাপি দৃশ্যতে। যথোক্তং

মার্কণ্ডেয়ে 'মার্জ্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে। ন তাদৃঙ্‌ মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেন মুষিকে'ইতি। অতএব প্রেমলক্ষণায়াং ভক্তৌ প্রচুরহেতুত্বজ্ঞাপনার্থং মমতায়া এব ভক্তিত্বনির্দ্দেশঃ নারদপঞ্চরাত্রে অনন্যমমতা বিষ্ণৌ ইত্যাদি।" "মমতাতিশয়ের আবির্ভাবে সমৃদ্ধা যে প্রীতি তারই নাম 'প্রেম'। প্রেম জাত হলে প্রীতিভঙ্গের হেতুসমূহ প্রেমের উদ্যম বা স্বরূপের ক্ষীণতা জন্মাতে পারে না। (অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হলেও প্রেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, প্রীতিমূলক আচরণও বিলুপ্ত হয় না ) মমতাতিশয়দ্বারা যে প্রীতি সমৃদ্ধ হয়, তা অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন মার্কণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে—'গৃহপালিত কুক্কুট মার্জারকর্তৃক ভক্ষিত হলে যেরূপ দুঃখ হয়, যাতে মমতা নেই সেই মুষিক চটকপক্ষী কর্তৃক ভক্ষিত হলে তত দুঃখ হয় না।' (গৃহপালিত কুক্কুটের প্রতি মমত্ব বুদ্ধি আছে বলেই তার মৃত্যুতে দুঃখ : মুষিকে তা নেই বলেই তার মৃত্যুতে দুঃখ নেই )। অতএব প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে মমতার আধিক্য আছে বলে মমতাকেই ভক্তি বলা হয়েছে। নারদপঞ্চরাত্রে দৃষ্ট হয় - 'অন্যবিষয়ে মমতা বর্জিতা প্রেমসংপ্লুতা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি মমতাই ভক্তি'।"

## প্রীতির লক্ষণসূচক বাক্যসমূহের নিষ্কর্ষ।

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ প্রীতি বা প্রেমের লক্ষণসূচক বাক্যসমূহের আলোচনা করে তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে ৭৮ অনুচ্ছেদে তাদের নিষ্কর্ষ বা সারমর্ম এরূপ প্রকাশ করেছেন।

অথ শ্রীভগবৎপ্রীতিলক্ষণবাক্যানাং নিষ্কর্ষঃ "নিখিল-পরমানন্দ-চন্দ্রিকা-চন্দ্রমসি সকলভুবনসৌভাগ্য-সারসর্ব্বস্ব-সত্ত্ব-গুণোপজীব্যানন্ত - বিলাসময়ামায়িক - বিশুদ্ধসত্ত্বানবরতোল্লাসাদ-সমোর্দ্ধমধুরে শ্রীভগবতি কথমপি চিত্তাবতারাদনপেক্ষিতবিধিঃ স্বরসত এব সমুল্লসন্তী বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেদ্যা তাৎপর্য্যান্তরমসহমানা হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষস্বরূপা ভগবদানুকূল্যাত্মক-তদনুগত-তৎ-স্পৃহাদিময়-জ্ঞানবিশেষাকারা তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহা পীযূষ-পূরতোঽপি সরসেন স্বেনৈব স্বদেহং সরসয়ন্তী ভক্তকৃতাত্মরহস্য-সঙ্গোপন-গুণময়রসনা বাষ্পমুক্তাদি-ব্যক্তপরিষ্কারা সর্ব্বগুণৈক-নিধান-স্বভাবা দাসীকৃতাশেষ-পুরুষার্থ-সম্পত্তিকা ভগবৎ-পাতি-ব্রত্যব্রতবর্য্যাপর্য্যাকুলা ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা ভাগবতী প্রীতিস্তদুপসেবমানা বিরাজত ইতি।"

অনন্তর শ্রীভগবৎ-প্রীতিলক্ষণ বাক্যসমূহের নিষ্কর্ষ বলা হচ্ছে। নিখিল পরমানন্দচন্দ্রিকার চন্দ্রমা, সকলভুবনের সৌভাগ্য-সার-সর্বস্ব প্রাকৃত সত্ত্বগুণের উপজীব্য অনন্ত বিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধসত্ত্বের অনবরত উল্লাসহেতু অসমোর্দ্ধ মধুর শ্রীভগবানে কোন প্রকারে চিত্তের অবতারণাহেতু বিধির অপেক্ষা না করে স্বভাবতঃই যিনি সম্যক্‌রূপে উল্লাসপ্রাপ্ত হন, বিষয়ান্তরদ্বারা যিনি খণ্ডিত হন না, যিনি তাৎপর্যান্তর সহ্য করতে পারেন না, হ্লাদিনীসার-বৃত্তি-বিশেষ যাঁর স্বরূপ, ভগবদানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত ভগবৎ-প্রাপ্ত্যাভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষ যাঁর আকার, তাদৃশভক্তের

মনোবৃত্তিবিশেষ যাঁর দেহ, পীযূষপূর বা অমৃতসার থেকেও সরস আপনাদ্বারা যিনি নিজদেহ রসযুক্ত করেন, ভক্তকৃত-আত্মরহস্য-সংগোপন গুণময় রসনা বা চন্দ্রহার এবং নেত্রাশ্রুরূপ মুক্তাদি যাঁর ভূষণরূপে পরিব্যক্ত, নিখিলগুণ আপনাতে নিহিত রাখাই যাঁর স্বভাব, অশেষ পুরুষার্থ সম্পত্তিকে যিনি দাসী করেছেন, ভগবানে পাতিব্রত্যব্রতনিষ্ঠাদ্বারা যিনি আত্মহারা, ভগবানের মনোহরণই যাঁর একমাত্র উপায় – এমন চিত্তহারিণী ভাগবতীপ্রীতি তাঁকে অধিক-রূপে সেবা করে বিরাজ করছেন।

এই নিষ্কর্ষে প্রেমের স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি তার স্বরূপলক্ষণ। ভাগবতীপ্রীতি আসলে যে বস্তু অর্থাৎ যা এঁর উপাদান, তাই হচ্ছে এঁর প্রকৃতি। প্রীতি বা প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষরূপা" অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তির যে সার বা ঘনীভূত অবস্থা তারই বৃত্তিবিশেষ প্রীতির স্বরূপ বা প্রকৃতি।

আর প্রীতির আকৃতি হচ্ছে—"ভগবদানুকূল্যাত্মক-তদনুগত-তৎস্পৃহাদিময়-জ্ঞানবিশেষাকারা" অর্থাৎ প্রীতির আকার জ্ঞান-বিশেষের আকারের ন্যায়। কিরূপ সেই জ্ঞান? ভগবানের আনুকূল্যাত্মক জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রীভগবানের কিসে প্রীতিবিধান হয়, সেই জ্ঞান এবং তাদৃশ জ্ঞানের আনুগত্যে আনুকূল্যবিধানের অভিলাষাদিময় জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধিকা সেবাভিলাষ

এই হচ্ছে প্রীতির আকৃতি। এই আকৃতির পরিচয়টি আরও একটু স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে—"তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহা" অর্থাৎ ভগবানে প্রীতিযুক্ত ভক্তের মনোবৃত্তিবিশেষই হচ্ছে ভাগবতী প্রীতির দেহ। অর্থাৎ জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে একমাত্র ভগবৎ-প্রীতিবিধানের নিমিত্ত যে তীব্র আকৃতিপূর্ণ মনোবৃত্তি জন্মে, তাই ভাগবতী-প্রীতির আকার বা রূপ।

এরূপে ভাগবতী প্রীতির স্বরূপলক্ষণের কথা বলে তটস্থলক্ষণের কথা বলেছেন। 'কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ।' কয়েকটি কার্যের উল্লেখ করেছেন।

(১) অনপেক্ষিতবিধিঃ—ভাগবতীপ্রীতি কোন বিধির অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশ ও বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা রাখেন না, ইনি স্বতঃস্ফূর্ত-বস্তু।

(২) স্বরসত এব সমুল্লসন্তী—ভাগবতীপ্রীতি নিজের রসেই রসময়ী অর্থাৎ হ্লাদিনীর বৃত্তি বলে স্বতঃই মধুরা।

(৩) বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেদ্যা—অন্য কোন বিষয়ের দ্বারাই ইনি ভিদ্যমানা হন না, অর্থাৎ স্বর্গ, মোক্ষাদি কোন পুরুষার্থই ভগবৎসুখৈকতাৎপর্যময়ী বাসনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

(৪) তাৎপর্য্যান্তরমসহমানা—ভাগবতীপ্রীতি কখনই তাৎপর্যান্তর সহ্য করতে পারেন না। অর্থাৎ ভগবৎসেবা-কামনাব্যতীত নিখিল অন্য কামনা থেকে প্রীতিমান্ ভক্ত দূরে সরে থাকেন।

(৫) পীযূষপূরতোঽপি সরসেন স্বেনৈব স্বদেহং সরসয়ন্তী—

অমৃতনির্মিত পূর ( পিষ্টকাদির মধ্যে নিহিত অতীব আস্বাদ্যবস্তু ) অপেক্ষাও মাধুর্যবিশিষ্ট এই ভাগবতীপ্রীতি, অর্থাৎ ভাগবতী-প্রীতিতে মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। নিজের স্বাদে বা মাধুর্যে ইনি মাধুর্যময়ী; আবার নিজেই নিজেকে রসময়ী করে রাখেন। প্রীতি-মান্ ভক্ত এর আস্বাদন পান বলে এটিও একটি তটস্থলক্ষণ।

(৬) ভক্তকৃতাত্মরহস্য-সঙ্গোপন-গুণময়-রসনা, বাষ্পমুক্তাদি-বাক্তপরিষ্কারা—এতে ভাগবতীপ্রীতির কয়েকটি ভূষণের কথা বলা হয়েছে। প্রীতিমান্ ভক্ত সতত আত্মগোপনের চেষ্টা করেন; নিজের মধ্যে যে প্রেমের আবির্ভাব হয়েছে, একথা কাউকে জানতে দিতে ইচ্ছা করেন না। এই মহদ্‌গুণটি ভাগবতীপ্রীতির চন্দ্রহারের তুল্য। প্রেমের আবির্ভাবে যে ভক্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, সেই আনন্দাশ্রুকে প্রীতির মণি-মুক্তাদির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এসব ভূষণে ভাগবতীপ্রীতির রমণীয়তা বর্ধিত হয়। প্রেমের প্রভাবেই ভক্ত আত্মগোপনে চেষ্টিত হন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন বলে এসমস্তও প্রেমের তটস্থলক্ষণ।

(৭) সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা—ভাগবতীপ্রীতি স্বভাবতঃই নিখিল সদ্‌গুণের একমাত্র আশ্রয়। যাঁর চিত্তে ভাগবতীপ্রীতির আবির্ভাব ঘটে, তাঁর চিত্তে সমস্ত সদ্‌গুণের সমাবেশ হয়। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ( ভাঃ ৫।১৮।১২ )

(৮) দাসীকৃতাশেষ-পুরুষার্থসম্পত্তিকা—অশেষ পুরুষার্থ-

সম্পদ্ ভাগবতীপ্রীতির দাসীর তুল্য হয়ে তাঁর পরিচর্যার অভি-লায করে থাকেন।

(৯) ভগবৎ-পাতিব্রত্য-ব্রতবর্য্যাপর্য্যাকুলা – পতিব্রতা রমণী যেমন সতত পতিসেবার দ্বারা পতির প্রীতিবিধানের জন্যই ব্যাকুলা, তদ্রূপ যাঁর চিত্তে ভাগবতীপ্রীতির আবির্ভাব হয় তিনি সতত সেবাদ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের জন্যই আকুল হয়ে থাকেন।

(১০) ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা ভাগবতীপ্রীতির একমাত্র প্রয়াসই হচ্ছে শ্রীভগবানের মনকে হরণ করা।

এরূপ ভাগবতীপ্রীতির গতি কোন্ দিকে, তা জানতে পারলেই প্রীতির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়, তাই লিখেছেন— 'নিখিল পরমানন্দ-চন্দ্রিকা-চন্দ্রম্' এবং 'অনন্ত-বিলাসময়ামায়িক-বিশুদ্ধসত্ত্বানবরতোল্লাসাদসমোর্দ্ধমধুরে ভগবতি' অর্থাৎ যে প্রীতির একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান্ তিনি নিখিল পরমানন্দরূপ চন্দ্রিকার চন্দ্র, অর্থাৎ অনন্ত চিন্ময়ানন্দের মূল উৎস এবং অনন্ত বিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধসত্ত্বের অনবরত উল্লাসহেতু অসমোর্ধ্ব মধুর— অর্থাৎ অতুলনীয় মাধুর্যের কল্লোলিত সিন্ধুস্বরূপ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁর মাধুর্যকাদম্বিনী অষ্টমী অমৃতবৃষ্টিতে প্রেমের যে লক্ষণ ও অনুভাবগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হচ্ছে – সাধনকালে ভক্তের যে চিত্তবৃত্তি দেহ, গেহ, বিত্তাদিতে নিবদ্ধ থাকে, প্রেম অবলীলাক্রমে সেই চিত্তবৃত্তিসমূহকে উন্মুক্ত করে নিজপ্রভাবে মায়াময় চিত্তবৃত্তি-

গুলিকে চিদানন্দময় করে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণাদিমাধুর্যে নিবদ্ধ করে। মহাসূর্যের ন্যায় সমুদিত হয়ে সেই প্রেম সহসা নিখিল পুরুষার্থরূপ নক্ষত্রসমূহকে বিলুপ্ত করে দেয়। প্রেমমাধুর্যের আস্বাদে প্রমত্ত হয়ে ভক্ত মহাবলশালী যোদ্ধার ন্যায়, অতিশয় আবেশে বিচাররহিত মহাধনলোলুপ তস্করের ন্যায় নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যান। তখন যত আস্বাদন—তত পিপাসা, যত পিপাসা—তত আস্বাদন। এরূপ প্রেম ও ভগবন্মাধুরী উভয়েই উভয়কে নিরতিশয়ভাবে বর্ধিত করে প্রেমিকের চিত্ত মনকে এক অখণ্ড আস্বাদনের ভূমিতে নিয়ে যায়।

তৎপরে অদ্ভুত প্রেম উৎকণ্ঠার প্রাবল্য ও শান্তির মাধুর্য এই উভয়বিরুদ্ধভাব যুগপৎ প্রেমিকের চিত্তে উদিত করে প্রতি-ক্ষণেই ভগবৎসাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষী ভক্তের উৎকণ্ঠাকে এমনভাবে বর্ধিত করেন যে, স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবানের রূপ, লীলারমাধুর্যে আর তৃপ্তি হয় না। তখন তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনেরা বারিহীন অন্ধকূপের ন্যায়, গৃহ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, যৎকিঞ্চিৎ আহার মহাপ্রহারের ন্যায় সজ্জনকৃত প্রশংসা সর্পদংশনের ন্যায়, প্রাত্যহিক কৃত্য-কর্তব্য মৃত্যুবৎ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহাভারবৎ, সুহৃদ্‌গণের সান্ত্বনা বিষদৃষ্টিবৎ, জাগরণ অনুতাপ সাগরের ন্যায়, নিদ্রা জীবন বিদ্রা-বিণীর ন্যায়, দেহধারণ ভগবন্নিগ্রহের ন্যায়, প্রাণ পুনঃপুনঃ ভর্জিত ধানের ন্যায় অধিক কি পূর্বে ( সাধনদশায় ) যে ভগবচ্চিন্তন একান্ত অভিলষিত বলে মনে হত এখন তাই আত্মনিকৃন্তনের ন্যায় বোধ হতে থাকে।

তদনন্তর প্রেমই চুম্বকের ন্যায় লৌহস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে প্রেমিকের নয়নগোচর করিয়ে দেয়। শ্রীভগবানও তখন স্বীয় সৌন্দর্য, সৌরভ্য, সৌস্বর্য, সৌকুমার্য, সৌরস্য, ঔদার্য, কারুণ্য প্রভৃতি স্বরূপভূত মঙ্গলময় গুণ সকলকে নিজভক্তের নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করে থাকেন। এসব গুণ পরম মধুর ও নিত্য নূতন হওয়ায় তার আস্বাদনে প্রবৃত্ত ভক্তের হৃদয়ে প্রতিক্ষণে বর্ধমানা এমন এক মহতী উৎকণ্ঠা জন্মে এবং পরিশেষে তার ফলে ভক্তের চিত্তে এমন এক আনন্দমহোদধির আবির্ভাব ঘটে থাকে যে, কোন কবিবাক্যই তার পরিমাণ নিরূপণে সমর্থ হয় না।*

প্রেমের স্বরূপ ও কার্য সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি সরল ও সংক্ষেপ উক্তি—

"পঞ্চম-পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন।
প্রেমা হৈতে হয় কৃষ্ণ নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥" (চৈঃ চঃ)

এইপ্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি। ইহা মহাধন—ধন থাকলে যেমন ভোগ হয়, তেমনি প্রেম থাকলে

---

* প্রেমিকের মাধুর্যাস্বাদনের প্রকার ও ভক্ত-ভগবানের সংলাপ মূল মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রেমিকের কি অভীষ্টের মিলনে কি বিরহে একটি অখণ্ড আস্বাদন-পরম্পরা চলতে থাকে। কারণ প্রেম স্বয়ং হ্লাদিনী বা আনন্দিনী শক্তির সারবৃত্তি, সুতরাং পরমস্বাদ্য। প্রেমই প্রেমিককে শ্রী-কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদির মাধুর্যরস আস্বাদন করায়, যেহেতু প্রেমই কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের কারণ, "শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাস্য প্রেমৈকস্বাদ্যত্বম্" (শ্রীজীবপাদ) একমাত্র প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদিত হয়ে থাকে। এই প্রেম থেকেই কৃষ্ণ নিজ ভক্তের অধীন হয়ে থাকেন। যেমন রূপ, রসবতী পতিব্রতারমণী সৎ-পতিকে সতত অধীন বা বশীভূত করে রাখে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র হলেও স্বেচ্ছায় প্রেমিকের বশ্যতা স্বীকার করে থাকেন। এই প্রেমবশ্যতা তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখের আস্বাদন লাভ করা যায়। প্রেমব্যতীত অন্য কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করা যায় না, কারণ প্রেমই শ্রী-কৃষ্ণসেবার শ্রেষ্ঠতম উপচার। প্রেমের দু'প্রকারে সাধকের চিত্তে আবির্ভাব হয় শ্রীভগবান্ এবং ভক্তের কৃপাজনিত প্রেম এবং সাধনোত্থ প্রেম। কৃপোত্থ প্রেম বিরল, সাধন করেই প্রায়শঃ সাধককে প্রেমলাভ করতে হয়।

## সাধনভেদে প্রেমের ভেদ।

সাধনভেদে প্রেম দু'প্রকারের হতে পারে, (১) মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত প্রেম (২) কেবল প্রেম "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবল-শ্চেতি সা দ্বিধা।" (ভঃ রঃ সিঃ) সাধনমার্গ দ্বিবিধ – বৈধী ও

রাগানুগা। বৈধীমার্গের সাধনে সাধকের চিত্তে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্য লাভ করে থাকে সুতরাং বিধিমার্গের সাধনে যে প্রেম জন্মে তা 'মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত' হয়। রাগানুগামার্গের সাধনে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বুদ্ধিতে উপাসনা করা হয়, তাতে শ্রী-ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে না এজন্য এই মার্গের সাধনে যে প্রেম জাত হয়, তা 'কেবল' প্রেম।

বিধিমার্গের সাধনে যে ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম জাত হয় তার ফলে সালোক্য, সাষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য এই চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে কোন একটি মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা॥" ( চৈঃ চঃ )

ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য রাগানুগামার্গের ভজনের ফলে কেবল প্রেম লাভ হয়। "রাগানুগাশ্রিতানাঞ্চ প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ" (ভঃ রঃ সিঃ ) অর্থাৎ রাগানুগাশ্রিত ভক্তগণের প্রায়শঃ কেবল প্রেম লাভ হয়। শ্লোকের "প্রায়শঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ লিখেছেন, "প্রায়শ ইতি বৈধ্যংশযুক্তত্বেঽপি ন কেবলঃ স্যাদি-ত্যর্থঃ।" অর্থাৎ বৈধীভক্তির অংশ যুক্ত থাকলেও কেবল প্রেম হয় না। এই 'কেবল' প্রেমেই শুদ্ধমাধুর্যময় ব্রজরসের আস্বাদন লাভ করা যায়।

## প্রেমের সুদুর্গমত্ব।

"ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি। অন্তর্বাণি-

ভিরপ্যাস্য মুদ্রা সুষ্ঠু-সুদুর্গমা ॥" ( ভঃ রঃ সিঃ ) অর্থাৎ যাঁর চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয় তিনি ধন্য। তাঁর মুদ্রা অর্থাৎ বাক্য চেষ্টাদি শাস্ত্রবেত্তাদেরও সুদুর্গম।

"যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥" ( চৈঃ চঃ )

তাৎপর্য এইযে, দেহাদির সুখ ও দুঃখজনক যে সব ব্যাপার সাধারণের মধ্যে দৃষ্ট হয় জাতপ্রেম ভক্তের মধ্যেও সে সব দৃষ্ট হতে পারে। সাধারণ মানবের সুখ-দুঃখাদি তাদের চিত্তকে স্পর্শ করে চিত্তে অনুভূত হয়, কিন্তু জাতপ্রেম ভক্তের সুখ-দুঃখাদি তাঁদের চিত্তকে স্পর্শ করে না। এ কেবলই তাঁদের বহির্ব্যাপার মাত্র। কারণ প্রেমজনিত আনন্দে তিনি অহর্নিশি বিভোর থাকেন। তাঁদের চিত্তের সুখ-দুঃখ ভগবৎপ্রাপ্তিতে ও তাঁর বিরহে। এই অপ্রাকৃত সুখ ও দুঃখের অনুভূতি সবই রসময় ও পরম মধুর। বিশ্বের সুখ-দুঃখাদি এর কোন ধারণাই দিতে পারে না। সুতরাং সেই অলৌকিক সুখ-দুঃখজনিত আনন্দ-বেদনার তরঙ্গে ভাসমান জাতপ্রেম ভক্তের যে সব চেষ্টা বাইরে প্রকাশিত হয়, তা সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, প্রেমরহস্যে অনভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণও বুঝতে সক্ষম হন না, তাঁদের নিকট ঐ সমস্ত আচরণ অর্থাৎ রোদন, হাস্য, নৃত্য, গীতাদি উন্মত্তের আচরণের ন্যায়ই লক্ষিত হয়। প্রেমরহস্য যাঁরা জানেন, তাঁরা অবশ্যই তা বুঝতে পারেন।

## সম্বন্ধভেদে প্রেমের তারতম্য।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মমতা, অন্যত্র মমতার অভাব – তাকেই প্রেম বলা হয়, একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মমতাটি সম্বন্ধনিষ্ঠ। দাস্য, সখ্যাদি একতর সম্বন্ধকে অবলম্বন করেই মমতা আত্মসত্তা লাভ করে। সুতরাং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারপ্রকার সম্বন্ধের অনুরূপ প্রেমও চতুর্বিধ—দাস্য-প্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও মধুরপ্রেম। শান্তভক্তগণের প্রেমে মমতার অভাব। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেই আনন্দিত। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম; তাঁর সেবার কোনও প্রয়োজন নেই- এই ধারণায় শান্তভক্তগণের মনে কখনই সেবাকাঙ্ক্ষা জাগে না। অথচ ভক্তির অর্থ ই 'সেবা'। মমতা ও সেবাকাঙ্ক্ষার অভাবহেতু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এঁদের ভক্তিকে তটস্থাভক্তি' এবং এঁদের 'তটস্থ ভক্ত' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

"শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)

শান্তভক্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগ এই দুটি গুণ —"কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণে।" ( চৈঃ চঃ )

দাস্যপ্রেম—দাস্যপ্রেমে শান্তের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ আছে, তদুপরি আছে সেবার আকাঙ্ক্ষা। দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণের দারুকাদি দাসগণের ঐশ্বর্যজ্ঞান বিদ্যমান।

"পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর ।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক 'সেবন' ।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ ॥" (ঐ)

ব্রজে 'কেবলা' প্রীতি, কারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি নেই। ব্রজের রক্তক, পত্রকাদি দাসগণের রাজকুমার বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম, গৌরব বুদ্ধি থাকলেও ভগবদ্বুদ্ধি নেই বলে শ্রীজীবপাদ এঁদের দাস্যকে মাধুর্যময় বলেই উল্লেখ করেছেন।

সখ্যপ্রেম – ব্রজের শ্রীদাম, সুবলাদি সখাগণের শুদ্ধ সখ্যপ্রীতি। দ্বারকাধামে উদ্ধব, অর্জুনাদির সখ্য থাকলেও তা ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত। "ঐশ্বর্য্য দেখিলে হয় সঙ্কুচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥" অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করলে তাঁর সখ্যপ্রীতি সঙ্কুচিত হয়েছিল, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে যে সব ব্যবহার করেছেন সে জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন; ইহা গীতাতে দৃষ্ট হয়। ব্রজের সখাগণ কিন্তু প্রতিনিয়ত অসুরমারণাদি শ্রীকৃষ্ণের বিপুল ঐশ্বর্য দর্শন করলেও তাঁদের শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্বুদ্ধির উদয় হয় নাই। বরং 'তাঁদের সখা এত বলশালী' - এই জ্ঞানে তাঁদের সখ্যপ্রীতি বর্ধিতই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে খেলায় হারায়ে তাঁরা নিঃসঙ্কোচে তাঁর স্কন্ধে আরোহণ করেছেন, স্বচ্ছন্দে উচ্ছিষ্ট ফল খাইয়েছেন।

'তুমি কোন্ বড় লোক—তুমি আমি সম' —এই তাঁদের ভাব। তাই—

"শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন সখ্যে দুই রয় ।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য— গৌরব-সম্ভ্রম হীন ।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান ।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥" ( ঐ )

বাৎসল্যপ্রেম—ব্রজে শ্রীনন্দ-যশোমতী প্রভৃতির শুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম। মথুরা-দ্বারকায় বসুদেব-দেবকী প্রভৃতির বাৎসল্য-প্রেম ঐশ্বর্যজ্ঞান যুক্ত। তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে তাঁর চরণে প্রণতঃ হয়ে বহু স্তবস্তুতি করেছেন এবং পরেও শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে তাঁরা সম্ভ্রমভরে তাঁরা যে তাঁদের পুত্র নন, প্রকৃতি-পুরুষেশ্বর – একথা বলেছেন। শ্রীনন্দ-যশোমতী কিন্তু শুদ্ধ বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে সন্তানের মঙ্গলকামনায় তাঁর জাতকর্ম করেছেন, বিপুল ধনরত্ন-গো-সম্পদাদি দান করেছেন। মাতা যশোমতী স্বচক্ষে তাঁর পূতনাবধাদি ঐশ্বরীক লীলা দর্শন করেও তাঁর রক্ষাবন্ধন করেছেন, নিত্যমঙ্গল কামনা করেছেন। বাল্য-লীলায় পুত্রের দধি-নবনীতাদি চৌর্য দর্শন করে তাঁর মঙ্গল

কামনায় তাড়ন-ভৎ'সন-বন্ধনাদি করেছেন। কৃষ্ণ শ্রীনন্দমহারাজের পাদুকাযুগল মস্তকে বহন করে তাঁর নিকট আগমন করলে শ্রীনন্দমহারাজ সন্তানের সেই চেষ্টা দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসমান হয়েছেন। তাই—

"বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম 'পালন'॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভৎ'সন-ব্যবহার।
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥" ( চৈঃচঃ )

মধুরপ্রেম—কান্তাভাবে নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই দাস্য-সখ্যাদি প্রেম অপেক্ষা মধুরপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। ব্রজে শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের পরকীয়ভাবময় মধুরপ্রেমেই প্রেমমাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণের ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত স্বকীয় ভাবময় মধুরপ্রেম। এঁরা ঐশ্বর্যজ্ঞানে পতি-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে থাকেন। ব্রজসুন্দরীগণ শুদ্ধমাধুর্য-জ্ঞানে উপপতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-ভাবে এবং মহিষীগণের কান্তাভাবে সর্বত্রই প্রেমে সম্বন্ধানুরূপ শ্রী-কৃষ্ণের সেবা হয়ে থাকে, কিন্তু গোপীগণের মধুরপ্রেম সম্বন্ধের

গণ্ডীবদ্ধ না থেকে সম্বন্ধকে নিজের অধীনে রেখে প্রেমানুরূপ উপপতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে থাকে। ব্রজগোপীব্যতীত অতি সুরসাল ও পরম উল্লাসময় এই মধুরভাবের অন্যত্র স্থিতি নেই। "উপপতি ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজবিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥" ( চৈঃ চঃ ) এজন্য শুদ্ধমাধুর্যময় গোপীগণের প্রেমেই সব রসের সমাহার বিদ্যমান, সুতরাং স্বাদাধিক্যে ইহা অতুলন।

"মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥
কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ ॥
আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এই মত মধুরে সব-ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥" ( চৈঃ চঃ )

## গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য।

ব্রজসুন্দরীগণ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব শক্তি বলে স্বরূপতঃ তাঁর স্বকীয়া কান্তা হলেও লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়া নিত্যইতাঁদের পরকীয়াভিমান প্রদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অন্য কোন গোপের সহিত বিবাহ হয়নি, যোগমায়া অভিমানপুষ্টির জন্য স্বাপ্নিক প্রতীতি দিয়েছেন

মাত্র। পরকীয়া নায়িকাগণের অভীষ্ট নাগরের সহিত মিলনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন। আত্মীয়-স্বজনগণের অগোচরে গোপনে নায়কের সহিত মিলন হয়ে থাকে। কখনও সুযোগ সৌভাগ্য-ক্রমে মিলন হয়, কখনও বা হয় না। এই বহুবার্যমানত্ব, প্রচ্ছন্ন-কামত্ব এবং দুর্লভত্ব জাগিয়ে মিলনরসের অসীমবৈচিত্রী সম্পাদনের জন্য যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কান্তাগণকে পরোঢ়া অভিমান প্রদান করেছেন মাত্র। অভীষ্ট প্রাপ্তির পথে বাধাবিঘ্নজনিত তীব্রব্যাকুলতা এবং দৌর্লভ্যবুদ্ধি না থাকলে বস্তুপ্রাপ্তিতেও তেমন আস্বাদন হয় না। যেমন যে ব্যক্তি দারুণ পিপাসায় আতুর, সেই সলিলপানে যথার্থ তৃপ্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যার তৃষ্ণাই নেই, তার বারি লাভেও কোন ফল নেই। সুতরাং নিবিড় আকাঙ্ক্ষাই বস্তু আস্বাদনের পরিমাপক। শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত ব্রজগোপী-গণের অদম্য নব নব আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হৃদয়-পারাবারে কল্লোলময়ী ঊর্মিমালার ন্যায় প্রতিনিয়ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! যে নদী সাগ-রের যত সন্নিকটে, তাতে তত বেশী জোয়ার ভাটা দেখা যায়। ব্রজগোপীগণ শ্যামসাগরের অতি নিকটে বলেই তাঁদের হৃদয়-তটিনীতে বিরহ-মিলনের অদ্ভুত জোয়ার ভাটা লক্ষিত হয়। তাতে বিবিধ প্রেমবৈচিত্রী ও নব নব লীলার উদ্গম হয়ে থাকে। শ্রী-কৃষ্ণ-বিরহে যেমন তাঁরা এক ক্ষণকালকে কোটি কোটি যুগের মত মনে করেন, তেমনি মিলনে এক ব্রহ্মরাত্রিও তাঁদের নিকট ক্ষণ-কালের ন্যায় মনে হয়। তাঁদের নয়ন-চকোর যখন শ্যামচাঁদের

অসীম রূপসুধা পান করে; তখন তাঁরা তাঁদের নেত্রে পলকস্রষ্টা বিধাতাকে তিরস্কার করে থাকেন।

"না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তাঁর করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্যসৃষ্টি তার ॥" ( চৈঃ চঃ )

এসকল একমাত্র মহাভাববতী গোপীগণেরই ভাবসম্পদ্। পরকীয়ভাব থেকেই এতাদৃশ প্রেমতৃষ্ণার উদ্ভব। এতাদৃশ তৃষ্ণার অনুরূপই তাঁদের সর্বাধিক কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন লাভ হয়ে থাকে।

গোপীপ্রেমের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— আত্মেন্দ্রিয়সুখবাসনা শূন্যতা। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেই কৃত-কৃতার্থা— আত্মেন্দ্রিয়-সুখভাবনা তাঁদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও নেই তাঁদের সম্ভোগেচ্ছা কেবলই শ্রীকৃষ্ণের সুখবর্ধনার্থে। তাঁরাই বলতে পারেন—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥" (চৈঃ চঃ)

"কান্ত-সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর" এ ব্রজবালারই শ্রীমুখের উক্তি। আপন সুখ-দুঃখের বিচার গোপিকার অন্তরে কখনই উদিত হয় না। কৃষ্ণসুখ-ভাবনায় তাঁরা তন্ময়। নিজে-ন্দ্রিয়-সুখবাসনাকে কৃষ্ণ-সুখের দ্বারে এমনভাবে বিসর্জন দিতে বিশ্বে আর কোন প্রেমিকই পারেন নাই।

"আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥" ( চৈঃ চঃ )

প্রশ্ন হতে পারে, রাসলীলা বর্ণনার আরম্ভে শ্রীপাদ শুক-মুনি গোপীগণের অঙ্গমার্জন ভূষণাদির কথা বলেছেন—"লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।" ( ভাঃ ১০।২৯।৭ ) সুতরাং গোপিকার যে আত্মসুখের অপেক্ষা নেই তা কিরূপে বুঝা যাবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
'এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন—তাঁর এই সম্ভোগসাধন॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।'
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ॥" ( ঐ )

যদি গোপিকার নিজ সুখানুরোধ না থাকে, তবে তাঁদের

সুখও হবে না অথচ শাস্ত্রে সুখকেই পুরুষার্থ বলা হয়েছে। তাহলে ত এত বৃহত্তম গোপীপ্রেমের অপুরুষার্থতাই প্রতিপন্ন হয়? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—

"আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁসভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ!
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে—যার নাহিক সমতা॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে॥" ঐ

এসব বিচারে গোপীপ্রেমের পূর্ণ নিষ্কামতা আবিষ্কৃত হয়। এঁদের সম্ভোগেচ্ছা অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের ন্যায় সমর্থারতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত। এঁদের প্রীতির বিকাশ সব সময়ই অবাধ ও অপ্রতিহত। এঁদের প্রীতির প্রভাবে এঁরা শ্রীকৃষ্ণের সবই অবগত হতে পারেন। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের প্রতি বলেছেন —

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥"

"হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয়, আমার মনোগতভাব গোপিকাগণই স্বরূপতঃ জানেন ; অন্য কেউ তা জানেন না।" এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কান্তাপ্রেমের সর্বতোভাবে বশীভূত হন।

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" (চৈঃ চঃ)

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥" (ভাঃ ১০।৩২।২২)

শ্রীকৃষ্ণ রাসরজনীতে গোপিকাগণের প্রতি বল্লেন, "হে গোপীগণ! দুশ্চেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করে তোমরা যে আমার ভজন করেছ, আমি চিরকালেও তোমাদের সেই নিষ্কাম ভজনের প্রত্যুপকারে সমর্থ হব না। অতএব তোমাদের সৌশীল্যেই তোমাদের সেই সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হোক্।" এই মহাভাববতী গোপিকাগণমধ্যে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীই সর্বশ্রেষ্ঠা। "সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা।"* শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্তী লিখেছেন, পরিমাণে প্রেম চতুর্বিধ—অণু, আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, মহান্ ও পরমমহান্। সাধকে অণুপরিমাণপ্রেম তদনুরূপ শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও অণু। নারদ ব্যাসাদিতে আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের বশ্যতা তদনুরূপ। ব্রজবাসিগণে মহান্ ও শ্রীরাধাতে পরমমহান্। এঁদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও তদনুরূপ। শ্রীরাধাতেই বশ্যতার পরাকাষ্ঠা।

## কান্তাপ্রেম ও তার উর্ধ্বতনস্তর।

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(উঃ নীঃ স্থায়ি—৬৩)

---

* শ্রীরাধার তত্ত্ব 'শ্রীরাধাতত্ত্ববিজ্ঞান' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

'ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, যুবক-যুবতীর মধ্যে এতাদৃশ ভাববন্ধনকে 'প্রেম' বলা হয়।' যেমন রূপে, গুণে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, বৈদগ্ধ্যাদিতে চন্দ্রাবলী থেকে শ্রীরাধা বহুগুণে শ্রেষ্ঠা। চন্দ্রাবলীও তা জানেন শ্রীকৃষ্ণ তা জানেন এবং শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে অত্যধিক অনুরাগী চন্দ্রাবলী সেও জানেন। তথাপি চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাববন্ধন, তা কখনও ম্লান হয় না।

এস্থলে শ্রীরাধার রূপগুণাদির উৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি অনুরাগাধিক্য হচ্ছে চন্দ্রাবলীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের ধ্বংসের কারণ। তথাপি সেই প্রেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এটিই প্রেমের স্বরূপগত লক্ষণ। স্বসুখবাসনার আত্যন্তিক অভাবই হচ্ছে এই ধ্বংস-রাহিত্যের হেতু। এই প্রেম ত্রিবিধ—মন্দ মধ্য ও প্রৌঢ়। "প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স যত্র স্যাদ্ বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা" ( উঃ নীঃ ) অর্থাৎ যাতে বিশ্লেষ বা বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা জন্মে তাকে 'প্রৌঢ়' প্রেম বলে। "কৃচ্ছ্রাৎ সহিষ্ণুতা যত্র স তু মধ্যম উচ্যতে" ( ঐ ) অর্থাৎ কষ্টে সৃষ্টে যাতে বিচ্ছেদ সহ্য করা যায় তাই 'মধ্যপ্রেম'। "স মন্দঃ কথিতো যত্র ভবেৎ কুত্রাপি বিস্মৃতি" যে প্রেমে কোন সময়ে অথবা কোনস্থলে বিস্মৃতি জন্মে, তাকে 'মন্দপ্রেম' বলা হয়। প্রেমরসবৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত লীলাশক্তি এরূপ প্রেম ভেদ জন্মায়ে থাকেন। যে নায়িকার

শ্রীকৃষ্ণে যাদৃশ প্রেম শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁর প্রতি তাদৃশ প্রেম বিদ্যমান থাকে বলে বুঝতে হবে।

"প্রেম ক্রমে বাঢ়ে হয় স্নেহ মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ডসার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মলক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥" ( চৈঃ চঃ )

'প্রেমের এই সকল-স্তরগুলির বিষয়ে বিচার' এই যে, সাংখ্যবাদিগণের মতে কারণ কার্যে পরিণত হলে কার্যই পাওয়া যায় কারণকে পাওয়া যায় না। যেমন ইক্ষু রসে পরিণত হলে রসই পাওয়া যায়, ইক্ষুকে পাওয়া যায় না। রস গুড়ে পরিণত হলে গুড়ই পাওয়া যায়, রস পাওয়া যায় না। তদ্রূপ প্রেম স্নেহে পরিণত হলে স্নেহই পাওয়া যাবে, প্রেম পাওয়া যাবে না। এবং স্নেহ মানে পরিণত হলে মানই পাওয়া যাবে, স্নেহ থাকবে না—তা নয়। প্রেমের অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রেমিকের চিত্তে সবগুলিরই আস্বাদ উপলব্ধ হয়ে থাকে বলে জানতে হবে।

স্নেহ—"আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনম্।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥"
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু॥" ( উঃ নীঃ )

'প্রেম পরমকাষ্ঠায় আরোহণ করে বা গাঢ়তাবশতঃ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে যখন চিদ্দীপদীপন হয় অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাকে 'স্নেহ' বলে। এই স্নেহ উদিত হলে দর্শনাদিতে কখনও তৃপ্তি হয় না।

প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমবিষয়ের উপলব্ধি বলতে শ্রীকৃষ্ণেরই উপলব্ধি বুঝায় স্নেহ সেই উপলব্ধিকে প্রকাশিত বা উদ্দীপ্ত করে থাকে। প্রেমেও শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি হয়, স্নেহেতে সেই উপলব্ধির আরও ঔজ্জ্বল্য ও আধিক্য। চিত্তের দ্রবতাও প্রেম অপেক্ষা স্নেহে অধিক। শ্রীজীবপাদ তাঁর লোচনরোচনী টীকায় লিখেছেন—"আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠামিতি ক্ষয়রাহিত্যং দর্শিতম্" অর্থাৎ 'পরমকাষ্ঠা আরোহণ করে' এই বাক্যে স্নেহের ক্ষয়রাহিত্য দর্শিত হয়েছে। প্রেমের লক্ষণে বলা হয়েছে ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হলেও প্রেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, স্নেহে এই লক্ষণেরও উৎকর্ষ জানতে হবে। আবার স্নেহ উদিত হলে দর্শনাদিতে তৃপ্তি হয় না অর্থাৎ যাঁর চিত্তে স্নেহের আবির্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেও তাঁর দর্শন-পিপাসা মিটে না বরং উত্তরোত্তর বর্ধিতই হতে থাকে। তখন "জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল" ( বিদ্যাপতি ) এই অবস্থা।*

---

* প্রেম ও তার উর্ধ্বতন সব স্তরগুলিই শ্রীরাধারাণীতে

মান—"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥" (উঃনীঃ)

স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি হেতু যখন অভিনব মাধুর্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং কৌটিল্য ধারণ করে, তখন তাকে 'মান' বলা হয়। স্নেহ গাঢ়তা প্রাপ্ত হলে পূর্বানুভূত মাধুর্য অপেক্ষাও কোন অভিনব মাধুর্যের অনুভব হয়। তথাপি কিন্তু বাইরে উহা অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য ধারণ করে। তটিনী অদম্যবেগে প্রবাহিত হয় এই প্রবাহের সম্মুখে যদি প্রবল বাধা উপস্থিত হয়, তখন জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠে এবং সোজা পথে চলতে না পেরে শত শত কুটিল গতিতে চলতে থাকে। তদ্রূপ স্বভাবকুটিলগতি ব্রজগোপীগণের প্রেমও মানের বাধা পেলে কুটিলতর হয়ে উঠে এবং শত শত উৎসে প্রেমের বেগ অতিশয় বর্ধিত হয়। এজন্যই বলা হয়েছে -

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষ-বীক্ষ্যাদি-নিরোধী মান উচ্যতে॥" (উঃনীঃ)

নায়ক-নায়িকার একত্রই অবস্থান হচ্ছে, একের প্রতি অন্যের অনুরক্তিও আছে; পরস্পর পরস্পরকে দেখতে এবং

---

জাতি ও পরিমাণে পরাকাষ্ঠাদশা প্রাপ্ত। বিশেষ জিজ্ঞাস্য থাকলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাব প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

আলিঙ্গনাদি করতেও একান্ত ইচ্ছুক ; অথচ যে ভাববিশেষ এই অভীষ্টসিদ্ধির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় তারই নাম 'মান'। এই বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার ক্লেশকর বলে অনুমিত হলেও কিন্তু এর ফলে প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও নব-নবায়মান হয়ে উঠে। প্রেমের প্রবাহকে সরস সবেগ এবং অভিনব রাখার জন্যই মানের উদ্ভব হয়। মান নিয়ত আস্বাদ্যবস্তুকে অভিনব মাধুর্যে সুমধুর ও প্রলোভনীয় করে তুলে। প্রেমের রাজ্যে মান সত্যই এক অপূর্ব সঞ্জীবনীসুধা—এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! এর উদয়ে প্রেম পলকে পলকে অভিনব হয়ে থাকে। মকরন্দ-পরিমল-লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় নায়ক মানময়ীর মুখকমল-মধু-পানের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হয়ে পড়েন। হৃদয়ের নৈরাশ্য-তিমির নাশের জন্য নায়িকার দন্তরুচি-কৌমুদীর প্রার্থনায় আকুলিত হন। শেষে "দেহিপদপল্লবমুদারম্" বলে মানিনীর চরণতলে মস্তকলুণ্ঠিত করে ধন্য হন। বস্তুতঃ ভিতরে প্রচুর আনন্দ সত্ত্বেও যে বাইরে অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য—বাম্য, বক্রাদি ব্যবহার, এটিই মানের প্রকৃতস্বরূপ। তাই বলা হয়েছে—"ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান।" ( চৈঃ চঃ )

প্রণয়—"মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ" অর্থাৎ মান যখন ( গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে ) বিশ্রম্ভ ধারণ করে, তখন তাকে 'প্রণয়' বলা হয়। 'বিশ্রম্ভ' শব্দটি পারিভাষিক, এই শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"বিশ্রম্ভঃ প্রিয়-জনেন সহ স্বস্যাভেদমননম্" অর্থাৎ প্রিয়জনের সঙ্গে নিজের অভেদ

মননই বিশ্রম্ভ। এই অভেদ মনন কিন্তু জীব ব্রহ্মের অভেদ মননের ন্যায় কখনই নয়, কারণ প্রণয় হচ্ছে প্রেমের একটি উচ্চতন স্তর। সুতরাং প্রেমের কার্য যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধান তা প্রণয়ে অধিকতররূপে পরিস্ফুট থাকাই স্বাভাবিক। প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পরে অভেদ মনন থাকলে সেবাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলে এই অভেদ মননের তাৎপর্য কি? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় তা পরিস্ফুট হয়েছে —"বিশ্রম্ভো বিশ্বাসঃ সম্ভ্রমরাহিত্যং তচ্চ স্বপ্রাণমনোদেহবুদ্ধিপরিচ্ছেদাদিভিঃ কান্তপ্রাণমনোবুদ্ধ্যাদেরৈক্যভাবনজন্যং তত্র সত্যপি রোষাদিকন্তু রসস্বাভাব্যাদেব নানুপপন্নং জ্ঞেয়ম্।" অর্থাৎ বিশ্রম্ভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা সম্ভ্রমরাহিত্য। স্বীয় প্রাণ, মন বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছেদাদির সঙ্গে কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি দেহাদির ঐক্য ভাবনা থেকেই এই সম্ভ্রমরাহিত্য জন্মে। প্রাণ-মন-আদির ঐক্য ভাবনা সত্ত্বেও যে সময় সময় রোষাদি দৃষ্ট হয়, রসের স্বভাববশতঃই তা সম্ভবপর হয়ে থাকে বলে জানতে হবে। নিজের দেহে নিজের পদস্পর্শ হলে যেমন কোন সঙ্কোচ জন্মে না, নিজবস্ত্রাদিদ্বারা নিজের মুখাদি মার্জনে যেমন কোন সঙ্কোচ হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রণয়িনীর পাদস্পর্শ হলে তাঁর কোন সঙ্কোচ হয় না এবং তাঁর পীত-উত্তরীয়ে স্বীয় মুখমার্জনে কোন সঙ্কোচ জন্মে না। মোট কথা সঙ্কোচের অভাবই হচ্ছে প্রণয়ের প্রাণ। এই প্রণয়ের চরম পরিণতিতেই 'না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন

মনোভব পেষল জানি ॥" এই প্রেমবিবর্তদশার উদয় হয়ে থাকে।

মান বিশ্রম্ভকে ধারণ করে প্রণয়ে পরিণত হয় একথা বলা হয়েছে, কিন্তু সর্বদার জন্য এই নিয়ম নয়; কখনও বা প্রণয়ই মানে পরিণত হয়ে থাকে; সুতরাং প্রণয় ও মান উভয়ের জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ দেখা যায়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বলেন—

"জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিন্মানতাং ব্রজেৎ।
স্নেহান্মানঃ ক্বচিদ্ ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে ॥
কার্য্যকারণতাপ্যোহন্যমতঃ প্রণয়-মানয়োঃ।
ইত্যত্র পৃথগেবাসৌ বিশ্রম্ভোদাহৃতিঃ কৃতা ॥" (উঃনীঃ)

অর্থাৎ কোন স্থলে স্নেহের থেকে প্রণয় উৎপন্ন হয়ে মানত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার কোনও স্থলে স্নেহ হতে মান উৎপন্ন হয়ে প্রণয়-রূপে পরিণত হয়, সুতরাং প্রণয় ও মান এতদুভয়ের পরস্পর কার্য-কারণতা দেখা যায়। এজন্য এই স্থায়িভাব প্রকরণে পৃথক্‌রূপে বিশ্রম্ভের উদাহরণ করা হল। উল্লিখিত শ্লোকের লোচনরোচনী টীকাতে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন তার তাৎপর্য হল— কৌটিল্যই হচ্ছে মানের বিশেষ লক্ষণ; প্রণয়ের আবির্ভাবেই কুটি-লতা সম্ভবপর হতে পারে, সুতরাং প্রণয়ের পরেই মানের আবির্ভাব সমীচীন। কিন্তু প্রেমের গতি সর্পিল, সুতরাং নায়িকা বিশেষের প্রেমও স্বভাবতঃই কুটিলতাময়- তাই হেতু থাকলে মান জন্মে না থাকলেও মান জন্মে। অতএব মান বিশ্রম্ভকে প্রাপ্ত হলে য

প্রণয়ের উদ্ভব হয়, এটি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের নিজস্ব অভিমত।

রাগ—"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"
( উঃ নীঃ )

অর্থাৎ প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ যখন অতিশয় দুঃখকেও চিত্তে সুখ বলে অনুভূত হয় তখন তাকে 'রাগ' বলা হয়। শ্রীমৎ জীবপাদ বলেন, যে দুঃখ বরণ করলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সেই দুঃখও যেখানে সুখ বলে মনে হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলে যেস্থলে সুখকেও দুঃখ বলে মনে হয়, সেই স্থলেই রাগের উদয় হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ এদের প্রত্যেকেরই একাধিক বৈচিত্রী আছে। যেমন, স্নেহ দুপ্রকার—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। মানও দ্বিবিধ—উদাত্তমান ও ললিতমান। প্রণয় দু'রকমের—মৈত্রপ্রণয় ও সখ্যপ্রণয়; অবস্থাভেদে আরও দুটি ভেদ আছে যথা—সুমৈত্র ও সুসখ্য। রাগও দ্বিবিধ—নীলিমারাগ ও রক্তিমা রাগ। নীলিমারাগ আবার দু'রকমের—নীলিরাগ ও শ্যামা-রাগ। রক্তিমারাগও দ্বিবিধ—কুসুম্ভরাগ ও মঞ্জিষ্ঠারাগ। এই সব বৈচিত্রীগুলির দৃষ্টান্তের সহিত বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণিগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে দ্রষ্টব্য। এই বৈচিত্রীগুলির সংক্ষিপ্তসার কথা এইযে, পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পরপর গুলিতেই বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ব পূর্ব গুলি তদীয়াভিমানবতী চন্দ্রাবলী ও তাঁর গণে এবং পর পর গুলি মদীয়তাভিমানময়ী শ্রীরাধারাণী ও তাঁর গণে প্রকাশিত

হয়ে থাকে। শ্রীরাধারানীর সহিত রাসাদি বিবিধ লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁরই কায়ব্যূহস্থানীয়া অন্যান্য গোপীগণের নিত্য প্রকাশ। এজন্য শ্রীরাধারাণী এবং তাঁর গণেই ঐ সবস্তরগুলির অশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে জানতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে উল্লিখিত ভাবভেদসমূহ যথাযথভাবে অনাদিকাল থেকেই নিত্য বিরাজিত। আর যাঁরা সাধনসিদ্ধ, সাধনে সিদ্ধিলাভের পরেই তাঁরা যথাযথভাবে সে সমস্ত লাভ করেন। যথাবস্থিত সাধকদেহ ভঙ্গের পরে সাধক যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাস্থলে আহীরী গোপের ঘরে অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহে জন্মগ্রহণ করেন, তখন স্বীয় ভাবানুকূল নিত্যপার্ষদগণের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ হয়, তাঁদের ভাব-বৈচিত্রীই তাঁর চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে থাকে বলে বুঝতে হবে।

অনুরাগ —"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"
(উঃ নীঃ)

'যে রাগ নিজে নব নব বৈচিত্রী ধারণ করে সর্বদা অনুভূত প্রিয়কে নূতন নূতন ভাবে অনুভব করায়, তাকে 'অনুরাগ' বলা হয়।'

রাগের গাঢ় অবস্থাই অনুরাগ। গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে রাগ অনুরাগে পরিণত হলে তা নিজেও নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে এবং প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্যাদি যা পূর্বে সর্বদাই

আস্বাদিত বা অনুভূত হয়েছে সে সমস্তকে নূতন নূতন ভাবে আস্বাদন করায়ে থাকে। যেন পূর্বে কখনও তা আস্বাদন করা হয়নি, এভাব জন্মায়ে থাকে। যার ফলে ভক্তের মাধুর্যাস্বাদনের বিপুল লালসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদনের বলবতী তৃষ্ণাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। তখন "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।" ( চৈঃ চঃ ) ভক্তের এই অবস্থার উদয় হয়। বস্তুতঃ অনুরাগ নিত্যানুভূত বস্তুতে ক্ষণে ক্ষণে নব নব বৈচিত্রীর জনক। এই অনুরাগের ক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি বলেন—

"পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ।
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ॥"

"পরস্পরের বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণিমধ্যেও জন্মলাভের জন্য অতিশয় লালসা এবং বিরহে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি—এসব অনুরাগের ক্রিয়া।" উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলেন, প্রেমাদিতেও পরস্পরের বশীভাব আছে, কিন্তু অনুরাগের বশীভাব বিলক্ষণ : তা প্রতিমুহূর্তে নব-নবায়মান হয়ে থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—প্রেমাদিতে নায়কের বশীভাব স্পষ্ট হলেও লজ্জা, অবহিত্থাদি বশতঃ নায়িকার অবশীভাবই প্রকাশ পায়। অনুরাগে কিন্তু তৃষ্ণাধিক্য-হেতু অবহিত্থাদির অবকাশ না থাকায় নায়িকার বশীভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রেমাদি থেকে অনুরাগের বশীভাবের এই বৈলক্ষণ্য।

প্রেমবৈচিত্ত্য বিষয়ে উজ্জ্বলনীলমণিতে দৃষ্ট হয়—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥"

'প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ের নিকটে অবস্থিত থেকেও প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ-বুদ্ধিতে যে আর্তি, তার নাম 'প্রেম-বৈচিত্ত্য।' অনুরাগের তৃষ্ণাধিক্য বশতঃ নায়কের ক্রোড়ে থেকেও নায়িকার বিরহ-বেদনার অনুভব হয়। প্রেমরাজ্যে এ এক অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপার।

"রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনি বিরহ হুতাশ।
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কত পউরব হাম ॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরি কত পরবোধই তাই ॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দ দাস হেরি ভেল ভোর ॥" (পদকল্পতরু)

অপ্রাণীতে জন্মলালসা—অনুরাগের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত লালসা এতই তীব্রতর হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে প্রাণহীন বস্তুরূপেও জন্মগ্রহণের জন্য তীব্র বাসনা হয়। যেমন শ্রীরাধারাণীর বংশী হয়ে জন্মগ্রহণ করার নিমিত্ত তপস্যার ইচ্ছা হয়। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"গোপীগণ কহ সভে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ-মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ?
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এ বেণু অযোগ্য অতি, তাতে স্থাবর পুরুষ-জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥

× × × × × × × × ×

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥"

বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তি অনুরাগের উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরহেও শ্রীকৃষ্ণের বিস্ফূর্তি বা সাক্ষাৎকার ভ্রান্তি হয়ে থাকে। অনুরাগিণী প্রথমতঃ তাকে ভ্রান্তি মনে করেন না, সাক্ষাৎ দর্শন বলে মনে করেই তাঁকে আলিঙ্গনাদি করার জন্য ছুটে যান। যখন কিছুই পান না, তখন মনে হয় ইহা স্ফূর্তি। এই সব অনুরাগের ক্রিয়া।

**মহাভাব**—"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥"
(উঃ নীঃ)

পূর্ব বর্ণিত অনুরাগ স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে যদি প্রকাশিত

হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয় তাহলে তাকে 'মহাভাব' বলা হয়। এর থেকে বুঝা যায় যে, অনুরাগের উৎকর্ষের একটি বিশেষ অবস্থার নামই 'মহাভাব'। এই বিশেষ দশায় অনুরাগ স্বসংবেদ্য-দশা প্রাপ্ত হয়, প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের টীকা অবলম্বনে আমরা এগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করব :

স্বসংবেদ্যদশা—'স্ব' অর্থ নিজ, 'সংবেদ্য' শব্দের অর্থ সম্যক্‌ রূপে অনুভবের বা জানার যোগ্য। সুতরাং 'স্বসংবেদ্যদশা' শব্দের অর্থ—অনুরাগের যে দশাটি তার নিজের সম্যক্‌রূপে অনুভবের যোগ্য। শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—"স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য ইত্যুক্তে অনুরাগদশায়াঃ ভাবত্ব-করণত্ব-কর্ম্মকত্বানাং প্রাপ্তৌ সত্যামনু-রাগোৎকর্ষোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ ইতি প্রথমং সুখম্‌। ততশ্চ প্রেমাদিভিরনুভূতচরোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রত্যনুরাগোৎকর্ষেণানুভূয়ত ইতি দ্বিতীয়ং সুখম্‌। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণানুভবতোঽয়মনুরাগোৎকর্ষো-ঽনুভূয়ত ইতি তৃতীয়ং সুখম্‌। ইতি সুখত্রয়ং প্রাপয্যেত্যর্থ আয়াতি। ( আনন্দচন্দ্রিকা টীকা )

এই টীকার তাৎপর্য—অনুরাগের তিনটি স্বরূপ—ভাব, করণ ও কর্ম। ভাবস্বরূপে—এই অনুরাগোৎকর্ষ হচ্ছে আন-ন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। অর্থাৎ অনুরাগের উৎকর্ষদশায় শ্রী-কৃষ্ণমাধুর্যাদির আস্বাদনাধিক্যে অনুরাগী এতই তন্ময় হন যে, তাঁর আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্মৃতি থাকে না ; কেবল থাকে

'আস্বাদন' বা অনুভবের জ্ঞান। এটিই অনুরাগোৎকর্ষের ভাব-স্বরূপ।

'করণ' অর্থ উপায়, যার দ্বারা কোন কাজ করা যায়, তাই তার করণ। সম্বিদংশে অনুরাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদন করা যায়, সুতরাং অনুরাগই হল তার করণ। অনুরাগের উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যও সর্বোৎকর্ষে আস্বাদিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণমাধুরী সর্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হল করণ।

তারপর 'কর্ম', যাকে আস্বাদন করা যায়, তাই আস্বাদনের নাম কর্ম। অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করা যায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণমাবুর্যাস্বাদনটিই হল কর্ম। যে অবস্থায় ভাব, করণ ও কর্ম স্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং তাদের অনুভবে পূর্ণতম আনন্দ জন্মে, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সংবেদ্যদশা বলা হয়।

প্রকাশিত—উদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবদ্বারা বাইরে অভিব্যক্ত। অনুরাগের চরমোৎকর্ষদশায় যদি অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাবের পাঁচ, ছয়টি অথবা সবগুলিই যুগপৎ উদিত হয়ে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহলে অনুরাগকে 'প্রকাশিত' বলা হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—"প্রকাশিতঃ যথাবসরমুদ্দীপ্তাদিসাত্ত্বিকৈঃ প্রকাশমানঃ।" (লোচনরোচনী টীকা)।

যাবদাশ্রয়বৃত্তি—অনুরাগ বর্ধিত হয়ে যখন তার আশ্রয়

যে রাগ, সেই রাগ-বিকাশের চরমসীমা পর্যন্ত পৌঁছায়, তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণসুখসাধনের জন্য অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলে মনে হলে তাকে রাগ বলা হয়। তা হলে দুঃখের পরমকাষ্ঠাকেও যখন সুখের পরমকাষ্ঠা বলে মনে হবে তখন সেই অবস্থাকে বলা হবে রাগের চরম ইয়ত্তা। অনুরাগ এই অবস্থা প্রাপ্ত হলেই তাকে যাবদাশ্রয়বৃত্তি বলা যাবে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন—"দুঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরমমর্য্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব নাগ্ন্যাদির্নচ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে চেৎ তর্হি এব রাগস্য পরমেয়ত্তা ইতি ( লোচনরোচনী টীকা )।

কুলবধূগণের পক্ষে আর্যপথ ত্যাগের তুল্য দুঃখজনক বিষয় আর কিছুই নেই। কুলধর্ম রক্ষার জন্য তাঁরা অগ্নিতে প্রবেশ করে অথবা বিষপানাদি করে অনায়াসে প্রাণত্যাগের দুঃখকে বরণ করতে পারেন। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য সেই স্বজন-আর্যপথাদ্দি অম্লানবদনে ত্যাগ করেছেন। তাঁরা কুলধর্ম ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত দুঃখকেও পরম সুখরূপে অনুভব করেছেন। সুতরাং তাঁদের এই অবস্থাটিই তাঁদের অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্বের সূচনা করছে।

এরূপে অনুরাগ যখন স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে তখন তাকে বলে 'মহাভাব'।

একমাত্র ব্রজদেবীগণই এই মহাভাবের আশ্রয়, অন্যের কথা কি শ্রীরুক্মিণী, সত্যভামাদি মহিষীগণের পক্ষেও এই মহাভাব অতি দুর্লভ।

"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥" (উঃনীঃ)

এই মহাভাব মুকুন্দমহিষীগণের পক্ষেও অতি দুর্লভ। কেবল ব্রজদেবীগণের মধ্যেই ইহা সম্ভব।

## মহাভাবের বিচিত্রতাময় প্রকাশ।

মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে মহাভাব এই দুরকমের। "স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ" (উঃ নীঃ) "তস্যোদয়ক্রমেণোৎকর্ষং দর্শয়তি স রূঢ়শ্চেতি" (শ্রীজীবপাদ) অর্থাৎ 'মহাভাবের উদয়ের বা অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে উৎকর্ষের কথা বলা হয়েছে।'

রূঢ়মহাভাব—মহাভাবের প্রথমাবস্থাকে রূঢ় মহাভাব বলা হয়। "উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে' (উঃ নীঃ) মহাভাবের যে অবস্থায় অশ্রু, কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাকে রূঢ় মহাভাব বলা হয়।

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতা॥" (ঐ)

অর্থাৎ অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিকভাবের পাঁচটি, ছয়টি বা সমস্ত সাত্ত্বিকভাব একই সময়ে উদিত হয়ে যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত

হয় তবে তাদের 'উদ্দীপ্তসাত্ত্বিক' বলা হয়। মহাভাববতী গোপিকাগণের মধ্যে রূঢ়ভাব উদিত হলে তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—

"নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্‌বিলোড়নম্।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া॥
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি-সর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ॥"(ঐ)

"নিমেষের অসহিষ্ণুতা, আসন্ন-জন-সমূহের হৃদয়-বিলোড়ন, কম্পক্ষণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সুখেও আর্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব, মোহাদির অভাবেও আত্মাদি সর্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পতাদি—যোগ ও বিয়োগে এই রূঢ়মহাভাবে এসব লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেয়ে থাকে।"

রূঢ়ভাব উদিত হলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন সময়ে মহাভাববতীগণের চক্ষুর নিমেষও সহ্য হয় না গোপসুন্দরীগন চক্ষুর পলক নির্মাতা বিধাতাকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের নয়নে যদি বিধাতা পলক নির্মাণ না করতেন, তবে নির্নিমেষনয়নে অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের কৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর হত। যদিও তাঁদের দেহ বিধাতার সৃষ্ট বস্তু নয়, তবু তাঁরা নিজেকে ব্রহ্মার সৃষ্ট মানবী বা গোপস্ত্রী বলেই অভিমান করেন, এভাবেই নরবৎলীলার আস্বাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সাধারণ গোপী অভিমানে ব্রহ্মাকে অভিশাপ প্রদানই তাঁদের নিষ্পলক-নয়নে কৃষ্ণদর্শনের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা অনুমিত হয়।

যেস্থলে রূঢ়ভাবের বিকাশ হয় সেস্থানে নিকটে অবস্থিত লোকসমূহের চিত্তও সেই রূঢ়ভাবের প্রভাবে আলোড়িত হয়ে থাকে। সূর্যোপরাগকালে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সময়ে ব্রজ-সুন্দরীগণের হৃদয়স্থ রূঢ় মহাভাব (সেস্থলে-সমাগত) সকলের চিত্তেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল বা সবার চিত্তকেই আলো-ড়িত করেছিল। সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাজি যেমন নিকটবর্তী বস্তুসমূহকে আন্দোলিত করে তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনকালে পরমানন্দের আবেশে গোপী-গণের কল্পপরিমিতকালকেও ক্ষণকালের তুল্য মনে হয়। রাস-লীলায় ব্রজসুন্দরীগণের নিকট ব্রহ্মারাত্রির ন্যায় অতি দীর্ঘরাত্রিও নিমিষপরিমিত কাল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়েছিল। শ্রী-কৃষ্ণের সহিত বিহারাদির জন্য অতি বলবতী উৎকণ্ঠানিমিত্ত বিহারাদিতে রূঢ়ভাববতীগণের যে তন্ময়তা জন্মে, তার ফলেই এই কল্পক্ষণতা সম্ভবপর হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সুখেও আর্তিশঙ্কায় এঁরা খেদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। "অনিষ্টাশঙ্কিনী বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি" প্রাচীনগণ বলেন 'বন্ধুহৃদয়ে প্রিয়জনের দুঃখদর্শনে অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে থাকে।' কিন্তু বন্ধুজনের সুখদর্শনে কেউই দুঃখের আশঙ্কা করেন না। রূঢ়ভাববতী ব্রজ-সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের মহাসুখেও তাঁর দুঃখের আশঙ্কায় খেদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। গোপীগণের কুচমণ্ডলে স্বীয় চরণস্থাপন করলে শ্রী-কৃষ্ণের মহাসুখ হয়, কিন্তু গোপীগণ তাঁদের কুচের কর্কশতার কথা

চিন্তা করে তাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্থাপনে তাঁর কষ্ট হবে মনে করে ভীতা হয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করে থাকেন। শ্রীরাসলীলায় গোপীগীতার শেষ শ্লোকে গোপীগণের উক্তিতেই ইহা দৃষ্ট হয়।

মোহাদির অভাবেও রূঢ়ভাববতী গোপীগণের সব বিস্মৃতি ঘটে থাকে। মোহাদি প্রাপ্ত হলে লোকে অহন্তাস্পদ মমতাস্পদ বস্তুর কথা বিস্মৃত হয়, কিন্তু রূঢ়ভাবের এ এক অপূর্ব লক্ষণ যে, মোহাদির অভাবেও ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণাদিতে অতিশয় তন্ময়তাবশতঃ অন্য সব বিষয়ই বিস্মৃত হয়ে যান।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যল্প পরিমিত সময়কেও তাঁরা কল্পপরিমিত মনে করে থাকেন, এটিই ক্ষণকল্পতা। সংযোগকালে কল্পক্ষণতা এবং বিয়োগে ক্ষণকল্পতা রূঢ়ভাবের লক্ষণ।

অধিরূঢ়মহাভাব --

"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥" (উঃনীঃ)

যাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল থেকে সাত্ত্বিকসমূহ আরও কোন অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, তাকে অধিরূঢ়ভাব বলে।' পূর্বে বলা হয়েছে রূঢ়ভাবে সাত্ত্বিকভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়, অর্থাৎ অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাবের পাঁচ, ছয়টি বা সবগুলি একই সময়ে উদিত হয়। অধিরূঢ়মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল তা অপেক্ষাও কোন অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, কিন্তু সূদ্দীপ্ত হয়

না। "অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্ব্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ, ন তু সূদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমানত্বাৎ।" (আনন্দচন্দ্রিকা) একমাত্র মোহনাখ্যভাবেই সূদ্দীপ্তসাত্ত্বিক সম্ভবপর। অধিরূঢ়মহাভাবের দ্বিবিধ ভেদ—মোদন ও মাদন। "মোদনো মাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো দ্বিধোচ্যতে।" (উঃ নীঃ) শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন, নিরুক্তিবলে জানা যায়, সম্ভোগেই বা মিলনেই মোদন ও মাদনের উদয় হয়। 'মুদ্' ধাতু থেকে 'মোদন' শব্দ নিষ্পন্ন। মুদ্-ধাতুর অর্থ হর্ষ—এরদ্বারা মিলনজনিত আনন্দই সূচিত হচ্ছে। আর 'মদ্' ধাতু থেকে 'মাদন' শব্দ নিষ্পন্ন। 'মদ্'-ধাতুর অর্থ মত্ততা। সুতরাং মাদন-শব্দে দিব্যমধু-বিশেষবৎ মত্ততা জনকত্ব বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনজনিত আনন্দোন্মত্ততা বুঝায়।

"মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্" (উঃ নীঃ) অধিরূঢ়ভাবে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের মধ্যে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবসকল সৌষ্ঠব ধারণ করে তখন তাকে 'মোদন' বলা হয়। রূঢ়ভাবেও সাত্ত্বিকসকল উদ্দীপ্ত হয়, অধিরূঢ়ে তা এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অধিরূঢ়ভাবের উদয়ে যদি শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা উভয়ের মধ্যেই সেই বৈশিষ্ট্য সৌষ্ঠব ধারণ করে, তখন তা 'মোদন' নামে অভিহিত হয়। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ।
যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবরঃ॥" (ঐ)

শ্রীমান্ অর্থাৎ পরম সমৃদ্ধিমান্ মোদন একমাত্র শ্রীরাধার যূথেই সম্ভব হয়, সর্বত্র সম্ভব হয় না। এই মোদন হ্লাদিনীশক্তির সুবিলাস অর্থাৎ পরমবৃত্তিরূপ এবং এই সুবিলাস 'প্রিয়' বা মধুরাখ্য এবং 'বর' অর্থাৎ বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ। মোদন কেবল শ্রীরাধারাণী এবং তাঁর সখীগণের মধ্যেই বিদ্যমান। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অন্য কোন যূথে মোদনভাব সম্ভবপর নয়। এরদ্বারা সমস্ত কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধা এবং তাঁর সখীবর্গের পরমোৎকর্ষ সূচিত হল।

মোহন—"মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥"
(উঃ নীঃ)

'এই মোদনই বিরহদশায় 'মোহন' নামে অভিহিত হয়। মোহনে বিরহজনিত বৈবশ্যবশতঃ সাত্ত্বিকভাবসকল 'সূদ্দীপ্ত' হয়। এরদ্বারা জানা যায় মোহনেই সাত্ত্বিকভাবসব সূদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবগুলির প্রত্যেকটি যদি সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রতিটির বিকাশ যদি চরম পরাকাষ্ঠাদশা প্রাপ্ত হয়, তবেই তাকে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলা হয়। "প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি" (ঐ) প্রায় একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীতেই এই মোহনভাবের উদয় হয়ে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীরাধারাণীর মোহনাখ্য ভাবের আস্বাদনকালে তাঁর শ্রীঅঙ্গে যেরূপ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের উদয় হয়েছিল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় তা জানা যায়—

"মাংসব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্‌গম।
'জজ গগ' 'জজ গগ' গদ্‌গদ বচন॥
জলযন্ত্রধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম॥
কভু স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥"

মোহনের অনুভাব—

"অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম্।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাৎ॥
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ॥"

(উঃ নীঃ)

'এই মোহনভাবের উদয়ে কান্তাকর্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেও শ্রীকৃষ্ণসুখের কামনা, ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা, তির্যগ্ জাতিরও রোদন, মৃত্যু স্বীকার করেও স্বীয় দেহস্থ ভূতসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের তৃষ্ণা এবং দিব্যোন্মাদাদি অনুভাবের কথা বিদ্বান্‌গণ কীর্তন করে থাকেন।'

মোহনভাবের একটি অনুভাব এইযে, ব্রজস্থিতা শ্রীরাধার মধ্যে মোহনভাবের উদয় হলে দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণ্যাদি কান্তাকর্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থায় থাকলেও তাঁর মূর্চ্ছার উদয় হয়ে থাকে। "ব্রজস্থায়াং শ্রীরাধায়াং যদা মোহনভাব উদেতি, তদা দ্বারকাস্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কান্তাশ্লিষ্টস্যাপি মূর্চ্ছা স্যাৎ।" (আনন্দ-চন্দ্রিকা) এতে বিষয়তত্ত্বের উপরে মোহনভাবের প্রভাব প্রদর্শিত হল।

মোহনভাবে অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেও শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য কামনা জাগে। ব্রজের থেকে মথুরায় প্রস্থানকালে শ্রীউদ্ধব শ্রী-রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণের নিকট তোমার কি সন্দেশ উপহার দিব?' তখন শ্রীরাধারাণী বলে-ছিলেন—'হে উদ্ধব! মুকুন্দ যদি এই গোষ্ঠে আগমন করেন তাহলে আমাদের অত্যন্ত সুখ হয় বটে, কিন্তু তাতে যদি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনও না আসেন।' এতে আশ্রয়তত্ত্বের উপর মোহনভাবের প্রভাব বর্ণিত হল।

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব মোহনভাবের একটি অনুভাব। এতে জড়জগৎ ও চিজ্জগতের উপর মোহনভাবের প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীউজ্জ্বলে বর্ণিত আছে, মোহনভাববতী শ্রীরাধার প্রেমনিশ্বাসরূপ ধূম ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করলে নরকুল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিল, ফণীকুল ব্যাকুল হয়েছিল, দেবগণের দেহ ঘর্মাক্ত হয়েছিল, বৈকুণ্ঠস্থিত কমলাদেবীও প্রচুর অশ্রুমোচন করেছিলেন। এভাবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ( জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ ) পূর্ণানন্দে অবস্থান করেও অতিশয় আর্ত হয়েছিল।

তীর্যক্‌জাতির রোদন বিষয়ে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেছেন এ কথা শ্রবণে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের দ্বারা স্বীয় গাত্র আচ্ছাদন করে কালিন্দীতটবর্তি কুঞ্জের একটি মনোহর লতা অবলম্বনপূর্বক এমন রোদন করেছিলেন যে কালিন্দী-মধ্যস্থ মৎস্যাদি জলজন্তুগণও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেছিল।

মৃত্যু স্বীকার করেও স্বীয় দেহস্থ ভূতসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা বিষয়ে মহাজনপদে বর্ণিত আছে —

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলব যব গোকুলচন্দ॥

যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ-জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাঁহি হোই মৃদুবাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো রসময় তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥"

মোহনভাবের চরম অনুভাব হচ্ছে দিব্যোন্মাদ। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি বলেন—

"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥"

'এই মোহনাখ্য ভাবের এক অনির্বচনীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত ভ্রমাভা কোনও বৈচিত্রীকে 'দিব্যোন্মাদ' বলা হয়।' দিব্যোন্মাদ ভাব-রাজ্যের যথার্থই এক অদ্ভুতব্যাপার। ভ্রমের ন্যায় আভা আছে যাতে, অর্থাৎ যা প্রকৃত ভ্রম নয় ভ্রমের ন্যায় অনুমিত হয় তাই ভ্রমাভা বৈচিত্রী। ভাবের আতিশয্যে ভ্রমের আবির্ভাব! যার ফলে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধার মেঘ দর্শনে, তমাল দর্শনে কৃষ্ণভ্রম! আরও নানাবিধ ভ্রমাভা বৈচিত্র প্রকাশিত হয়ে বিরহ বিবশা শ্রীমতীর ভ্রমময়চেষ্টা প্রলাপময় বাক্য বৈষ্ণবসাহিত্যের এক অতুলনীয় ভাব-সম্পদ্। ভজনরাজ্যের এক উচ্চতম আস্বাদ্যতত্ত্ব।

দিব্যোন্মাদের তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। এই উন্মাদ দিব্য বা অপ্রাকৃত। প্রাকৃত উন্মাদ ভ্রমময় কিন্তু দিব্যোন্মাদ ভ্রমাভ হয়েও পরম সত্য। কারণ এতে সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই চিত্তের বিষয়ীভূত হয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রেমোন্মাদের বর্ণনা পাওয়া যায়—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪০)

এতে জানা যায় যাঁর অনুরাগ উপজাত হয়েছে তিনি উন্মত্তের ন্যায় কখনও উচ্চস্বরে হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা চিৎকার করেন, কখনও গান করেন, কখনও নৃত্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবত জাতানুরাগ প্রেমিককে 'উন্মাদ' না বলে 'উন্মাদবৎ' বলেছেন। কারণ জাতানুরাগ ব্যক্তিতে বাহ্যতঃ উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় লক্ষণ দৃষ্ট হলেও উন্মাদগ্রস্তব্যক্তি শোচনীয় রোগার্ত ও জাতানুরাগী ভবরোগের থেকে বিমুক্ত হয়ে লোকাতীত রসরাজ্যে প্রবিষ্ট! উন্মত্তব্যক্তি অন্ধতমিস্রে নিমজ্জিত; আর প্রেমোন্মাদী সচ্চিদানন্দময় গোলোকধামের অভিমুখে অগ্রসর! একজন মূঢ় অপর জন আনন্দোন্মত্ত!!

দিব্যোন্মাদ কিন্তু এর বহু ঊর্ধ্বে। দিব্যোন্মাদে নিরবধি শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফূর্তিতে দিব্যোন্মাদী সতত রসরাজ্যে বিচরণ করেন। সর্বত্রই তাঁর বৃন্দাবন স্ফূর্তি হয়, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণলীলা

সন্দর্শন হয়। ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুগানে ধৈর্য, ধর্ম, লজ্জাদি ত্যাগ করে উন্মাদিনী হয়ে বনে বনে বিচরণ করেন, বৃক্ষ-লতা বিটপী-বিতানকে কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করেন—এও এক বিপুল উন্মাদিকাশক্তির কার্য, কিন্তু দিব্যোন্মাদের তুলনায় এরও গভীরতা অল্পতর। এতে সবিশেষ বৈচিত্রী বিকাশ দৃষ্ট হয় না। দিব্যোন্মাদ একমাত্র শ্রীরাধারই ভাবসম্পদ্। এযুগে নীলাচল-লীলায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু এই দিব্যোন্মাদের রসমাধুরী আস্বাদন করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥
তিনদ্বারে কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধুনীরে॥

চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্তপদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা—বাক্যে হা হা হুতাশ॥
'কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।" ইত্যাদি
(চৈঃ চঃ)

উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি দিব্যোন্মাদের বহুবিধ ভেদ আছে। "উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥" (উঃ নীঃ) নানা-প্রকার বিলক্ষণ ভাববৈবশ্যময় চেষ্টাকে 'উদ্ঘূর্ণা' বলা হয়।

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীললিতমাধব নাটকের তৃতীয়াঙ্কে শ্রী-রাধার উদ্‌ঘূর্ণাদশা বর্ণনা করেছেন। প্রিয়জনের সুহৃদের সঙ্গে দেখা হলে গূঢ়রোষ হতে স্ফুরিত তীব্র উৎকণ্ঠা সমন্বিত ভূরি-ভাবময় জল্পনাকে 'চিত্রজল্প' বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার চিত্রজল্পভাবময় দশটি শ্লোকে বর্ণিত দশবিধ জল্পনা সমন্বিত ভ্রমরগীতিই চিত্র-জল্প।*

মাদন –

"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥" (উঃনীঃ)

"হ্লাদিনীর সারভূত প্রেম যদি সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী হয়, তবে তাকে 'মাদন' বলে। ইনি পরাৎপর ভাব। এই মাদন একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই বিরাজ করেন।" প্রেম হ্লাদিনীর সার বা গাঢ়তর অবস্থা। এই প্রেম যখন সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী হয়, অর্থাৎ রতির থেকে মহাভাবপর্যন্ত সমস্ত ভাবেরই উল্লাসশীল হয়, তখন তাকে বলা হয় মাদন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে যেমন সমস্ত ভগবৎস্বরূপই তাঁর মধ্যে আবির্ভূত হন তদ্রূপ মাদন প্রকাশিত হলে সমস্ত প্রেমস্তর তাঁর মধ্যে উল্লাসময় হয়ে

---

*সুধীজন সেই সেই স্থানেই তা আস্বাদন করবেন। এখানে আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত।

উঠে। মাদন সর্বভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা পরমোৎকর্ষময় তাই পরাৎপর'।

"রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা" এই বাক্যে মাদনভাব একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই বিরাজিত। এমন কি শ্রীরাধারাণীর যূথে তাঁর প্রাণসম সখী ললিতাদিতে পর্যন্ত এই মাদনভাব নেই। এতেই প্রেমরাজ্যে শ্রীরাধারাণীর সর্বোৎকর্ষত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই মাদন অনাদিকাল থেকেই শ্রীরাধার মধ্যে বিরাজিত। শ্রীজীবপাদ লিখেছেন "যঃ খলু শ্রীরাধায়ামেব রাজতে, কদাচিদন্তঃ কদাচিদ্বহিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ" (লোচনরোচনীটীকা)। এই মাদনভাব শ্রীরাধার মধ্যে নিত্য বিরাজিত থাকলেও কখনও হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাব থাকে, আবার কখনও বাইরে প্রকাশিত হয়। এই মাদনভাব কোন সময়েই শ্রীরাধার চিত্ত হতে অন্তর্হিত হয় না। সুতরাং মাদন যে তাঁর স্বরূপগত ভাব, তা জানা গেল। এটিই শ্রীরাধার নিখিল মহাভাববতীগণ অপেক্ষা অপূর্বত্ব ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য! এতে জানা গেল, প্রেমোৎকর্ষ বিষয়ে শ্রীরাধাই অদ্বিতীয়া; তাঁর সমান আর কেউই নেই।

'মাদন' শব্দের নিরুক্তির থেকেও এক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মদ্-ধাতু থেকে 'মাদন' শব্দ নিষ্পন্ন। মদ্ ধাতু হর্ষ অর্থে প্রযুক্ত হলেও ণিজন্ত মদ্ধাতু মত্ততা সম্পাদন অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "মাদয়তি হর্ষেণ উন্মাদয়তীতি মাদনঃ" দিব্যমধুবিশেষের ন্যায় হর্ষোন্মত্ততা জন্মায় বলেই একে মাদন বলা হয়।

মাদনের অনুভাব—

"অত্রের্ষ্যায়া অযোগ্যেঽপি প্রবলের্ষ্যাবিধায়িতা।
সদাভোগেঽপি তদ্‌গন্ধমাত্রাধারস্তবাদয়ঃ ॥" (উঃনীঃ)

'এই মাদনভাবে ঈর্ষ্যার অযোগ্যবস্তুতেও প্রবল ঈর্ষ্যার উদয় হয় এবং সর্বদা সম্ভোগ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গন্ধমাত্র-বহনকারী পাত্রেরও স্তবাদি করা হয়।' শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বন-মালাকে আন্দোলিত হতে দেখে ( যদিও প্রাণহীন বনমালা ঈর্ষ্যার অযোগ্য তবু ) তাতে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে থাকেন।

শ্রীরাধা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারাদি করলেও শ্রী-কৃষ্ণের গন্ধমাত্র বহনকারী পাত্রের স্তুতি করে থাকেন। একদা তাঁরই বক্ষঃস্থলস্থ কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লিপ্ত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তথা হতে গমন করলে সেই কুঙ্কুম তৃণে লিপ্ত হয়েছিল। এক পুলিন্দকন্যা কাষ্ঠ আহরণ নিমিত্ত ঐ পথে গমনকালে সেই তৃণলিপ্ত কুঙ্কুমের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তা নিজ বক্ষে ও বদনে লেপন করেছিল। শ্রীরাধারাণী সেই পুলিন্দকন্যার ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক তাকে স্তব করেছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১০।২১।১৭ ) 'পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য' শ্লোকে বর্ণিত আছে।

এই মাদনভাবের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণি বলেন—

"যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ।
যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা ॥
মাদনস্য গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্যেব দুর্গমা।
ন নির্ব্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্ ॥"
( উঃ নীঃ )

'যোগেই বা মিলনকালেই কোন এক অনির্বচনীয় বিচিত্র প্রভাবসম্পন্ন এই মাদনের উদয় হয়। এই মাদনের নিত্যলীলা-রূপ বিলাস সকল সহস্রপ্রকারে বিরাজ করে থাকে। অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মাদনের গতিও সুষ্ঠুরূপে সুদুর্গম। এজন্য শ্রীল ভরতমুনি অথবা শ্রীমদ্ভাগবতে রাসবক্তা শ্রীপাদ শুক-মুনিও মাদনের প্রকৃষ্ট লক্ষণ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই।' উল্লিখিত 'যোগ এব ভবেদেষ' এশ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীল বিশ্ব-নাথ চক্রবর্তিপাদ যা লিখেছেন, তার মর্মার্থ এরূপ যে, যোগে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকালেই শ্রীরাধার মাদনভাবের উদয় হয়, বিরহে হয় না। মাদন সব সময় শ্রীরাধাতে বিরাজিত থাকলেও মিলনকালে উহা প্রকাশিত থাকে এবং বিরহে প্রচ্ছন্ন থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে—মাদনের অনুভাব প্রদর্শনের জন্য যে পুলিন্দকন্যার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তাতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিক-টেও ছিলেন না। সম্ভোগেই যদি মাদনের উদয় হয় তবে পুলিন্দ-

কন্যার উদাহরণ কিরূপে সঙ্গত হয়? এর উত্তরে বলা হচ্ছে, ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিরহ ও মিলনের যুগপৎ অনুভবের কথা জানা গেলেও তা প্রকাশভেদে হয়ে থাকে, একই প্রকাশে হয় না এবং প্রকাশভেদে অভিমানভেদও হয়। কিন্তু স্বয়ং মাদন যখন উদিত হয়, তখনই একই প্রকাশে চুম্বনালিঙ্গনাদির যুগপৎ অনুভব জন্মে এবং সেই অনুভবের মধ্যেই বিবিধ বিয়োগবৈচিত্রীরও অনুভব হয়। একই প্রকাশে যুগপৎ প্রকাশদ্বয়ের ধর্মানুভব —এটি হচ্ছে মাদনের এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন হতে পারে, সম্ভোগকালে বিরহজনিত অতি তৃষ্ণাময়ী উক্তি কিরূপে সম্ভবপর হতে পারে? উত্তরে বলা হচ্ছে, এটিই বিচিত্র অর্থাৎ শ্লোকস্থ 'বিচিত্র' শব্দে এটিই প্রকাশিত হয়েছে। সহস্রপ্রকার সম্ভোগকালে সহস্রপ্রকারের বিরহোৎকণ্ঠার উদয় হয় —এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! এ কিরূপে হয়, তা বলা যায় না— এটিই মাদনের অদ্ভুতত্ব।

আবার অনুরাগের লক্ষণে যে বিরহকালে বিস্ফূর্তির কথা বলা হয়েছে এ তদ্রূপ নয়; কারণ এ স্ফূর্তি নয়, এ সাক্ষাৎ। অনুরাগে প্রথমে বিরহের অনুভব তারপর কান্তের পুনঃপুনঃ স্মরণে তাঁর স্ফূর্তি, স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনাদিকালে তাদৃশ উৎকণ্ঠাময় উক্তির অভাব। সুতরাং অনুরাগের থেকে মাদনের মিলন-বিরহের যৌগপদ্যের বহু বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান!

মাদনের গতি সম্যক্‌রূপেই দুর্গমা—দুর্জ্ঞেয়া। কামবীজ কামগায়ত্রীতে উপাস্য অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যেমন দুর্জ্ঞেয়, এই মাদনের গতিও তদ্রূপ : এজন্য আদিরসের ব্যাখ্যাকার শ্রীল ভরতমুনি এবং শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব-মুনিও মাদনের লক্ষণাদি বর্ণনায় সমর্থ হননি। মাদনের মহিমার অনুরূপ মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধার মহিমাও সর্বথা অপূর্ব, অতুলনীয়, অনির্বাচ্য ও দুর্জ্ঞেয় বলে জানতে হবে।

# রসতত্ত্ব-বিজ্ঞান

## রস কাকে বলে ?

'রস' প্রকৃতি-ধর্মাতীত কোনও অপার্থিবতত্ত্ব—ব্রহ্মের ন্যায় অবাঙ্‌মনসোগোচর। এটি কেবল অনুভবের বস্তু, তর্কের দ্বারা নিরূপিত হয় না। আস্বাদকের ভাবনাপথ অতিক্রম করে রস শুদ্ধসত্ত্বাত্মক উজ্জ্বলচিত্তে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়। যাঁদের রসাস্বাদনের বাসনা বা সংস্কার নেই, তাঁরা কখনই রসবস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। সাহিত্যদর্পণকার বলেন—"তস্মাদলৌকিকঃ সত্যং বেদ্যঃ সহৃদয়ৈরয়ম্" অর্থাৎ রসবস্তু অলৌকিক একমাত্র সহৃদয় সামাজিকেরই বেদ্য। "রসস্যানন্দধর্ম্মত্বাৎ" "চমৎকারি সুখং রসঃ" ( অলঙ্কারকৌস্তুভ ) ইত্যাদি বাক্যে রস যে কোনও অনির্বচনীয় আনন্দ বা চমৎকারিত্বপূর্ণ সুখ তাই জানা যায়। চমৎকারিত্বই রসের প্রাণ, আস্বাদনে চমৎকারিত্ব না থাকলে রস হয় না—"রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ" ( ঐ ) আমাদের দর্শনীয় অথবা শ্রবনীয় বস্তুগুলির মধ্যে যদি কোন বস্তুবিশেষের সৌন্দর্য অদৃষ্টপূর্ব অথবা অশ্রুতপূর্ব হয়, তখন তার দর্শন এবং শ্রবণজনিত আনন্দে চিত্তে একটি স্ফারতা জন্মে, যার

ফলে আমাদের অজ্ঞাতসারে নেত্রদ্বয়ও বিস্ফারিত হয়ে উঠে। চিত্তের এই স্ফারতারই নাম চমৎকারিত্ব। বস্তুতঃ চিত্তের স্ফারতাই চক্ষুতে অভিব্যক্ত হয়। এই চমৎকারিত্বপূর্ণ আস্বাদন-বিশেষের নামই 'রস'।

"বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর রোধকম্।
স্বকারণাদি সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥"

(অলঙ্কারকৌস্তুভ)

অর্থাৎ কতকগুলি অনুকূলবস্তুর একত্র সংযোগের ফলে যদি চিত্তে এমন একটি আনন্দচমৎকারিতা জন্মে, যাতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারগুলি স্তম্ভিত হয়ে যায়, তবে সেই চমৎকারিত্বপূর্ণ আনন্দকেই 'রস' বলা হবে। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও লিখেছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১৩২)

মানবের ভাবনাপথ অতিক্রম করে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যে চমৎকারিত্বপূর্ণ অনির্বচনীয় আস্বাদন লাভ হয় তারই নাম 'রস'।

রস সাধারণতঃ দ্বিবিধ—প্রাকৃতরস বা জড়রস এবং অপ্রাকৃতরস বা চিন্ময়রস। প্রাকৃতরস বা জড়রস অন্তঃকরণগ্রাহ্য ও চিন্ময়রস আত্মসংবেদ্য। কবি-প্রতিভা প্রাকৃত নায়ক-

নায়িকাদি বিষয়ক কাব্যে নিবদ্ধ হলে সেই কাব্যাস্বাদনে সামাজিকের যে আস্বাদন লাভ হয়, তাকেই প্রাকৃতরস বলা হয়। আলঙ্কারিকগণের মতে এই আস্বাদন 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'। অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রকারগণের মতে কিন্তু প্রাকৃতকাব্যের লক্ষিতব্য রস প্রাকৃতমানবীয় চিত্তবৃত্তিবিশেষ, সুতরাং মায়িক ও গুণময়। স্বরূপতঃই তা অল্পকালমাত্র স্থায়ী। অতএব তাতে পূর্ণানন্দলাভের সম্ভাবনা নেই। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে স্পষ্টতঃ লিখেছেন —"কিঞ্চ লৌকিকস্য রত্যাদে সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখ-পর্য্যাবসায়িত্বাৎ ......... তস্মাল্লৌকিকস্যবিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্।" (১১০ অনুঃ) অর্থাৎ লৌকিক রত্যাদির সুখ-রূপতা যৎসামান্য। কারণ বস্তুবিচারে (আলম্বনাদি বিচারে) লৌকিক রত্যাদি দুঃখেই পর্যবসিত হয়, সুতরাং লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নয়।

এ বিষয়ে শ্রীল কবিকর্ণপূরের অভিমত "প্রাকৃতাপ্রাকৃতাভাস ভেদাদেষ ত্রিধা মতঃ। এষ রসঃ প্রাকৃতো লৌকিকো মালতী-মাধবাদিনিষ্ঠঃ। অপ্রাকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠঃ। আভাসস্থনে চিত্যাদি প্রবর্ত্তিতঃ।" (অলঙ্কারকৌস্তুভ ৫।১৪) অর্থাৎ 'প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও আভাস ভেদে এই রস ত্রিবিধ। মালতী-মাধবনিষ্ঠ রস প্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ রস অপ্রাকৃত। অনুচিতস্থলে রস হলে তা রসাভাস হয়।' এস্থলে টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখেছেন—"প্রাকৃতে রস এব নাস্তি, তদপি

যৎ ত্রৈবিধ্যমুক্তং তৎপরতানুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্। প্রাকৃতে যে রসং মন্যন্তে তে ভ্রান্তা প্রাকৃতা এব, যতোঽত্র কৃমিবিড়্‌ভস্মান্তবিষ্ঠেষু প্রাকৃতনায়কেষ্বতিনশ্বরেষু রসো ন ভবতি। বিচারতো বিভাববৈরূপ্যাৎ তদ্বিপরীতং ঘৃণাময়ং বৈরস্যমেবোৎপদ্যতে, ন তত্রৈব রসং বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। অতএব গ্রন্থকারেণাপি প্রাকৃতবিষয়ে একমপি পদ্যং নোদাহৃতং, কিন্ত্বপ্রাকৃত এব সর্ব্বাণি পদ্যানি উদাহৃতানীতি জ্ঞেয়ম্।”

অর্থাৎ যদিও প্রাকৃত কাব্য নাট্যাদি সেবনে রস হয় না তথাপি রসের ত্রিবিধত্ব বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা প্রাকৃত কাব্যরসিকগণের মতের অনুবাদ মাত্র। যাঁরা প্রাকৃত বিভাবাদিতে রসোদয় হয় বলে মনে করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। যেহেতু ভস্ম, কৃমি, অথবা বিষ্ঠাই যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাদৃশ অতি নশ্বর প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাতে কখনই রস সম্ভবপর নয়। আবার তত্ত্ববিচারেও জানা যায়, অবিদ্যার প্রভাবে প্রাকৃত কবি-বর্ণিত সেই দেহে আরোপিত কুসুমসমূহের সৌন্দর্য, সৌকুমার্য ও সৌগন্ধ্যাদি গুণগ্রামই বিভাববৈরূপ্য ; সুতরাং রসোদয় না হয়ে তদ্বিপরীত ঘৃণাময় বৈরস্যই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই রসিক-শিরোমণি শ্রীল গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থে কোনস্থলেই প্রাকৃত রস বিষয়ক একটি পদ্যও উদাহরণ দেন নাই, পরন্তু সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত রস বর্ণনা করে তদনুরূপ দৃষ্টান্তই দিয়েছেন। যাঁরা চিন্ময় ভগবদ্রসানন্দ আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁদের নিকট জড়রস

এরূপই নগণ্য ও ঘৃণ্য। কিন্তু জড়ীয় বিষয়ানন্দ অপেক্ষা এর আনন্দ যে শ্রেষ্ঠ বা বিলক্ষণ এ বিষয়ে অবশ্য সংশয় নাই।

## রসের আস্বাদক

রসের আস্বাদক কে? কাব্যরসের আস্বাদন বিষয়ে আলঙ্কারিকগণ চারটি পক্ষের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পক্ষ বলেন, সৎকবিনিবদ্ধ কাব্যের নায়ক-নায়িকাদি অনুকার্যে রসের মুখ্যাবৃত্তি এবং অনুকর্তা অভিনেতাতে গৌণীবৃত্তি স্বীকার্য। কাব্যানুশীলনে অভ্যাসবশতঃ চিত্ত নির্মল হলে অনুকর্তার রস আস্বাদন হতে পারে। দ্বিতীয়পক্ষ বলেন, লৌকিকত্ব, পারিমিত্য ও বিঘ্নসংকুলত্ব হেতু অনুকার্যে রসোদয় না হলেও নির্মলচিত্ত অনুকর্তাতে রসোদয় হতে পারে। তৃতীয় পক্ষের মত অনুকার্যে রসোদয় হয় না। আবার অনুকর্তা কেবল শিক্ষা নৈপুণ্যে অনুকরণ করে মাত্র, সুতরাং তাঁতে রসোদয় না হয়ে কেবল সামাজিকেরই (সহৃদয় দর্শক অথবা শ্রোতার) রসোদয় হয়। কারণ সামাজিক একাগ্রচিত্তে অভিনিবেশের সহিত দর্শন বা শ্রবণের সুযোগ প্রাপ্ত হন। সামাজিকের যে রসাস্বাদন হয় এটি অধিকাংশ আলঙ্কারিকেরই মত চতুর্থপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, অনুকর্তা স্বচ্ছচিত্ত হলে তাঁতে এবং সামাজিকে রসোদয় হতে কোন বাধা নেই।

উল্লিখিত আলোচনা হতে অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, অপ্রাকৃত বিভাবাদির অনুকার্য, অনুকর্তা ও সামাজিক সকলেরই রসোদয় হতে পারে। কারণ এতে পূর্বকথিত লৌকিকত্ব,

পারমিত্য ও বিঘ্নসঙ্কুলত্ব প্রভৃতির কোন প্রশ্নই নেই। তাই অনুকার্য ও তৎপরিকরগণে রসোদয় হয়ে থাকে। বিশেষতঃ ভগবদ্ রতিতে অলৌকিকত্ব, অপরিমিতত্ব স্বতঃসিদ্ধ। অলৌকিক রসের যিনি মূলবিষয়ালম্বন তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম এবং বিভাবাদিও স্বরূপতঃ অলৌকিক, স্বতঃসিদ্ধ ও অপরিমিত। শ্রীহরির গুণ অনন্ত, রূপ অফুরন্ত, তিনি লীলারসের কল্লোলিত পারাবার! আবার শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি প্রাকৃত কাব্যগত বর্ণসমষ্টিমাত্রই নয়; ভগবান্ এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ লীলাদিতে কোন ভেদ নেই। "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥" (চৈঃ চঃ) সুতরাং উহা ভয়াদি অনর্থদ্বারা, জন্মান্তরাদি দ্বারা, এমনকি ব্রহ্মানন্দাস্বাদন দ্বারাও ব্যবহিত হয় না। যথাক্রমে শ্রীপ্রহ্লাদ, জড়ভরত ও শুকদেবাদিই তার প্রমাণ। সুতরাং ভগবদ্‌রতিতে বিভাবাদি যাবতীয় সামগ্রীই অলৌকিক বলে ভগবদ্‌রতিতেই যথার্থ রসাস্বাদন স্বীকার্য।

## ভক্তিরসাস্বাদনের অধিকারী

"প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ—২।১।৬)

অর্থাৎ প্রাক্তন এবং আধুনিক ভগবদ্‌ভক্তিরস-বাসনা যাঁর চিত্তে আছে, তাঁরই হৃদয়ে ভক্তিরস আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হতে পারে।

যদিও রতির অস্তিত্বহেতু আধুনিক বাসনার বিদ্যমানতা বুঝাই যায়, তথাপি রসনিষ্পত্তির জন্য প্রাক্তনী বাসনাও আবশ্যক। পূর্বজন্মজাত বাসনাকে প্রাক্তনী এবং এ জন্মের বাসনাকে আধুনিক বলা হয়। রসাস্বাদনের নিমিত্ত উভয়বিধ বাসনারই প্রয়োজন। ( টীকায় শ্রীজীবপাদ )

কোনও নিরপরাধ সাধক যদি শ্রীগুরুপাদাশ্রয়পূর্বক ভজন করতে করতে এজন্মেই রতি লাভ করেন, তবু জন্মান্তরেই তাঁর রসের আস্বাদন লাভ হবে। ( টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ )

এক্ষণে দেখতে হবে, এই 'রসবাসনা' বস্তুটি কি ? এবং কি ভাবে কখন কার হৃদয়ে এর উদয় হয় ? তত্ত্ববিচারে জানা যায়, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ আছে বলে জীবের রসাস্বাদন-বাসনাও অনাদি এবং এই বাসনাবস্তুটি রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই—অন্য কারো জন্য নয়। কিন্তু কৃষ্ণবহির্মুখ জীব তা বুঝতে পারে না। তারা ঐ বাসনাকর্তৃক প্রেরিত হয়েই কৃষ্ণেতর বিষয় বস্তুর উপভোগে তার স্বরূপগত স্বাভাবিক বাসনার তৃপ্তিবিধান করতে চায় ; কিন্তু জড়-বিষয়-বিরোধী চিদ্রূপ আত্মা তাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। কেননা রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবারসাস্বাদন জীবাত্মার পরমার্থভূতবস্তু। তাই অনাদিকাল থেকে যথেষ্ট জড়ীয়বিষয়ভোগ করেও তারা চির অতৃপ্ত একমাত্র ভগবদ্রসাস্বাদনেই তারা তৃপ্ত ও ধন্য হতে পারে। কল্যাণময়ী শ্রুতি রসবাসনার লক্ষ্যহারা জীবগণকে স্পষ্টভাবেই সেকথা জানিয়ে

দিয়েছেন—"রসো বৈ সঃ" "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ তাঁকে লাভ করেই রসপিপাসু জীব আনন্দী হতে পারে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে 'হি' ও 'এব' এই দুটি নিশ্চয়াত্মক অব্যয়পদ আছে, এর দ্বারা সূচিত হয়েছে যে, শ্রীভগবান্ ব্যতীত অপর কোনবস্তুর দ্বারা জীব কখনই আনন্দী হতে পারবে না। এভাবে জীবের রসবাসনার মূল অনুসন্ধান করলে আমরা জীবের ভক্তিবাসনারই সন্ধান লাভ করি। শ্রদ্ধাবান্ সাধক সাধুগুরুর সঙ্গ ও কৃপাপ্রসূত এইভক্তি বাসনা বা ভজনাকাঙ্ক্ষা চিত্তে নিয়েই ভজনক্রিয়া ও ভজনোৎসাহের ফলে ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির পর রতিদশায় আরূঢ় হয়ে থাকেন। এই রতিই ভক্তহৃদয়ের স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাবই বিভাব, অনুভাবাদি সামগ্রী সংযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং সহৃদয় ভক্তই ভক্তিরসাস্বাদনের অধিকারী।

## রসোৎপত্তির সাধন-সহায় ও প্রকার

"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতা ॥

কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গ-তৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ—২।১।৭-১০ )

রসোৎপত্তির সাধন—ভক্তির প্রভাবে নিখিল দোষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন ( শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভাবের যোগ্য ) ও উজ্জ্বল ( তজ্জন্য সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ) হয়েছে, যাঁরা শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিক ভক্তের নিত্যসঙ্গই যাঁদের রঙ্গ ( উল্লাসাতিরেক ), যাঁরা শ্রীগোবিন্দপাদ-ভক্তি-সুখ-সম্পদকেই জীবাতু বলে মনে করেন, যাঁরা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদির প্রতি-নিয়ত অনুষ্ঠানে রত।

রসোৎপত্তির সহায়—সেই সব ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজ-মানা প্রাক্তনী ( পূর্বজন্মের ) ও আধুনিকী ( এ জন্মের ) সংস্কার-দ্বয়ে উজ্জ্বল। রসোৎপত্তির প্রকার—আনন্দরূপা রতিই অনুভব-বেদ্য অর্থাৎ লৌকিক রসবৎ সংকবি-নিবদ্ধতার অপেক্ষা শূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহচর্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়ে পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরমসীমা লাভ করে থাকে।

এসব প্রমাণ থেকে জানা যায়—এই রসবস্তু ব্রহ্মের ন্যায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত কোনও দিব্য অপার্থিববস্তু। এ কেবল অনুভবের জিনিষ, তর্কের দ্বারা নিরূপিত হয় না। রসের সংস্কার বা রসবাসনা যাঁদের নেই, তাঁরা রসতত্ত্ব কখনই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন না।

## রসবিষয়ে অনধিকারী

"ফল্গুবৈরাগ্য-নির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জরন্মীমাংসকাদ্ রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥"

( ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১২৯ ৩° )

ফল্গুবৈরাগ্য অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে উদাসীনতায় যাদের চিত্ত দগ্ধ হয়েছে তাদৃশ শুষ্কজ্ঞানান্বেষী তর্কমাত্রৈকনিষ্ঠ, কর্মবাদী—পূর্বমীমাংসক এবং দ্বৈতবস্তুমাত্রের মিথ্যাত্ববাদী—উত্তরমীমাংসক, এরা সকলেই ভক্তিরস আস্বাদনে অনধিকারী। এরা উত্তরোত্তর অধিকতর ভক্তিবিষয়ে বহির্মুখ। কেননা তার্কিকগণের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহলবশতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করে যৎ কিঞ্চিৎ ভক্তিরসাস্বাদন করতেও পারেন; কিন্তু মীমাংসকগণ সর্বথা ভক্তিবিষয়ে অনধিকারী। গ্রাম্য-ব্যক্তিরা ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধ এবং অন্যেরা অজ্ঞই। মহানিধি যেমন পাছে চৌরগণ অপহরণ করে বলে অতি সংগোপনে গৃহস্থগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস মহানিধিও ভক্তিরসিকগণ গ্রাম্য ও অজ্ঞব্যক্তিগণের নিকট থেকে গোপন করবেন। বিশেষতঃ জরন্মীমাংসকগণ হতে সর্বদাই সংগোপনে রাখবেন যেহেতু তাঁরা সর্বদাই ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখ এবং প্রাকৃত যুক্তিবলে ভক্তিবাদের খণ্ডন-তৎপর।

'এ জগতে পঞ্চবিধ লোক দৃষ্ট হয়ে থাকে (১) অজ্ঞ, (২) গ্রাম্য, (৩) প্রাজ্ঞ (৪) ভাবক ও (৫) ভাব্য। এরমধ্যে অজ্ঞ-লোকেরা অন্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হলেও রসশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। গ্রাম্য ব্যক্তিরা গ্রাম্য বিষয়াসক্ত,পশু নির্বিশেষ। প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ রসশাস্ত্রে বিজ্ঞ ও রসের উৎকর্ষ স্বীকার করেও দুর্ভাগ্যবশতঃ রসাস্বাদনের অযোগ্য। এই ত্রিবিধ জনই রসবিষয়ে অনধিকারী। ভাবক-ভক্তগণ রসশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং রসাস্বাদনে সমর্থ। ভাব্যভক্তগণ রসসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে এঁদের রসিকভক্ত বলা হয়। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, অভক্তগণের নিকট এই ভক্তিরস সর্বথাই দুর্বোধ্য। শ্রীহরিচরণারবিন্দই যাঁদের সর্বস্ব, সেই ভক্তগণই ভক্তি-রসের একমাত্র আস্বাদক।

"সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্‌রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥"

( ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১৩১ )

## রসনিষ্পত্তি

রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে শ্রীল কবিকর্ণপূর শ্রীভরতমুনির বাক্য উদ্ধৃত করেছেন—"বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্‌-রসনিষ্পত্তিঃ" 'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়ে থাকে।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।

স্থায্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ।
এষা কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥”

( ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৫ )

অর্থাৎ ‘এই স্থায়িভাব শ্রীকৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবকদম্বদ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হলেই ভক্তিরস হয়।’

অতএব রসবস্তু বুঝতে হলে প্রথমতঃ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী স্থায়িভাব ও নিষ্পত্তি এইসব পরিভাষাগুলির তাৎপর্য বুঝতে হবে।

বিভাব—“বিভাবয়তি উৎপাদয়তি ইতি বিভাবঃ কারণম্” ( অঃ কৌঃ ) সামাজিকের রত্যাদি স্থায়িভাবকে বিভাবিত করে যে, এই অর্থে এটি কারণ। তাৎপর্য এই যে, বিষয়, আশ্রয় ও উদ্দীপনরূপে রতি আস্বাদনের হেতুগুলিকে ‘বিভাব’ বলা হয়। এই বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দ্বিবিধ—বিষয় ও আশ্রয়। রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং রতির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণভক্ত আশ্রয়ালম্বন। অর্থাৎ যাঁর উদ্দেশ্যে রতি প্রবৃত্ত হয় তাঁকে বিষয় এবং যে আধারকে আশ্রয় করে রতি স্থায়ী হয় তাকে আশ্রয়ালম্বন বলে। যার দ্বারা রতি উদ্দীপিত হয় তাই উদ্দীপন বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধনদ্রব্য, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, হরিবাসর প্রভৃতি উদ্দীপন।

অনুভাব —“অনু পশ্চাদ্ভাবো ভবনং যস্য সোঽনুভাবঃ কার্য্যম্” (অঃ কৌঃ) অনু অর্থাৎ পশ্চাদ্‌ভাব বা উৎপত্তি হয় যার, এই অর্থে কার্য। তাৎপর্য এই যে বিষয় ও আশ্রয় স্বরূপের অন্তরে অবরুদ্ধ রত্যাদিকে কটাক্ষ, ঈষদ্‌হাস্যাদিরূপে বাইরে প্রকাশ করে এবং যা রসের কার্যস্বরূপ তাকে ‘অনুভাব’ বলা হয়। অর্থাৎ চিত্তস্থভাবের অববোধক ক্রিয়াবিশেষকে অনুভাব বলে। ইহা বাইরে ( শরীরে ) বিকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলে ‘উদ্ভাস্বর’ নামেও অভিহিত হয়। নৃত্য, গীত, ক্রোশন ( চিৎকার ), গাত্র-মোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা, স্মিত প্রভৃতি বাহ্যিক বিকারদ্বারা চিত্তস্থ-ভাবের বোধ হয়। কেবল সত্ত্ব হতে উৎপন্ন হলে অনুভাবসমূহকে ‘সাত্ত্বিক’ বলা হয়—“সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।” ( ভঃ রঃ সিঃ ) এই সাত্ত্বিকভাব অষ্টবিধ—

“তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥” (ঐ)

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব।

ব্যভিচারী—“বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যস্যেতি ব্যভিচারী সহকারী।” ( অঃ কৌঃ ) বিশেষভাবে স্থায়িভাবের অভিমুখে বিচরণশীল যে ভাব তার নাম ব্যভিচারী। ভাবের গতি সঞ্চারণ করে বা স্থায়িভাবকে বৈচিত্রী প্রাপ্ত করায় বলে

এদের সঞ্চারিভাবও বলা হয়। "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে" ( ভঃ রঃ সিঃ ) সিন্ধুর তরঙ্গসমূহ যেমন সিন্ধু থেকে উত্থিত হয়ে তাকে বর্ধিত করে তাতেই লীন হয়, তদ্রূপ এই ব্যভিচারী ভাবগুলি স্থায়িভাব থেকে উত্থিত হয়ে তাকে উচ্ছ্বসিত করে তাতেই মিশে যায়। তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব যথা—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ।

স্থায়িভাব—"আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া মতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈঃ।" ( অঃ কৌঃ )

রজঃ তমোহীন শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তের এক অনির্বচনীয় রত্যাখ্য ধর্মবিশেষ, যা রসাস্বাদনরূপ কার্যের কারণীভূত বা বীজস্বরূপ অর্থাৎ মূলস্বরূপ বিজ্ঞগণ তাকেই 'স্থায়িভাব' বলে থাকেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বলেন—

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥
স্থায়িভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ॥"
( ভঃ রঃ সিঃ )

হাস্যাদি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবসকলকে

বশীভূত করে যে ভাব স্বরাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাকে স্থায়ী ভাব বলা হয়। ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ী ভাব আখ্যা দেওয়া হয়।

সামাজিকের স্থায়ী ভাবই বিভাবাদির সহযোগে রসরূপে পরিণত হয়ে থাকে ; সুতরাং আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব রসের কার্য বা কারণ নয়, অনুভাবরূপ কার্যেরই কারণ। আর ব্যভিচারী ঐ অনুভাবের সহকারী মাত্র, এদের সংযোগবশতঃ স্থায়ী ভাবই 'রস' রূপে পরিণত হয়। এ প্রকারে বিভাবাদি রসের অভিব্যক্তির কারণ হলেও রসের কারণ নয়; কারণ স্থায়ী ভাবের নিত্যতা হেতু তার পরিপাকবিশেষ রসেরও নিত্যতা সিদ্ধ হচ্ছে। বিশেষতঃ এই স্থায়ী ভাব হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তির বিলাসরূপ এবং অবিচিন্ত্য স্বরূপবিশিষ্ট। অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতিরূপত্বহেতুই তার ভাবত্ব।

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে—'স্থায়ী ভাবের পরিমাণ রস' একথা বলা হয়েছে, আবার স্থায়ী ভাব ও রসকে নিত্য বলা হয়েছে ; এই দুই কথার কোন সামঞ্জস্য হয় না। কারণ যার পরিণাম হয় এবং যা পরিণত হয়, তা কখনও নিত্য হয় না। অতএব স্থায়ী ভাবের পরিণাম যদি রস হয়, তাহলে স্থায়ী ভাব ও রস উভয়ই অনিত্য হয়ে পড়ে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে -যেমন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা এবং লীলার পরিণামরূপ বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাদি বয়স ও

তদুচিত ধর্মাদিও নিত্যবস্তু। কিন্তু ভক্তগণের প্রবল দর্শনোৎকণ্ঠা হলে জগদুদ্ধারণাদি প্রয়োজনকে নিমিত্ত করে কোন কোন সময়ে শ্রীভগবানের সেই নিত্যলীলাই বিশ্বে প্রকটিত হন আবার প্রয়োজন সিদ্ধ হলে সেই লীলা অপ্রকট হন। এস্থলেও তদ্রূপ বিভাবাদির সম্মীলনে ভক্তহৃদয়ে রসের প্রকটন হয়ে থাকে। তাদের অন্তর্ধানে রসেরও অপ্রকটতা জানতে হবে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য এইযে, প্রাকৃতবস্তুর পরিণামে তার পূর্বাবস্থার ত্যাগ হয়। যেমন ইক্ষুরস পাকবিশেষে গুড় হলে তার থেকে আর ইক্ষুরসের পৃথক্ স্থিতি স্বীকার করা যায় না। তেমনি উত্তরোত্তর গুড় চিনি হয়, চিনি মিছরী হয়, এই মিছরী অবস্থায় ইক্ষুরস, গুড় ও চিনির আর পৃথক্ সত্তা থাকে না অপ্রাকৃতবস্তুর কিন্তু এমন একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে যে, পূর্বাবস্থাকে পরিত্যাগ না করেই তার পরিণাম প্রকটিত হয়। দৃষ্টান্ত—যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত কৈশোর দেহই বাল্য পৌগণ্ডাদিরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁর কৈশোরদেহই কৈশোরাবস্থা পরিত্যাগ না করেই বাল্যদেহ হয়ে থাকে, বাল্যদেহই আবার ততোধিক উৎকর্ষলাভে পৌগণ্ডদেহ হয় ও পৌগণ্ডদেহই ততোধিক মাধুর্যোৎকর্ষলাভে কৈশোরদেহ হয়ে থাকে। প্রতিটি অবস্থাই তাঁর নিত্য। তদ্রূপ ভক্তের স্থায়ী ভাব নিত্য হয়েও রসরূপে পরিণতি লাভ করে এবং উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্বও বিদ্যমান থাকে। যেহেতু 'স্থায়ী ভাব' এবং তার পরিণামস্বরূপ 'রস' উভয়েই নিত্য বস্তু।

রসনিষ্পত্তি বিষয়ে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁর প্রীতি-সন্দর্ভে লিখেছেন —“ভাবা এবাভিসম্পন্না প্রযান্তি রসরূপতাম্” ( ১১০ অনুঃ ) অর্থাৎ ‘অভিসম্পন্ন ( রসতা প্রাপ্তির যোগ্য ) ভাবসমূহই রসরূপতা প্রাপ্তি করে।’ প্রাকৃত বিভাবাদি ( দেবাদি বিষয়িণী হলেও ) রসের স্থায়িত্ব ও সামগ্রীর অভাবে রসনিষ্পন্ন হয় না। রসত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে যে সব সামগ্রীর যোগ্যতা অপেক্ষা করে, অপ্রাকৃত বিভাবাদিতে সে সবই বিদ্যমান। ঐ সামগ্রী যোগ্যতা ত্রিবিধ—(১) স্বরূপযোগ্যতা, (২) পরিকর যোগ্যতা ও (৩) সামাজিক যোগ্যতা।

(১) স্বরূপযোগ্যতা - নিত্যপরিকরগণের স্থায়িভাবরূপতা এবং আনন্দ তাদাত্ম্যতা শ্রীভগবানের প্রকাশক ও আনন্দদায়ক বলে মোক্ষসুখ তিরস্কারক, শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ হ্লাদিনীর সার বৃত্তি-স্বরূপ হয়েও নিত্যপ্রিয়গণের এই ভাব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত হতে পারে।

(২) পরিকরযোগ্যতা —লৌকিকরসের বিভাবাদি প্রাকৃত বলে বিভাবনাদি বিষয়ে স্বতঃই অক্ষম। পক্ষান্তরে নিত্যপ্রিয়গণের ভগবৎপ্রীতিতে বিভাবাদি স্বতঃই ক্রিয়াশীল হয়ে রসতা প্রাপ্তি করে। আবার ঐ প্রীতি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশ হয়েও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতে আবির্ভূত ও তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(৩) সামাজিক যোগ্যতা—ভগবদ্ভক্তিবাসনা যাঁর আছে

তাঁরই হৃদয়ে ভক্তিরসাস্বাদন-যোগ্যতা উদিত হতে পারে।

অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে এই কথাগুলিই আরও বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে। অপ্রাকৃতরসের আস্বাদক—শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরগণ ও তদনুগত সামাজিক ভক্তগণ। অতএব রসের আস্বাদক দ্বিবিধ—শ্রীভগবানের লীলান্তঃপাতী নিত্যপার্ষদগণ ও লীলান্তঃপাতিত্বাভিমানী সামাজিকভক্ত। তারমধ্যে নিত্যপার্ষদগণের স্বযোগ্য বিভাবাদির সংযোগে স্বতঃই রসনিষ্পত্তি হয়ে থাকে, কারণ তাঁরা নিরন্তর ঐ রস আস্বাদন করে থাকেন। আর তাঁদের অনুগত সামাজিক ভক্তগণের গতি দুপ্রকার। (১) নিজাভীষ্ট লীলান্তঃপাতী নিত্যপরিকরগণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের লীলাদি স্মরণের দ্বারা রসোদয় হয়। (২) কেবল শ্রীভগবানের মাধুর্যময় লীলাকথা শ্রবণকীর্তনের দ্বারা অর্থাৎ ঐ লীলা যদি কেউ কখনও অভিনয় করেন কিংবা সঙ্গীতের দ্বারা রূপায়িত করেন অথবা কোন মহানুভব বক্তা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা করে ভাষায় লীলামাধুরী প্রকাশ করেন তখন সেই সেই বিষয়ের শ্রোতা অথবা দ্রষ্টা ঐ রসের আস্বাদক হতে পারেন। তার মধ্যে ঐ সকল লীলাপরিকর যদি সমবাসনা হন তাহলে সদৃশ ভাবহেতু স্বতঃই সেই লীলান্তঃপাতী পরিকরবিশেষের বিভাবাদির সহিত সাধারণীকরণদ্বারা রসাস্বাদন হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ নিত্যসিদ্ধ পরিকরে যে রসের অভিব্যক্তি হয়, সামাজিক ভক্তের হৃদয়েও সেই জাতীয় রসোদয় হয়ে থাকে।

এক্ষণে বুঝা গেল, প্রপঞ্চাতীত নিত্যপার্ষদগণ এবং প্রপঞ্চ-স্থিত সামাজিক ভক্তগণ উভয়েই অপ্রাকৃতরসের আস্বাদক। নিত্যপরিকরগণের ভাব স্বতঃসিদ্ধ বলে তাদের কোন উপদেশ বা গ্রন্থ শ্রবণাদির অপেক্ষা নেই। কিন্তু প্রপঞ্চস্থিত সামাজিক-ভক্তের যাতে রসবাসনা তীব্র হয় এবং রতি যাতে স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য সংস্কার ও সাধনাদির অপেক্ষা আছে। কেননা রস-বাসনাহীন বা সংস্কারশূন্য চিত্তে রসাস্বাদন হয় না—"ন জায়তে রসাস্বাদং বিনা রত্যাদি বাসনাম্।"

## ভাবসাধারণ্য

'ভাব' শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি মাধুর্যের অনুভব বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় এই ভাব প্রপঞ্চগত ভক্তগণের চিত্ত-বৃত্তিতে উদিত হতে পারে। অর্থাৎ সাধকভক্তের চিত্তবৃত্তি নিত্য-সিদ্ধ পরিকরগণের চিত্তবৃত্তির সদৃশ হয় বলে তাঁদের চিত্তবৃত্তিরূপ ভাবের ঐ লক্ষণটি প্রাপঞ্চিকভক্তের চিত্তবৃত্তিতে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। তাদাত্ম্য বলতে ভেদসহিষ্ণু অভেদ ভাব অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাপূবক সজাতীয় ভাব-সাধারণ্য। নিত্যপরিকরগণের ভাব-ধারার সঙ্গে সাধক-ভক্তগণের ভাব-সাজাত্য। এই ভাব-সাজাত্যের আবেশে প্রাপঞ্চিক ভক্তগণও নিত্যপরিকরগণের অনুষ্ঠিত অসাধারণ কার্যগুলি অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারেন।

"অলৌকিক্যা প্রকৃত্যেয়ং সুদুরূহা রসস্থিতিঃ।
যত্র সাধারণতয়া ভাবাঃ সাধু স্ফুরন্ত্যমী॥

এষাং স্ব-পর-সম্বন্ধনিয়মানির্ণয়ো হি যঃ।
সাধারণ্যং তদেবোক্তং ভাবানাং পূর্ব্বসূরিভিঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ—২।৫।১০১ ১০২)

'অলৌকিক স্বভাববশতঃ এই রসনিষ্পত্তি-ব্যাপারটি সুদুর্গমই বটে; এতে বিভাবাদি ও রত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক ভক্তগণের মধ্যে সাধারণভাবে উত্তমরূপে স্ফূর্তি পায়। 'ভাবসাধারণ্য' বলতে এই ভাবসমূহের স্ব-পর-সম্বন্ধ-নিয়মের অনির্ণয়ই বাচ্য। এতে নবীনভক্তগণ প্রাচীন ভক্তগণের অসাধারণ ব্যাপারগুলি সম্পন্ন করতে পারেন।'

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখেছেন, কোনও সজ্জনসভায় একবার রামায়ণ পাঠকালে শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে সে কথা শ্রবণে তত্রত্য কোন সহৃদয়ভক্ত তাদৃশ ভাবাবেশে লজ্জা-সঙ্কোচাদি ত্যাগপূর্বক স্বয়ংই সমুদ্রলঙ্ঘন করবার জন্য সভামধ্যে উল্লম্ফন করেছিলেন।

কোন দৃশ্যনাট্যে এক সহৃদয় দশরথের বেশ ধারণ করে অভিনয় করছিলেন। সেই সহৃদয় নট যখন শুনলেন—'রাম বনে গিয়েছেন' তখন তিনি দশরথের ভাবাবেশে স্বয়ংও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

এরূপে তাদৃশ রতিই প্রাচীন ভক্তগণের সঙ্গে আধুনিক ভক্তদের 'ভাব-সাধারণ্য' দান করেন, যাতে তাদৃশ রসস্থিতিও হতে পারে। উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে প্রাচীন ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে

অর্বাচীন ভক্তের ভাবধারা এমনভাবে মিলে গিয়েছিল যে, অর্বাচীন ভক্তগণ সেই আবেশে প্রাচীনভক্তদের অসাধারণ ব্যাপারগুলি সম্পাদন করেছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—বিভাবাদির সাধারণীকরণ ব্যাপারে এমন কোন অচিন্ত্যশক্তি আছে, যার প্রভাবে অপ্রাচীন ভক্ত শ্রীহনুমানের সহিত নিজের অভিন্নতাবোধে সমুদ্রলঙ্ঘন করবার জন্য সভামধ্যে উল্লম্ফন করেছিলেন। ভাব-সাধারণ্য দ্বারা এরূপ উৎসাহাদি অসাধারণ শক্তির বিকাশ হয় যে, যার প্রভাবে সহৃদয় মানব হয়েও সমুদ্রলঙ্ঘনাদি বৃহদ্‌ব্যাপার সম্পাদনে উৎসাহিত হন। যেহেতু ঐসহৃদয় অনুকার্যগত বিভাবাদির সঙ্গে নিজের ঐক্যাভিমান করেন।

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

( সাহিত্যদর্পণ )

অর্থাৎ এই বিভাবাদি আমার বা অপরের এরূপ স্ব-পর-সম্বন্ধ বিশেষের অনির্ণয় নিবন্ধন সেই বিভাবাদির সহিত সাধারণ্য প্রতীতি হয়। রতিই প্রাচীন ভক্তদের ভাবের সহিত অপ্রাচীন ভক্তদের ভাব-সাধারণ্য দান করে। যাতে রসস্থিতি বা রস-নিষ্পত্তি একই প্রকারে হতে পারে।

শ্রীভরতমুনি বলেছেন—বিভাবাদির সাধারণীকরণ ব্যাপারে এমন এক অনির্বচনীয় শক্তি আছে, যে শক্তিদ্বারা সামাজিক নিজেকে বিভাবাদি থেকে অভিন্ন মনে করেন।

বিভাবাদি থেকে সামাজিকের সম্পূর্ণ অভিন্নবুদ্ধি বা তাদাত্ম্যভাব কিন্তু স্বাদনাখ্য ব্যাপারেই ঘটে থাকে। রস আস্বাদনের সময়ে শ্রীহনুমানের সহিত সামাজিকের ভেদ বিলোপ হয়। সাধারণীকরণ ব্যাপারে কখনও ভেদ কখনও অভেদ প্রতীতি হয় ; কিন্তু স্বাদনাখ্য ব্যাপারে ভেদজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সর্বতোভাবে অভেদ অভিমান হয় একেই 'তন্ময়ীভবন' বলা হয়। সাধারণীকরণ ব্যাপারে কাব্য-নাট্যাদির যৎসামান্য কারণতা থাকলেও রতিরই প্রভাব স্বীকার করতে হবে। কেননা কাব্যবর্ণিত বিভাবাদির বিভাবত্ব প্রাপণে রতিরই মুখ্যত্ব। এই রতি শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাদির আশ্রয় বলে শ্রীকৃষ্ণাদি বিষয়কে প্রকাশ করে এবং মাধুর্যাদি আস্বাদ্যমান হয়ে রতিকে বিস্তীর্ণ করে। সুতরাং বিভাবাদি চতুষ্টয়ের এবং রতির মধ্যে পরস্পর সহযোগীতা লক্ষিত হয়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন -

"এতেষাস্তু তথাভাবে ভগবৎকাব্যনাট্যয়োঃ।
সেবামাহুঃ পরং হেতুং কেচিত্তৎপক্ষরাগিণঃ ॥
কিন্তু তত্র সুহৃস্তর্কমাধুর্য্যাদ্ভুতসম্পদঃ।
রতেরস্যাঃ প্রভাবোঽয়ং ভবেৎ কারণমুত্তমম্ ॥"

( ভঃ রঃ সিঃ – ২।৫ ৯০-৯১ )

'ভাবের বিভাবনাদি বিষয়ে কাব্যনাট্য-পক্ষপাতী-পণ্ডিতগণ ভগবৎকাব্য-নাট্যের সেবাকেই হেতু বলে নির্দেশ করেন, কিন্তু

সেই বিষয়ে সুহৃত্তর্ক্যমাধুর্যরূপ অদ্ভুত-সম্পদ্‌শালিনী ভগবদ্বিষয়িণী রতির প্রভাবকেই উত্তম কারণ বলতে হয়।'

'আবার সহৃদয় বা ভাবুকভক্তের চিত্তে সংস্কার না থাকলে কেবল ভাব-সাধারণ্য দ্বারা রসাস্বাদন হয় না। বিশেষতঃ রস ও রসাস্বাদনের কোন ভেদ নেই বলে রসবাসনার তারতম্যে বিভাবাদি ব্যাপার নিবৃত্ত হলেই আস্বাদনব্যাপারটিও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু রসিকভক্তের পক্ষে ঐ সময়েও রস যেন সম্মুখে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং হৃদয়ে প্রবেশ করে যেন প্রতি অঙ্গকে আপ্যায়িত করে। সুতরাং ঐ সময়েও রসাস্বাদন ক্রিয়া বর্তমান থাকে ; আর সবই বিস্মরণ করায়ে দেয়, এটিই রসের রসত্ব।

## মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরস

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় বলেছেন—

"ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চপরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি—এ পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥"

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পরিঃ )

শান্ত, দাস্যাদি পঞ্চবিধ মুখ্যরস ছাড়াও হাস্য অদ্ভুত, বীর করুণ, রৌদ্র, বিভৎ'স এবং ভয় এই সপ্তবিধ গৌণরসের কথা

জানা যায়। শান্ত, দাসাদি পঞ্চবিধ ভক্তের চিত্তে কোনও কারণ উপস্থিত হলে এই সপ্তবিধ গৌণরস আগন্তুকরূপে উপস্থিত হয় এবং কারণের অন্তর্ধানে আবার অন্তর্হিতও হয়। শান্তাদি মুখ্য-রসগুলির ন্যায় এরা সব সময় ভক্তের চিত্তে বিদ্যমান থাকে না। যেমন, করুণরসের স্থায়িভাব শোক এবং অন্যান্য ব্যভিচারিভাব এই শোকের আবির্ভাব করায়ে তাতেই লীন হতে পারে, কিন্তু শোককে ঐ করুণরসে স্থায়িরূপে অবস্থান করতেই হবে। যেহেতু শোক ভিন্ন করুণরস হতেই পারে না। শোকের অপগম হলেই করুণরসও তিরোহিত হয়। এরূপ হাস্যাদি প্রতিটি গৌণরসের কথাই জানতে হবে। কিন্তু শান্তাদি মুখ্যরসের স্থায়ী ভাবের কদাচ বিচ্ছেদ ঘটে না।

"পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥" (ঐ)

সপ্তবিধ গৌণ ভক্তিরস ভগবৎপ্রিয়জনে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয় বলে পঞ্চবিধ মুখ্যরসে সপ্তবিধ গৌণরসের সঞ্চারিত্ব জানা যায়। এজন্য এই প্রবন্ধে আমরা পৃথকভাবে গৌণরসের বিষয় আলোচনা করব না; পঞ্চবিধমুখ্যরসের কথাই আলোচনা করব। যাঁরা গৌণরস বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের উত্তর বিভাগে তাঁরা তা অবগত হতে পারবেন।

## শান্তভক্তিরস

শমপ্রধান আত্মারাম ও তাপসগণকর্তৃক শান্তিরতি বিভাবাদি

দ্বারা আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হলে তাকে শান্তভক্তিরস বলা হয়।

"শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
'শমোমন্নিষ্ঠতাবুদ্ধ্যে' এই শ্রীমুখ গাথা॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ প্রীতিসন্দর্ভে শান্তভক্তকে তটস্থ-ভক্ত এবং তাঁদের ভক্তিকে তটস্থাভক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন— "এতেষু ভগবৎপ্রিয়েষ্ সামান্য শান্তৌ তটস্থাখ্যৌ। অনয়োঃ প্রীতিশ্চ তটস্থাখ্যা" ( ৮৪ অনুঃ ) শ্রীভগবানে মমতাগন্ধহীন বলেই শান্তভক্তিকে 'তটস্থা' বলা হয়েছে, কারণ শ্রীভগবানে প্রেমসঙ্গত মমতাকেই মহাজনগণ 'ভক্তি' আখ্যা দিয়েছেন। শ্রী-নারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

'অন্যত্র মমতাবর্জিত শ্রীবিষ্ণুতে যে 'প্রেমসঙ্গত মমতা ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি মহাজনগণ তাকেই ভক্তি' আখ্যা দিয়ে থাকেন।' প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীমদ্ জীবগোস্বামিপাদ বলেছেন, শান্তভক্তগণের শ্রীভগবানে যে মমত্ব দেখা যায় না এটি যুক্তি-সঙ্গতই. কারণ তাঁদের শ্রীভগবানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধবিশেষের স্ফুরণ হয় না ( ৯৬ অনুঃ )। অথচ দাস্য, সখ্যাদি একতর

সম্বন্ধবিশেষকে প্রাপ্ত হয়েই মমতা আত্মসত্তা লাভ করে থাকে।

শান্তভক্তগণের ভক্তির কার্য বা অনুভাব ব্রহ্মপ্রবণতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং কদাচিৎ স্তুতি আদি। শান্তভক্তগণ মনে করেন, শ্রীভগবান্ আত্মারাম আপ্তকাম তাঁর ক্ষুৎপিপাসা নেই, তিনি সর্বভাবে পূর্ণ সুতরাং তাঁর সেবার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সুহৃৎ-রসবিচারে দাস্য-ভাবের সঙ্গে শান্তভাবের সৌহার্দের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দাস্যভাব শান্তভাবের কেবল সুহৃদই নয় কিন্তু উত্তম সুহৃৎ। তিনি মুখ্য শান্ত অঙ্গীরসে দাস্যের অঙ্গত্ব দেখাতে গিয়ে কোন শান্তভক্তের উক্তির উল্লেখ করেছেন, যথা (ভঃ রঃসিঃ ৪।৮।২০)—

"জীবস্ফুলিঙ্গবহ্নে-র্মহসো ঘনচিৎস্বরূপস্য।
তস্য পদাম্বুজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি ॥"

'যে অগ্নিপুঞ্জস্বরূপ পরব্রহ্মের জীব স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, সেই ঘন-চিৎস্বরূপ মহঃ বা জ্যোতির পদাম্বুজযুগল আমি সম্বাহন করব কি?' এশ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলেন— "ঘনঃ শ্রীবিগ্রহস্তদাকারা যা চিৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং পরং ব্রহ্ম সৈব স্বরূপং যস্য তাদৃশত্বেন মমালম্বনস্যেতি তত্র স্বনিষ্ঠা দর্শিতা।" তাৎপর্য এইযে, 'ঘন' অর্থে শ্রীবিগ্রহ, ( নচেৎ পদাম্বুজযুগলং শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে না ) 'চিৎ' শব্দের অর্থ সচ্চিদা-নন্দ ; ( কারণ চিদর্থ জ্ঞান বা অনুভূতি, সেই চিৎ বা জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান ) অতএব শান্তভক্তের

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মেই নিষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীজীব আরও লিখেছেন, "পাদসম্বাহনেচ্ছা চ পরমানন্দবিগ্রহস্য তস্য স্পর্শানন্দ প্রাপ্তীচ্ছয়ৈব ন। তু সাহায্যেনানন্দদানেচ্ছয়া, পূর্ণানন্দত্বেন তস্য স্ফুরণাৎ" অর্থাৎ এস্থলে শান্তভক্তের পাদসম্বাহনের যে ইচ্ছা, এটি পরমানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মের স্পর্শানন্দ লাভের আশায়; কিন্তু দাসাদি ভক্তগণের ন্যায় শ্রীভগবানকে আনন্দদানের ইচ্ছায় (বা সেবার্থে) নয়। কারণ এঁদের নিকট পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ সর্বদা পূর্ণানন্দময়।

শান্তভক্তের অনুভাব—ভগবৎগুণাদির প্রশংসা, পরব্রহ্ম পরমাত্মাদি নামোচ্চারণ, ব্রহ্মসুখাবধারণপূর্বক ভগবত্তন্মুখতা প্রভৃতি এবং নাসাগ্রদৃষ্টিত্ব, অবধূতচেষ্টা, জ্ঞানমুদ্রাদিপূর্বক জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, হরি নতিস্তুতি প্রভৃতি। সাত্ত্বিকভাব—অশ্রু, পুলকাদি। উদ্দীপন – বিভুত্ব, শান্তত্ব, সমত্ব, অদ্ভুতরূপবত্ব ইত্যাদি। সঞ্চারী – নির্বেদ, ধৃতি হর্ষ, মতি স্মৃতি বিষাদ বিতর্ক ইত্যাদি (প্রীতিসন্দর্ভ ২০৩ অনুঃ)। "কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণে" (চৈঃ চঃ) এই দুটি গুণ অন্যান্য রসেরও ভিত্তিস্বরূপ জানতে হবে। রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত যথা –

"হৃষ্টঃ কন্বুপতিস্বনৈর্ভুবি লুঠচ্চীরাঞ্চলঃ সঞ্চল-
ন্মূর্দ্ধা রুদ্ধদৃগশ্রুভিঃ পুলকিতো দ্রাগেব লীনব্রতঃ।
অক্ষোরঙ্গনমঞ্জনত্বিষি পরব্রহ্মণ্যবাপ্তে মুদা,
মুদ্রাভিঃ প্রকটীকরোত্যবমতিং যোগী স্বরূপস্থিতৌ ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ—৩।১৪২)

অর্থ—"পাঞ্চজন্যের ধ্বনি শ্রবণে কোন যোগী হৃষ্টচিত্তে বস্ত্রাঞ্চল ভূমিতে লুণ্ঠন করায়ে মস্তকচালনপূর্বক অশ্রুধারায় রুদ্ধদৃষ্টি হয়েছিলেন সর্বাঙ্গে পুলকোন্নতি হয়েছিল, শীঘ্রই তাঁর ব্রত-নিয়-মাদি নষ্ট হয়ে গেল। নয়নপ্রাঙ্গণে অঞ্জনকান্তি পরব্রহ্ম উপস্থিত হলে তিনি আনন্দের আতিশয্যে স্বীয় যোগিস্বরূপে অবস্থানের প্রতি অবজ্ঞাই দেখালেন।" এশ্লোকের বিভাবাদি সামগ্রী-সংযোজন যথা—

বিভাব— { বিষয়ালম্বন – পরব্রহ্ম চতুর্ভুজ ভগবৎস্বরূপ।<br>আশ্রয়ালম্বন শান্তরতির আশ্রয়ালম্বন যোগী।<br>উদ্দীপন – পাঞ্চজন্যরব।

অনুভাব – বিলুণ্ঠন, মস্তকসঞ্চালন ইত্যাদি।

সাত্ত্বিক—অশ্রুপুলকাদি।

সঞ্চারী –হর্ষ, আবেগাদি।

এই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী যোগীর স্থায়ি-ভাব শান্তিরতির সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তভক্তিরসরূপে আস্বাদিত হয়েছে।

## দাস্যভক্তিরস

দাস্যরসে শান্তের (কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ) গুণ আছে আবার 'সেবা' আছে। "শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক 'সেবন'। অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ দাসভক্তগণের স্থায়িভাবকে **'সম্ভ্রমপ্রীতি'** বলে আখ্যা দিয়েছেন, যথা—

"সম্ভ্রমঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ।
অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে ॥
এষা রসেঽত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ — ৩।২।৭৬)

"প্রভুতা জ্ঞানবশতঃ চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, তাকে সম্ভ্রম বলে ; এর সঙ্গে ঐক্যপ্রায় প্রীতিকেই 'সম্ভ্রমপ্রীতি' বলা হয়, এই সম্ভ্রমপ্রীতিই দাস্যভাব ব'লে পণ্ডিতগণ বলে থাকেন।" "পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে" (চঃ চঃ) সম্ভ্রমসঙ্কোচের উদয়ে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় — "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে হয় সঙ্কুচিত প্রীতি" (ঐ) তবু অন্যত্রের (বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকাদির) দাসগণ অপেক্ষা ব্রজস্থ দাসগণের সম্ভ্রমপ্রীতির বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। প্রীতিসন্দর্ভে লিখিত আছে—" স চ (দাস্যভাবঃ) অক্রূরাদীনামৈশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানঃ। শ্রীমদুদ্ধবাদীনাং তত্তৎসদ্ভাবেঽপি মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রধানঃ। শ্রীব্রজস্থানান্তু মাধুর্য্যৈকময় এব। অথাপ্যেষাং প্রীতের্ভক্তিত্বং শ্রী-গোপরাজকুমারপরমগুণপ্রভাবত্বাদিনৈবাদরসদ্ভাবাৎ।" (২০৮ অনুঃ)

অর্থাৎ দাস্যভাব বা সম্ভ্রমপ্রীতি অক্রূরাদির ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রধান, শ্রীমদুদ্ধবাদির ঐশ্বর্যজ্ঞান সত্ত্বেও মাধুর্যজ্ঞান-প্রধান এবং ব্রজস্থ ভৃত্যগণের সম্ভ্রমপ্রীতি কেবলই মাধুর্যময়। শ্রীব্রজরাজ-কুমার, পরমগুণবান্ ও প্রভাবশালী এই বুদ্ধিতে সম্ভ্রম বা আদর বিদ্যমান থাকে।' "কৃষ্ণকে ঈশ্বর নাহি জানে ব্রজজন" (চৈঃ চঃ) ব্রজের দাসগণেরও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলে গৌরববুদ্ধি হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলায় রক্তক, পত্রকাদি দাসগণের নাম পাওয়া যায় না। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের রচিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকার পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে ( পুরাণ, সংহিতা বা তন্ত্রাদিতে ) রক্তক, পত্রকাদির নাম আছে কিনা তা আমরা জানি না। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত ব্রজলীলায় সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবেরই বর্ণনা আছে। শ্রীনন্দমহারাজের প্রজা-গণের কারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাব থাকতে পারে এবং তাঁদের আনুগত্যে দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করার লোভ কারও হলেও হতে পারে। কিন্তু রক্তক. পত্রকাদি দাসভক্তগণের নাম এবং সেবা-পরিপাটীর উল্লেখ না থাকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ অথবা শ্রবণের ফলে তাঁদের আনুগত্যে দাস্যভাবে রাগানুগাভক্তির অবসর অতি অল্প। এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে —"মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধাভক্তি॥" সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের ভক্তিই ব্রজে মুখ্য রাগানুগাভক্তি।

দাস্যরসের উদ্দীপন—অনুগ্রহসংপ্রাপ্তি শ্রীচরণরজঃ প্রাপ্তি, মহাপ্রসাদাঙ্গীকার দাসভক্তগণের সঙ্গ প্রভৃতি। অনুভাব স্বাধি-কারযোগ্য সেবায় প্রবর্তন, কৃষ্ণভক্তজনবিষয়ে নিষ্ঠতা ইত্যাদি, স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক এবং হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, দৈন্য, ঔৎসুক্য, আবেগাদি সঞ্চারিভাব। রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত —

"সমক্ষমক্ষমঃ প্রেক্ষ্য হরিমঞ্জলিবন্ধনে।
দারুকো দ্বারকাদ্বারি তত্র চিত্রদশাং যযৌ॥"
( ভঃ রঃ সিঃ—৩।২।১৩৫ )

'দারুক দ্বারকাদ্বারের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অঞ্জলি বন্ধনেও অসমর্থ হয়ে বিচিত্রদশাই প্রাপ্ত হলেন।'

এইশ্লোকের বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

স্থায়িভাব -দাস্যাভিমান হেতু সম্ভ্রমপ্রীতি স্থায়ী।

বিষয়ালম্বন—পালকাভিমানী শ্রীকৃষ্ণ।

আশ্রয়ালম্বন—পাল্যাভিমানী দারুক।

উদ্দীপন—দ্বারকার দ্বারদেশ।

অনুভাব—'প্রেক্ষ্য' পদদ্বারা সাদর দর্শন ও অঞ্জলিবন্ধনে প্রবৃত্তি।

সাত্ত্বিক—'অঞ্জলিবন্ধনেও অক্ষম'এতে স্তম্ভসাত্ত্বিক সূচিত।

ব্যভিচারী -'চিত্রদশাং' শব্দে হর্ষ, জাড্য, কম্প, হ্রী, ঔৎসুক্যাদি।

সুদীর্ঘ বিরহের পর অপ্রত্যাশিত এই অনুগ্রহ সংপ্রাপ্তিতে নানা ভাববৈচিত্রী আস্বাদনের চমৎকারিতা।

## সখ্যভক্তিরস

"শান্তের গুণ দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য - গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন॥

মমতা অধিক কৃষ্ণে—আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ সখ্যরসকে প্রেয়োভক্তিরস বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রেয়োভক্তিরসে সখ্যই স্থায়িভাব।

"বিমুক্তসম্ভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্॥
বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ।" (ভঃরঃসিঃ)

'পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বয়ের যে সম্ভ্রম বা গৌরববিমুক্ত বিশ্রম্ভপ্রধান রতি তাকে 'সখ্য' বলা হয়। এই প্রেয়োরসে সখ্যই স্থায়িভাব। 'বিশ্রম্ভ' বলতে সর্বসঙ্কোচরহিত গাঢ় বিশ্বাসবিশেষই বাচ্য।'

শ্রীহরি এবং তাঁর সখাগণই এই সখ্যরসের আলম্বনবিভাব —"হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ'। ( ঐ ) শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সখ্যরসের বিষয়ালম্বন শ্রীহরির গুণাবলী বর্ণনা করেছেন—

"সুবেষঃ সর্ব্বসল্লক্ষ্মলক্ষিতো বলিনাং বরঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিদ্বাবদূকঃ সুপণ্ডিতঃ॥
বিপুলপ্রতিভো দক্ষঃ করুণো বীরশেখরঃ।
বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ক্ষন্তা রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্॥
সুখী বরীয়ানিত্যাদ্যা গুণাস্তস্যেহ কীর্ত্তিতাঃ॥"
( ভঃ রঃ সিঃ )

সুবেশ, সর্বসল্লক্ষণান্বিত, বলিষ্ঠ, বিবিধ অদ্ভুতভাষাবিৎ, বাবদূক সুপণ্ডিত, বিপুল প্রতিভাশালী দক্ষ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল সকললোকের অনুরাগভাজন, সমৃদ্ধিমান, সুখী ও বরীয়ান্ ইত্যাদি গুণান্বিত শ্রীহরি প্রেয়োরসের আলম্বন। এই রসের আশ্রয়ালম্বন সখাগণ রূপে গুণে ও বেশে শ্রীহরির সমান,দাস্যের ন্যায় এঁদের সঙ্কোচ বিন্দুমাত্রও নেই এঁরা প্রগাঢ় বিশ্বাসময়। যথা—

"রূপ-বেশ-গুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ।
বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো রসস্যাস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥" (ঐ)

অর্জুন ভীমসেন, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরসম্বন্ধীয় বয়স্য. এঁদের মধ্যে অর্জুনই শ্রেষ্ঠ। ব্রজের বয়স্যগণ সকল সখাগণেরই শ্রেষ্ঠ যথা—

"ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ-বিহারিণঃ।
তদেকজীবিতাঃ প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ।
অতঃ সর্ব্ববয়স্যেষু প্রধানত্বং ভজন্ত্যমী॥" (ঐ)

'যাঁরা ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অতিশয় দুঃখিত হয়ে থাকেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা সদা বিহার পরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণই যাঁদের জীবন, তাঁরাই তাঁর ব্রজবাসী বয়স্য। এঁরা বয়স্যগণমধ্যে সর্বথা প্রধান।' ব্রজের সখাগণ চতুর্বিধ—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যাঁদের বয়স কিঞ্চিৎ অধিক, যাঁরা অস্ত্রধারণ করে দুষ্টগণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়াসী

তাঁদের নাম সুহৃৎসখা। সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয়, বলভদ্র প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের 'সুহৃৎসখা' বলে কীর্তিত। যাঁরা কনিষ্ঠকল্প; দাস্যগন্ধি-সখ্যরসিক, তাঁরাই সখা।' বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি সখা। যাঁরা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের সমান এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী তাঁরাই প্রিয়সখা শ্রীদাম, সুদাম, দাম বসুদাম, কিঙ্কিণি, স্তোককৃষ্ণ অংশু, ভদ্রসেন বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক, কলবিঙ্ক ইত্যাদি প্রিয়সখাগণ সতত বিবিধ কেলিদ্বারা এবং বাহুযুদ্ধ, দণ্ডাদণ্ডি ইত্যাদি কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণকে সুখদান করেন। এঁদের মধ্যে শ্রীদাম শ্রেষ্ঠ। যাঁরা সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাববিশেষযুক্ত বা সখীভাবাবিষ্ট প্রেয়সীসাহায্যময় আত্যন্তিক রহস্যকার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁদের প্রিয়নর্মসখা বলা হয়। সুবল, অর্জুন গন্ধর্ব, বসন্ত উজ্জ্বল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি প্রিয়নর্মসখা। এঁদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ।

শ্রীহরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, গুণ, প্রেষ্ঠজন এবং রাজা ও দেবাবতারাদির চেষ্টানুকরণ সখ্যরসের উদ্দীপন বিভাব। বাহুযুদ্ধ, কন্দুক, দ্যূত, বাহ্যবাহক লগুড়ালগুড়ী, ক্রীড়াদি অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদাদি সাত্ত্বিকভাব ও হর্ষাদি ব্যভিচারিভাব।

"ক্রীড়োৎসবানন্দরসং মুকুন্দে, স্বাত্যম্বুদে বর্ষতি রম্যঘোষে।
শ্রীদামমূর্ত্তির্বরশুক্তিরেষা স্বেদাম্বুমুক্তাপটলীং প্রসূতে॥"

( ভঃ রঃ সিঃ—৩।৩।৯০ )

অর্থাৎ "মুকুন্দরূপ স্বাতি নক্ষত্রীয়মেঘ রমণীয় মুরলীধ্বনিরূপ গর্জনসহ ক্রীড়োৎসবরূপ আনন্দবারিবর্ষণ করতে থাকলে শ্রীদামের দেহরূপ উৎকৃষ্ট শুক্তি ঘর্মবিন্দুরূপ মুক্তামালা প্রসব করল।" এই শ্লোকের বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

স্থায়িভাব—ব্রজবিশ্রম্ভাখ্যরতি।

বিভাব {
বিষয়ালম্বন—সখ্যরতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ।
আশ্রয়ালম্বন—শ্রীদাম সখা।
উদ্দীপন—মুরলীধ্বনি।

অনুভাব—'ক্রীড়োৎসব' পদদ্বারা কেলি প্রভৃতি।

সাত্ত্বিক—'স্বেদাম্বুমুক্তাপটলীং' পদদ্বারা স্বেদাখ্য সাত্ত্বিক।

সঞ্চারী—'আনন্দরসং বর্ষতি' পদে হর্ষ, চাপল্যাদি সঞ্চারী। সখ্যরস বর্ণনায় মহাজন—

"যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুক্ত হৈয়া॥
প্রখর রবির তাপে শুকাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হৈল দুঃখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সবারে॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার॥

বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
ইথে বলরাম দূর বনে গেল গাই॥"

## বাৎসল্য ভক্তিরস

"বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভৎ'সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥" ( চৈঃ চঃ )

বাৎসল্যরতিই এই বৎসলরসের স্থায়িভাব। শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুগণই এই রসের আলম্বন বিভাব। এ রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ—

"নবকুবলয়দাম-শ্যামলং কোমলাঙ্গং,
বিচলদলক-ভৃঙ্গ-ক্রান্ত-নেত্রাম্বুজান্তম্।
ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী,
ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা॥"

( ভং রঃ সিঃ—৩।৪।৩ )

"যিনি নবনীলোৎপল-মালার ন্যায় স্নিগ্ধশ্যামল ও কোমলাঙ্গ, যাঁর নয়নাম্বুজের প্রান্তভাগ অতি চঞ্চল অলকরূপ ভ্রমরগণে পরিব্যাপ্ত এরূপ পুত্রকে ব্রজভূমিতে বিহার করতে দেখে ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদামাতা স্বয়ং স্রবিত স্তন্যধারায় দেহ আদ্র' করেছিলেন।"

শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্বসল্লক্ষণান্বিত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, হ্রীমান্, বিনয়ী, মন্যমানকৃৎ ও দাতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণই এ রসের বিষয়ালম্বন।

ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, পিতৃব্যপত্নীগণ, ব্রহ্মাকর্তৃক হৃতপুত্রা গোপীগণ, দেবকী, তাঁর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনিমুনি প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের গুরুগণ এ রসের আশ্রয়ালম্বন। এঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর জন হতে পূর্বপূর্ব জন শ্রেষ্ঠ। কৌমারাদি বয়স রূপ, বেশ, শৈশবচাপল্য, মধুরবাক্য, মৃদুমন্দহাস্য ও লীলাদি এই রসের উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরণ, স্নপনাদি, লালন, পালন ও হিতোপদেশ দানাদি বৎসলরসের অনুভাব। এরসে স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক ও মাতাগণের স্তন্যক্ষরণ সহ নয়টি সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ, আবেগ, ঔৎসুক্যাদি ব্যভিচারিভাব। স্থায়িভাব বাৎসল্যরতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বৎসলরস হয়ে থাকে। যথা—

"তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্তৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্॥"

(ভাঃ—১০৮।২৩)

"স্নেহভরে যশোদা ও রোহিণীর স্তন হতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হত, তাঁরা রুচির পঙ্কের অঙ্গরাগে সুন্দরাঙ্গ নিজপুত্রদ্বয়কে (কৃষ্ণ

ও বলদেবকে ) কোলে তুলে নিতেন এবং স্তনদান করতেন। শিশু-দ্বয় যখন স্তনপান করতেন তখন তাঁদের মুগ্ধহাস্য ও অল্পদন্ত-শোভিত মুখশোভা দর্শন করতে করতে মাতৃদ্বয় পরমানন্দে নিমগ্ন হতেন।" এই শ্লোকের বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

স্থায়িভাব—বাৎসল্যাখ্য রতি।

বিভাব { বিষয়ালম্বন—রিঙ্গণ পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব।
আশ্রয়ালম্বন—শ্রীযশোদা ও রোহিণীমাতৃদ্বয়।

উদ্দীপন—কৃষ্ণ বলদেবের কৌমার বয়স, মৃদুহাস্য, বাল্য চাপল্যাদি।

অনুভাব—লালন, চুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গ-মার্জনাদি।

সাত্ত্বিক—অশ্রু, পুলক, স্তন্যস্রাবাদি।

ব্যভিচারী—হর্ষ, আবেগ, ঔৎসুক্যাদি।

মহাজনের বর্ণনায় ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্যরস—

"হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখি বহে বহু ধারা
দুখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘর পর যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সবে মায়॥
ও মোর যাদব দুলালিয়া।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া॥

আগে পাছে নাহি মোরা হা পুতীর পুত তোরা
আন্ধল করিয়া যাবি মোরে।
দুধের ছাওয়াল হৈয়া বনে যাবে ধেনু লৈয়া
কি দেখি রহিব যাইয়া ঘরে॥
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জানি
সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাঁপে।
বাড়ল অনল পারা বিষম রবির খরা
কেমনে সহিবে হেন তাপে॥
কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দঢ়
শুনিতে সিঙ্কিত পড়ে গায়।
শিরীষ-কুসুম-দল জিনিয়া চরণ-তল
কেমনে ধাইবে হেন পায়॥
মায়ের করুণা বাণী শুনিয়া গোকুলমণি
কত মত মায়েরে বুঝায়।
বিষাদ না কর মনে কিছু ভয় নাহি বনে
ইথে সাথী এ শেখররায়॥"

## মধুর ভক্তিরস

"মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীহরি এবং তাঁর সুনয়না ব্রজ প্রেয়সীগণই এইরসের আলম্বন বিভাব। তন্মধ্যে অসমোর্দ্ধ ও লীলাবৈদগ্ধীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন। যথা—

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর,-
শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিত,
শৃঙ্গারঃ সখি! মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥"
( গীতগোবিন্দম্ )

'হে সখি! সকল গোপীর অনুরঞ্জনে তাঁদের আনন্দ জন্মাইয়া ইন্দীবরশ্রেণী অপেক্ষাও সুশ্যামল এবং কোমল অঙ্গসমূহদ্বারা তাঁদের অনঙ্গোৎসব সম্পাদন করে সেই ব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রত্যঙ্গে সর্বথা আলিঙ্গিত হয়ে মনোজ্ঞ শ্রীহরির এই বসন্তে মূর্তিমান্ শৃঙ্গারবৎ ক্রীড়া করছেন।'

আশ্রয়ালম্বন প্রেয়সীগণ যথা—

"নব-নব-বরমাধুরী-ধুরীণাঃ প্রণয়তরঙ্গকরম্বিতান্তরঙ্গাঃ।
নিজরমণতয়া হরিং ভজন্তীঃ, প্রণমত তাঃ পরমাদ্ভুতাঃ কিশোরীঃ॥"
( ভঃ রঃ সিঃ ৩।৫।৬ )

"যাঁরা নব-নবায়মান উৎকৃষ্ট মাধুর্যাতিশয় ধারণ করেন, যাঁদের অন্তঃকরণের প্রত্যেক বৃত্তিই প্রণয়তরঙ্গে মিশ্রিত এবং যাঁরা স্বীয় রমণরূপে শ্রীহরির ভজন করেন, সেই পরমাদ্ভুত কিশোরীগণকে প্রণাম করি।" যদিও দ্বারকায় সমঞ্জসারতিমতী মহিষীগণের এবং মথুরায় সাধারণীরতিযুক্তা কুব্জাদিরও কান্তাভাব তথাপি পরকীয়ভাববতী ব্রজসুন্দরীগণই নিখিল কান্তাগণের শ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে আবার ব্রজবালা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীই সর্বশ্রেষ্ঠা। "প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরাবার্ষভানবী।" (ভঃরঃসিঃ)

"প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ॥

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

'বামা' এক গোপীগণ 'দক্ষিণা' একগণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন॥

গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্নখনি॥

বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা'॥

বাম্যস্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দসাগর॥" ( চৈঃ চঃ )

শ্রীরাধার রূপ –

"মদচকিতচকোরী-চারুতাচোরদৃষ্টি-,
র্বদনদমিতরাকারোহিণীকান্তকীর্ত্তিঃ।
অবিকলকলধৌতোদ্ধূতিধৌরেয়কশ্রী-
র্মধুরিমমধুপাত্রী রাজতে পশ্য রাধা॥" (ভঃ রঃ সিঃ)

"যাঁর নয়ন মদমত্ত চকোরীর চারুতা চুরি করে, বদন রাকাচন্দ্রমার কীর্তি দমন করে, অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য বিশুদ্ধ স্বর্ণের কান্তিকেও বি-নিন্দা করে –ঐ দেখ মাধুর্যমধুপাত্রী সেই শ্রীরাধা বিরাজ করছেন।

## উদ্দীপন বিভাব

শ্রীহরি ও তাঁর প্রিয়াগণের গুণ, নাম. চরিত্র, মণ্ডন, সম্বন্ধী ও তটস্থভাবসমূহই এই মধুররসে উদ্দীপন।

গুণ কায়িক, বাচিক ও মানসভেদে ত্রিবিধ। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, অভিরূপতা, মাধুর্য ও মার্দব ইত্যাদি কায়িক গুণ। কর্ণরসায়ন বাক্যই বাচিক গুণ। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা ও করুণাদিই মানস গুণ। 'রাধা' 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি মধুর বর্ণযুগলই 'নাম'। চরিত—অনুভাব ও লীলাভেদে দ্বিবিধ। ( অনুভাব পরে বলা হবে ) বেণুবাদন, রাসক্রীড়া, কন্দুকাদি ক্রীড়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত। লাস্য, বীণাবাদন, সঙ্গীত, রন্ধনাদি শ্রীরাধার চরিত। মণ্ডন চতুর্বিধ –বস্ত্র, ভূষা, মাল্য ও অনুলেপন। সম্বন্ধী –লগ্ন ও সন্নিহিত এই দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের লগ্ন—বংশীরব, শিঙ্গারব, গান, অঙ্গ-

সৌরভাদি। শ্রীরাধার লগ্ন বীণাধ্বনি, সঙ্গীত, অঙ্গসৌরভাদি। শ্রীকৃষ্ণের সন্নিহিত—নির্মাল্য, গুঞ্জা, গৈরিকাদি ধাতু লগুড়ী প্রভৃতি। শ্রীরাধার সন্নিহিত—নির্মাল্যাদি বীণা, ললিতাদি প্রেষ্ঠজন ও শ্রীরাধাকুণ্ড। তটস্থ—চন্দ্রিকা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, ময়ূর, কোকিল, শুকশারী প্রভৃতি।

## অনুভাব

অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক মধুররসে এই ত্রিবিধ অনুভাব। যৌবনে কামিনীগণের স্ব প্রাণনাথ শ্রীহরিতে সর্বদা অভিনিবেশ-বশতঃ ঐ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী চেষ্টা থেকে সমুদ্ভূত ভাবদ্বারা আক্রান্ত চিত্তে জাত বিংশতিপ্রকার অলঙ্কার যথা—হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটি অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগলভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য—এই সাতটি অযত্নজ। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত—এই দশটি স্বভাবজ অলঙ্কার। ইহা ব্যতীত মৌগ্ধ ও চকিত এই দুটি অলঙ্কার অতিরিক্ত।

উদ্ভাস্বর—নীবি, উত্তরীয় ও ধম্মিল্ল ( খোঁপার ) স্খলন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, নাসার প্রফুল্লতা, নিশ্বাসত্যাগ, বিলুণ্ঠন, গীত, আক্রোশন, লোকানপেক্ষিতা, ঘূর্ণা, হিক্কাদিকে উদ্ভাস্বর বলা হয়। বাচিক—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ এই দ্বাদশটি বাচিক।

## সাত্ত্বিক ভাব

এই রসে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি অষ্টসাত্ত্বিকভাবই প্রকাশ পায়। সাত্ত্বিকভাবের পাঁচটি অবস্থা—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সূদীপ্ত। ভাব বা রতিস্তরে সাত্ত্বিক ধূমায়িত, প্রেমস্তরে জ্বলিত, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগস্তরে দীপ্ত, রূঢ় মহাভাবে উদ্দীপ্ত এবং মোহনাখ্য মহাভাবে সূদ্দীপ্ত। শ্রীরাধারাণীতে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক যথা –

> "স্বেদৈর্দ্দিশিতহুর্দ্দিনা বিদধতী বাষ্পাম্বুভির্নিস্তৃষো
> বৎসীরঙ্গরুহালিভির্মুকুলিনী ফুল্লাভিরামূলতঃ।
> শ্রুত্বা তে মুরলীং তথাভবদিয়ং রাধা যথারাধ্যতে
> মুগ্ধৈর্মাধব! ভারতীপ্রতিকৃতিভ্রান্ত্যাত্র বিদ্যার্থিভিঃ॥"
>
> ( উঃ নীঃ )

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদ শ্রবণে সূদ্দীপ্তসাত্ত্বিক ভাবাবিষ্টা শ্রীরাধার দশা শ্রীবিশাখা ও বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করছেন—'হে মাধব! মহা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তোমার মুরলীনাদ শ্রবণে অদ্য শ্রীরাধার এমন দশা হয়েছে যে বিদ্যার্থীগণ ভ্রান্ত হয়ে তাঁকে সরস্বতী প্রতিমা জ্ঞানে পূজো করছে। ( এখানে স্তম্ভ ও বৈবর্ণের আতিশয্য ) অহো! শ্রীরাধার প্রচুরতর স্বেদবারি নির্গত হয়ে বর্ষাকালের স্বরূপ প্রকট করল! অশ্রুজলের ধারা বৎসতরীগণের পিপাসার শান্তি করল। আপাদমস্তক ফুল্লরোমাঞ্চে তিনি যেন মুকুলিতান্বিতা হলেন!'

## ব্যভিচারী ভাব

"আলস্যৌগ্রে বিনা সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।" (ভঃ রঃ সিঃ)

অর্থাৎ নির্বেদাদি যে তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের কথা বলা হয়েছে, এই মধুররসে উগ্রতা ও আলস্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সব ব্যভিচারিভাবই প্রকাশ পেয়ে থাকে। শ্রীরাধাতে সবই অতি উৎকর্ষ প্রাপ্ত ও মনোহারী হয়ে প্রকাশ পায়। যথা সৌভাগ্যজনিত গর্বের দৃষ্টান্ত—

"মুঞ্চন্মিত্র-কদম্ব-সঙ্গমভজন্নপ্যুৎসুকাঃ প্রেয়সী-
রেষ দ্বারি হরিস্ত্বদাননতটী-ন্যস্তেক্ষণস্তিষ্ঠতি।
যূথীভির্মকরাকৃতি স্মিতমুখী ত্বং কুর্ব্বতী কুণ্ডলং
গণ্ডোদ্যৎপুলকা দৃশোঽপি ন কিল ক্ষীবে ক্ষিপস্যঞ্চলম্॥"
(উঃ নীঃ)

সৌভাগ্যাতিশয়জনিত গর্বে কুণ্ডল নির্মাণাবেশের ছলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অমনোযোগী শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—'হে সখি! সখাগণের সঙ্গ ত্যাগ করে উৎকণ্ঠিতা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি প্রেয়সীগণকেও অনাদর করে এই হরি তোমার দ্বারে তোমারই মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন! তুমি কিনা হাস্য-বদনে ফুল্লগণ্ডে যূথিকাকুসুমদ্বারা মকরাকৃতি কুণ্ডল রচনাতেই আবিষ্ট হয়ে এঁর প্রতি কটাক্ষপাত করছ না।' স্থায়িভাব মধুরারতি এই বিভাবাদির সহিত মিলনে মধুরাখ্য ভক্তিরসরূপে

পরিণতি লাভ করে। এই মধুরাখ্য বা উজ্জ্বলরস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ—"স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ।"

পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে বিপ্রলম্ভ বা বিরহরস চতুর্বিধ। এগুলি সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক এবং স্বয়ং আস্বাদ্য হয়ে 'রস' রূপেও খ্যাত। পূর্বরাগ রস যথা—পূর্বরাগবতী শ্রীরাধার অস্বাভাবিক ভাব দর্শনে সখীর উক্তি—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইস যাও।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চাও॥
রাই! কেনে বা এমন হৈলে।
গুরুদুরজনে ভয় নাই মনে
কোথা বা কি দেব পাইলে॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি
বসন খসাঞা পর॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবতী বালা।

কিবা অভিলাষে বাড়ালে লালসে
না বুঝি তোমার ছলা ॥
তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলে চাঁদে।
চণ্ডিদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকিলে কালিয়া ফাঁদে ॥”

উক্ত পদের বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

স্থায়িভাব—বিপ্রলম্ভাখ্য মধুরারতি।

বিভাব { বিষয়ালম্বন—ধীরললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন—পূর্বরাগবতী শ্রীরাধা। উদ্দীপন—কদম্বকাননে দৃষ্টি নিক্ষেপ।

অনুভাব—ঘরের বাহিরে ও ভিতরে পুনঃপুনঃ গতাগতি

সাত্ত্বিক - অশ্রু, বৈবর্ণ প্রভৃতি।

সঞ্চারী—আবেগ, বিষাদ, গ্লানি প্রভৃতি।

মহাজনপদে প্রবাসাখ্য মধুররসের একটি সজীব চিত্র—

“ফুটল কুসুম নব- কুঞ্জকুটির বন
কোকিলা পঞ্চম গাবই রে।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেশ না আবই রে ॥
চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।

সময় বসন্ত কান্ত রহু দূরদেশ
জানলুঁ বিহি প্রতিকূল ॥

অনিমিখ-নয়নে কানুমুখ নিরখিতে
তিরপিত না হয়ে-নয়ান ।

এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ ॥

দিনে দিনে ক্ষীণতনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।

বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত ॥”

এই পদের বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

স্থায়িভাব—প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভাখ্য মধুরারতি ।

বিভাব —
বিষয়ালম্বন - মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণ ।
আশ্রয়ালম্বন —বিরহিণী শ্রীরাধা ।
উদ্দীপন—বসন্তকাল, কোকিলের গান, মলয়ানিল, ভ্রমরের গুঞ্জন, জ্যোৎস্নাবতীরাত্রি প্রভৃতি ।

অনুভাব উচ্চরোদন, লোকাপেক্ষা ত্যাগ ইত্যাদি ।

সাত্ত্বিকভাব —অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ, প্রলয়াদি ।

সঞ্চারিভাব—নির্বেদ, বিষাদ দৈন্য, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, মোহ ইত্যাদি ।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগরস যথা—

"সুরত-পিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
কর কর বারই তরল-নয়ানি॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত।
'নহি নহি' বোলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই॥
চুম্বনে সঙ্কোচ, লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সীতকার॥
নখরু পরশে ধনী চমকই গোরী।
দশইতে চমকি উঠই তনু মোরি॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
আনো আন-মনে মনসিজ উনমাদ॥
তৈখনে রোখই তবহিঁ পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ॥"

এর বিভাবাদি সামগ্রী সংযোজন যথা—

স্থায়িভাব—সম্ভোগাখ্য মধুরারতি।

বিভাব { বিষয়ালম্বন—বিদগ্ধ, নবতারুণ্য গুণযুক্ত ধীরললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ।
আশ্রয়ালম্বন—মধুরা, নববয়া, বিদগ্ধা, নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধা।
উদ্দীপন—কেলিকুঞ্জ, ভ্রমর গুঞ্জনাদি।

অনুভাব—বস্ত্রাবগুণ্ঠন, গাত্রমোটনাদি।

সাত্ত্বিক—স্বরভঙ্গ, পুলকাদি।

সঞ্চারী—লজ্জা, ত্রাস, আবেগাদি।

এই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবকদম্ব সম্ভোগাখ্য, মধুরারতির সহিত মিলিত ও পুষ্ট হয়ে 'সম্ভোগাখ্য রস হয়েছে এবং ব্রজবালাগণের অনুভূত রসসার পদ-আস্বাদনকারী সামাজিক সাধকভক্তেও সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সম্ভোগরস আস্বাদনের সৌভাগ্য দান করছে।

❀ **জয় শ্রীরাধে** ❀

শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্রমন্দির হতে প্রকাশিত

## ❀ কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ ❀

১। শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ (অন্বয়ানুবাদ ও বিস্তৃতব্যাখ্যাসহ) ১২০৲
২। শ্রীশ্রীস্তবাবলী ১ম খণ্ড, (টীকা, অনুবাদ ও বিঃ ব্যাঃ সহ) ১২০৲
৩। " ২য় খণ্ড " " ৮০৲
৪। মাধুর্যকাদম্বিনী ও রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা (বিঃ ব্যাখ্যা সহ) ৬০৲
৫। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা " " ৮০৲
৬। শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ, (অন্বয়ানুবাদ ও বিঃ ব্যাঃ সহ) ৫০৲
৭। সাধ্যসাধনতত্ত্ব-বিজ্ঞান ৮৫৲
৮। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলামৃত গুটিকা (যন্ত্রস্থ)
৯। শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মর্মানুবাদ, (১ম ও ২য় খণ্ড) ২২৲
১০। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা ২৫৲
১১। ভক্তিকল্পলতা, (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ১২, ৫, ৫,
১২। মঞ্জরীস্বরূপ-নিরূপণ ১২৲
১৩। রসদর্শন (রসতত্ত্বের দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি) ১০৲
১৪। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ১০৲
১৫। ভক্তিরস-প্রসঙ্গ ১০৲
১৬। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও ঐতিহ্য ৮৲
১৭। সচিত্র ভবকূপে জীবের গতি ৮৲
১৮। শ্রীগুরুতত্ত্ব-বিজ্ঞান ৫৲
১৯। শ্রীভক্ততত্ত্ব-বিজ্ঞান ৬৲
২০। শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ৫৲

हिन्दी प्रकाशन—